সহজ গীতা

শ্রীকেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ, বি-টি.
প্রণীত।

১৩৪৩ সাল।

মূল্য দুই টাকা

গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত
বৈঁচি (হুগলি)।

কলিকাতা,
৮৫নং অপার সারকুলার রোড, 'ভারতমিহির যন্ত্রে'
শ্রীযুগলচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

No $\frac{\text{4054 A}}{\text{OM-76-A-36}}$

From

The Director of Public Instruction, Bengal,

To

The Inspector of Schools, Burdwan Division,
Chinsura.

Dated, Calcutta, the 21st May 1936.

Sir,

With reference to your letter No. 287, dated the 26th February 1936 forwarding an application from Babu Kesab Chandra Chatterjee, Sub Divisional Inspector of Schools, Hooghly, asking permission to print and publish some books noted below, I have the honour to state that the permission asked for is granted.

(1) Sahaj Geeta (in Bengali)
(2) Geeta made easy (in English)

I have &c.
(Sd) J. M. Sen,
Assistant Director of Public Instruction,
Bengal.



শ্রীকৃষ্ণং জগদানন্দং জগদুৎপত্তিকারণম্ ।
প্রণম্য পরমাত্মানং প্রণীতা প্রীতয়ে পরা ॥
নাম্না সহজগীতেয়ং বৈচিগ্রামনিবাসিনা ।
শ্রীকেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেবশর্ম্মণা ॥

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্, ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা, সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥



উৎসর্গ পত্র।

পুণ্যাত্মা, সত্যবাদী স্বর্গীয় পিতৃদেব

নিমাইচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে

"সহজ গীতা"

নাম্নী পুস্তিকাখানি

প্রেরিত হইল।

গ্রন্থকার—

সূচনা।

গীতা বলিলেই সাধারণতঃ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাই বুঝায়। গীতা হিন্দুদিগের একখানি ধর্ম্মপুস্তক। অনেকেই গীতা পাঠ করিয়া থাকেন। বার আনা মূল্যের গীতা প্রায় সকল গৃহেই পাওয়া যায়। সাধারণ গীতায় সংস্কৃত শ্লোক, অন্বয়, টীকা ও বঙ্গানুবাদ থাকে। উহা হইতে গীতার প্রকৃত রহস্য বুঝা যায় না। ধর্ম্ম শব্দের সাধারণ অর্থ শাসন। এইজন্য ধর্ম্মপুস্তক প্রায়ই আদরণীয় হয় না। নীরস বলিয়া গীতার তত আদর নাই। কোনও পুস্তকে বা কাগজে গীতা কথা লেখা থাকিলে সাধারণ লোকে উহা পড়িতে ইচ্ছা করে না।

গীতার কথা তুলিলেই সাধারণ লোককে বলিতে শুনা গিয়াছে "হাঁ, হাঁ, ও জানি, গীতায় অর্জ্জুন যুদ্ধ করিয়া জীবহিংসা করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় কৃষ্ণ নানারূপ বক্তৃতা দিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রণোদিত করিয়াছিলেন।"

গীতা শুধু ধর্ম্মপুস্তক এই ধারণা যিনি করিবেন তিনি ভ্রান্ত। কেহ কেহ পাপকর্ম্ম করিয়া এক অধ্যায় গীতা পাঠ করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে গীতা উচ্চশ্রেণীর মনোবিজ্ঞান। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম লইয়া গীতা। দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব না জানিলে গীতার প্রকৃত মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করা দুরূহ।

অর্জ্জুন কার্পণ্যবশতঃ বা অজ্ঞানবশতঃ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হন নাই। জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে বা উপদেশের ফলে অর্জ্জুনের তমঃ দুরীভূত হইয়া গিয়াছিল। তমের নাশ হইলেই আত্মার প্রকাশ হয়। অর্জ্জুন আত্ম-প্রকট হইয়াছিলেন। সেই অবস্থায় অর্জ্জুনের যে কোনও কর্ম্ম করিতে ভয় করিবার আর কোনও কারণ ছিল না।

প্রত্যেক মানবের শরীরের ও মনের ভিতরে প্রতি মুহূর্ত্তে যুদ্ধ চলিতেছে। জ্ঞানের (আত্মজ্ঞানের) সহিত অজ্ঞানের যুদ্ধে আত্মার প্রকাশ না হইলে, অজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করিবে এবং অজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করিলে মানুষ

ধ্বংসপথে অগ্রসর হইতে থাকে অর্থাৎ সে পশুতুল্য হইয়া জীবন্মৃতাবস্থায় কালাতিপাত করিতে থাকে। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মদর্শন বা আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে।

মানুষ বহির্জগতে কি হইতেছে তাহা জানিবার জন্য কত ব্যস্ত কিন্তু তাহার অন্তর্জগতে কী ভীষণ বিপ্লব চলিতেছে তাহা জানিবার ইচ্ছা সে আদৌ করে না, ইহা অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় আর কি থাকিতে পারে ?

খাওয়া ও শোওয়া মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

"কে খেলায় আমি খেলি বা কেন,
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন,
এ কেমন ঘোর, হবেনা কি ভোর,
অধীর অধীর যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই।"
"কেবা আমি কিবা কার্য্য করিতে সাধন,
কোথা হ'তে করেছি এই ভবে আগমন,
ভুলেছি মায়াতে নাহি স্মরণ,
এঘোর পাথারে কিসে তরিব না জানি।"

গীতায় এই সব মীমাংসিত হইয়াছে। যাহাতে গীতা সাধারণের বোধগম্য হয় অর্থাৎ বুঝিবার পক্ষে সহজ হয়, তজ্জন্য 'সহজ গীতা' গ্রন্থখানি অতি সরল-ভাষায় লিখিত হইয়াছে। উপমা ও গল্পচ্ছলে সমস্তই বুঝান হইয়াছে।

ঘরের শত্রু ষড়রিপুকে দমন করিবার অমোঘ অস্ত্রের কথা উপমার সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রত্যেক নর-নারীর এই বহিখানি পড়া একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে ৪৫ টীর উপর সুন্দর গল্প আছে। পাঠক গল্পগুলি পড়িয়া বিমল আনন্দ ও বিপুল জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

বাল্যকালে স্বর্গীয় পিতৃদেবের মুখে নানা প্রকার গল্প শুনিয়াছিলাম। অনেক মজ্‌লিসে গল্প করায় আমার বন্ধুগণ একখানি গল্পের বহি লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শুধু গল্পের বহি লিখিলে সাধারণের উপকার সাধিত না হইতে পারে এইজন্য গল্পের ছলে "সহজ গীতা" নাম্নী পুস্তিকাখানি লিখিলাম। ধরিতে গেলে ইহা গল্পেরই বহি। গীতার শ্লোকের ব্যাখ্যা করা বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে; কারণ আমার সে পাণ্ডিত্য নাই এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ সে কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। গীতা হইতে কি অমূল্য সারসংগ্রহ করিতে পারা যায় ইহা দেখানই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

সংস্কৃত শ্লোকগুলি যে সব গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই সব গ্রন্থ আমার কাছে থাকা দূরে থাকুক, আমি সেগুলি চক্ষে দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ। অধিকাংশই পিতৃদেবের মুখ হইতে শ্রুত। যে শ্লোকগুলির উপর আমার সন্দেহ ছিল, আমি সেইগুলি বৈঁচিটোলের অধ্যাপক পণ্ডিত চিন্তামণি তর্কতীর্থ মহাশয়ের দ্বারা সংশোধিত করিয়া লইয়াছি।

তাড়াতাড়ি লেখায় গ্রন্থখানির স্থানে স্থানে ভ্রম থাকা অসম্ভব নহে। সহৃদয় পাঠকগণ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের কিঞ্চিৎমাত্র উপকার সাধিত হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি

বৈঁচি
১লা আশ্বিন, ১৩৪৩।

বিনীত
গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়				পৃষ্ঠা

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮	১	তাহারা	তাহার
”	২৪	ছিলে	ছিলে ?
৭৬	৮	নো	নৈব
১৫৭	৬	উকিল বাবু	কেরাণী বাবু
১৬১	১৫	করিলে	না করিলে
২৪০	২০	উদ্যোগিনাং	উদ্যোগিনং
২৪৭	৬	হয়	হয়।
”	১৫	বদর	কদর
২৫৩	৫	অন্তভুক্ত	অন্তর্ভুক্ত
২৬৩	১৬	করে না	করেন না
২৭৭	২১	অষ্ট	অষ্টম
২৮১	৫	মুখ	মুখ
”	১৩	শ্লোক	শ্লোকে
২৮২	৪	নিগুণ	নির্গুণ
২৮৫	৭	হইয়া	
”	৯	পঞ্চদশ	পঞ্চদশ অধ্যায়

ওঁ তৎসৎ

সহজ গীতা।

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্॥

ওঁ শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পীতবাসসম্।
প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিম্॥
ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ শ্রীগুরুবে নমঃ, শ্রীগণেশায় নমঃ।
ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতী ব্যাসং ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

অস্য—শ্রীগীতামালামন্ত্রস্য ভগবান্ বেদব্যাসঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা—

"অশোচ্যানন্বশোচংস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" ইতি বীজম্।
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইতি শক্তিঃ।
"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" ইতি কীলকম্।
"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ নমঃ।
"ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি তর্জ্জনীভ্যাম্ স্বাহা।
"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি মধ্যমাভ্যাম্ বষট্।
"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ম্ সনাতনঃ" ইত্যনামিকাভ্যাম্ হুম্।

"পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্।
"নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ ফট্।
"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইতি হৃদয়ায় নমঃ।
"ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ইতি শিরসে স্বাহা।
"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি শিখায়ৈ বষট্।
"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ম্ সনাতনঃ" ইতি কবচায় হুম্।
"পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।
"নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি অস্ত্রায় ফট্।

শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থং পাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্ ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতে অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী মম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্ গীতে ভবেদ্বেষিণীম্। নমোঽস্তুতে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপত্র যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্জ্বলিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ। প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে। জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ।

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ। বসুদেবসুতং দেবং কংসচানূরমর্দ্দনম্। দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্।

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা। অশ্বত্থামবিকর্ণ ঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী। সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ।

পারাশর্য্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থ গন্ধোৎকটং নানাখ্যানক কেশরং হরিকথা সম্বোধনা বোধিতম্। লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা ভূয়াদ্ ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসিনঃ শ্রেয়সে।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্। যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈর্ব্বেদৈঃ সাঙ্গপদ ক্রমোপনিষদৈ র্গায়ন্তি যং সামগাঃ। ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো। যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায় তস্মৈ নমঃ।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্।
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্॥
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা।
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম।
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্ব্বরুণঃ শশাঙ্কঃ।
প্রজাপতি স্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥

ভূমিকা।

কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের মধ্যে মহাসমর হইয়াছিল। ভার্গবজেতা ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণ, অজেয় কর্ণ, অমর অশ্বত্থামা ও কৃপ, মহাবল শকুনি ও শল্য, দুর্য্যোধন, বিকর্ণ ও জয়দ্রথ এবং ১১ অক্ষৌহিণী (১০৯৩৫০ পদাতি, ৬৫৬১০ অশ্বারোহী, ২১৮৭০ গজ ও ২১৮৭০ রথ লইয়া এক অক্ষৌহিণী সৈন্য হয়) সৈন্য থাকিতে কৌরবদিগের পরাজয় হইল, ইহার কারণ, শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের পরামর্শদাতা ছিলেন, সামান্য প্রমাণ যথা—ভীষ্মের সেনাপতিত্বে ৯ দিন ভীষণ যুদ্ধ চলিল; অর্জ্জুনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও ভীষ্ম প্রত্যহ পাণ্ডবদিগের দশ সহস্র সৈন্য নাশ করিয়াছিলেন। নবম দিবসের যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে সন্ধ্যার সময় যুধিষ্ঠির ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভীষ্মের পটমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "দাদা মহাশয়, আপনি এরূপ যুদ্ধ করিলে আমাদের জয়াশা কোথায়?" তাহাতে ভীষ্ম উত্তর করিলেন "হাঁ ভাই আমি অস্ত্রধারণ করিলে দেব, দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, কেহই আমাকে পরাজিত করিতে পারিবে না।" তাহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির পুনরায় বলিলেন "দাদা মহাশয়, তবে আমাদের উপায় কি হইবে? আমরা কি ন্যায্য রাজ্য পাইব না?" তখন শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন "ধর্ম্মরাজ আপনি চলিয়া আসুন, আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে।" পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন "কিসে বুঝিলে আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে?" শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন "ভীষ্মের নিজের কথায় 'আমি অস্ত্রধারণ করিলে,' সুতরাং কল্য ভীষ্ম-বধ হইবে, শিখণ্ডীকে রথাগ্রে রাখিয়া যুদ্ধ করিলেই ভীষ্ম অমঙ্গল দেখিয়া অস্ত্রধারণ করিবেন না, অস্ত্র ত্যাগ করিলেই ভীষ্মের বধ অনায়াসে হইবে।"

প্রকৃতপক্ষে হইলও তাই। জয়দ্রথ-বধও শ্রীকৃষ্ণের কৌশল মাত্র। পাণ্ডবদিগের কৈবর্ত্তক বা মাঝি বা পরামর্শদাতা শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বলিয়াই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে তাঁহাদিগের জয়লাভ হইয়াছিল। মনে করুন আমাকে হাওড়া হইতে কলিকাতা যাইতে হইবে। কলিকাতা যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য। হাওড়া ও কলিকাতার মধ্যে একটী নদী আছে। নদীর দুইটী তট থাকে, কারণ তট না থাকিলে নদী হয় না, এই তট দুইটীই নদীকে ধরিয়া থাকে ইহারাই ভীষ্ম ও দ্রোণ। তট ও জলের মধ্যে ভিজা মাটী বা বালি থাকে ইহাকে বেলাকুল বলে, ইহাই কর্ণ। বেলাকুল এর পর অবহমান জল, ইহা জয়দ্রথ। এই অবহমান জলে নীল-উৎপল ও কুম্ভীর থাকে; শকুনি নীলোৎপল এবং শল্য কুম্ভীর। তৎপরে স্রোত, কৃপ এই স্রোত; প্রবহমান জলে হাঙ্গর থাকে, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ হাঙ্গরদ্বয়; স্রোতোমধ্যে জলের আবর্ত্ত থাকে, ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী দুর্য্যোধন এই জলাবর্ত্ত। হাঙ্গর, কুম্ভীর, আবর্ত্ত প্রভৃতি সমন্বিত এবম্ভূত নদী পার হইয়া আমাকে কলিকাতা পৌঁছিতে হইবে। তট ও বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া নীলোৎপল কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া স্রোতোহীন জলে যেমন নামিলাম অমনি কুম্ভীর আমাকে গ্রাস করিল, সুতরাং আমার কলিকাতা যাওয়ারূপ উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। যদি বা কোনও উপায়ে কুম্ভীরের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই, স্রোত আমাকে বহুদূরে টানিয়া লইয়া গেল, কিংবা স্রোতে আমার মৃত্যু হইল—কিংবা হাঙ্গর আমাকে গিলিয়া ফেলিল, অথবা যদি এগুলি হইতে কোনও উপায়ে পরিত্রাণ পাই জলভ্রমি হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে এবম্ভূত উপায়ে বা পায়ে হাঁটিয়া নদী পার হইতে গেলে, আমার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। আমাকে ভেলার সাহায্যে নদী পার হইতে হইবে। ভেলাও স্রোতে ভাসিয়া যাইতে পারে, আবর্ত্তে মগ্ন হইতে পারে। সুতরাং ভেলাও চাই এবং

মাঝিও চাই। আবার দেখি রাম শ্যাম মাঝি হইলে চলিবে না, কারণ তাহারা আমার মত অনভিজ্ঞ বলিয়া স্রোতে এবং আবর্ত্তে ভেলাকে বশে রাখিতে পারিবে না। তবেই দেখা যাইতেছে আমার উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য একজন পাকা মাঝির আবশ্যক, যে মাঝি স্রোতে ও আবর্ত্তে হাল টিপিয়া ধরিয়া ভেলাকে ও আমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। একজন পাকা মাঝির সাহায্য ব্যতিরেকে নিরাপদে নদী পার হইয়া আমার কলিকাতা পৌঁছান একবারেই অসম্ভব। আমার এই কর্ম্মনদীতে বা ভবের হাটে, যেখানে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের ন্যায় সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ধার্ম্মিক লোক আছেন, (যাঁহারা আছেন বলিয়াই পৃথিবীতে এখনও চন্দ্র ও সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইতেছে), অনেক চাটুকার সর্ব্বদাই আমাকে কুপথে লইয়া গিয়া আমার অর্থ শোষণের চেষ্টায় আছে, আধি ব্যাধি আছে এমন কি আমার ঘরের শত্রু (ষড় রিপু) সর্ব্বদাই আমাকে প্রতারিত করিতেছে ও আমার উদ্দেশ্যসাধনের পথে অন্তরায় হইতেছে; নির্ব্বিঘ্নে উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য একজন পাকা মাঝি বা গুরু চাই। গুরুর কৃপা ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করিবার উপাই নাই।

"অখণ্ড মণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত যিনি চরাচরে,
গুরু বিনা কে তাঁহারে দেখাতে বল পারে।"

গুরুর ভরসা না করিয়া কেবলমাত্র পুস্তক পাঠে ভব নদী পার হইতে গেলেই বিপদ, হাবু ডুবু খাইয়া বিপথে চলিয়া যাইতে হইবে, সুতরাং জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। পাকা গুরুর লক্ষণ যথা—

নমস্তভ্যং মহামন্ত্র দায়িনে শিবরূপিণে।
সর্ব্বশাস্ত্র প্রকাশায় সংসার দুঃখ তারিণে॥

অতি সৌম্যায় দিব্যায় বীরায়া জ্ঞান হারিণে।
নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে॥
সর্ব্ব তত্ত্ব প্রবোধায় সর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশিনে।
নমস্তে শম্ভবে তুভ্যং দিব্য জ্ঞান প্রদায়িনে॥

অর্থাৎ যাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি আছে, যিনি শিষ্যের অজ্ঞান হরণ করিতে সমর্থ এবং যিনি প্রকৃত বীর। সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ হইতেছে "বীর" অর্থাৎ অনাত্মঘাতী। অনাত্মঘাতী কাহাকে বলে পরে বলা হইবে।

গৈ ধাতু ক্ত প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে আ যোগে গীতা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং গীতাশব্দের অর্থ গান; বহু প্রকারের গীতা আছে যথা রাম-গীতা, শিব-গীতা ইত্যাদি; বর্ত্তমান গ্রন্থে যে গীতার আলোচনা হইবে, ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। গীতার রচয়িতা পরাশর মুনির পুত্র ও শুকদেব গোস্বামীর পিতা মহামুনি ব্যাস। ইহা অনুষ্টুপ ছন্দে লিখিত হইয়াছে। গীতার উৎপত্তি যথা—পাণ্ডবগণ শকুনির সহিত দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাত-বাস ভোগ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের নিকট পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করিলে, দুর্য্যোধন উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন, কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন ভার্গব-জেতা-ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণ, অজেয় কর্ণ, অমর অশ্বত্থামা ও কৃপ, জয়দ্রথ, শল্য প্রভৃতি মহারথী তাঁহার পক্ষে, সুতরাং যুদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই তিনি জয়লাভ করিবেন। ষড়রিপুজয়ী ও শান্তিপ্রিয় যুধিষ্ঠির তখন বলিলেন "ভাই সুযোধন, লোকক্ষয়কারী যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, পাঁচ ভাইএর জন্য পাঁচখানি গ্রাম দাও, আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব আর তুমি সসাগরা পৃথিবীর রাজা হইয়া থাক।" তাহাতে দুর্য্যোধন উত্তর দিলেন "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী" অর্থাৎ যুদ্ধ

না করিয়া একটী সূচের অগ্রভাগে যতটুকু মাটী থাকিতে পারে ততটুকুও দিব না।" কৌরবদিগের কুলধর্ম্ম অনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসনের অধিকারী; যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন, সুতরাং রাজসিংহাসন তাঁহারই প্রাপ্য। পাপমতি ও লোভী দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিতেছেন, অধিকন্তু পাঁচ ভাইএর জন্য পাঁচখানি গ্রাম দিতেও ইচ্ছুক নহেন; অগত্যা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম্যযুদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইল এবং ঘোষণাও করা হইল, দুর্য্যোধনের মাতা গান্ধারী রোদন করিতে লাগিলেন, তাহাতে দুর্য্যোধন বলিয়াছিলেন—

"কেন মাতা কাঁদিতেছ রণবার্ত্তা শুনি,
অসহায় পাণ্ডবেরে আমি নাহি গণি।
ভিখারী পাণ্ডবগণ আমি রাজা দুর্য্যোধন,
মোর করতলে আছে সমগ্র ধরণী;
ভাগ্যগুণে ভীষ্ম, দ্রোণে লভেছি সেনানী।"

তদুত্তরে গান্ধারী বলিয়াছিলেন—

"কেন কাঁদে মাতা তোর শুনরে বাছনি,
ধর্ম্মবলে অস্ত্রবল তৃণ হেন গণি;
ধর্ম্মবলে ধর্ম্মরাজ লভিবে ধরণী।"

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধর্ম্মবলে (Moral force) চলিতেছে। যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয় এবং যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সেইখানেই ধর্ম্ম। যখন শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সহায় তখন পাণ্ডবগণই যুদ্ধে জয় লাভ করিবে এবং তুমি সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইবে। দুর্য্যোধনের মাতৃভক্তি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, কিন্তু তাহা হইলে কি হয় তাঁহার রাজ্যলোভ অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় মোহের কুহকে পড়িয়া তিনি মাতৃবাক্য অবহেলা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ফল হইল

"যা কহিল সত্য হ'ল গান্ধারী জননী" অর্থাৎ পাণ্ডবগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং কৌরবগণ নির্ব্বংশ হইলেন; ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ কোথায় চলিয়া গেল।

বঙ্কিমবাবুর 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থে হরবল্লভ বলিয়াছিলেন "মা লক্ষ্মি, তোমায় ছাড়িব কিন্তু চাল ছাড়িব না।" বিভীষণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাবণকে রামের নিকট সীতাকে প্রেরণ করিবার জন্য অনুনয় করিলে রাবণ বলিয়াছিলেন "জানি ভাই, রাম পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, জানি সীতা লক্ষ্মীস্বরূপিণী জনক দুহিতা এবং ইহাও জানি যে আমি রাম কর্ত্তৃক নিধন প্রাপ্ত হইব, তথাপি সীতাকে রামের নিকট প্রত্যর্পণ করিব না।" ইহার নাম স্বধর্ম্ম। এই স্বধর্ম্ম কেহ সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। যাহা হউক যখন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইল এবং উভয় পক্ষ যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান, তখন দুর্য্যোধনের পিতা জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসদেবকে স্মরণ করিলেন এবং ব্যাসদেব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন 'হে মহামুনে, আমি অন্ধ, যুদ্ধ হইতেছে কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে এবং আমি আছি ইন্দ্রপ্রস্থে। আপনি দয়া করিয়া এমন কোন ব্যবস্থা করুন যাহাতে আমি রাজধানীতে বসিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে যুদ্ধের ফলাফল জানিতে পারি।" ব্যাসদেব বলিলেন "তাহাই হইবে আমি তোমার নিকট আমার প্রিয় শিষ্য ও অমাত্য সঞ্জয়কে রাখিয়া যাইতেছি, সে আমার প্রসাদে দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে যুদ্ধের ফলাফল যথাযথ বর্ণনা করিবে।" ইহাই গীতার উৎপত্তি॥ গীতায় ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করিতেছেন এবং সঞ্জয় উত্তর দিতেছেন। যদিও দুর্য্যোধনকে আমরা পাপমতি, লোভী ও মূর্ত্তিমান্ কলি বলিয়াছি, তথাপি বলিতে হইবে দুর্য্যোধন আমাদিগের পরম বন্ধু, কেননা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের প্রার্থনা মত পাঁচখানি গ্রাম দিতে সম্মত হইলে এই ধর্ম্মময়ী গীতার সৃষ্টিই হইত না এবং তাহা হইলে হয়ত আমাদিগকে চির তিমিরে থাকিতে হইত। গীতা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্তর্গত এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মহাভারতের অন্তর্গত; সুতরাং গীতা মহাভারতের (ভীষ্মপর্ব্বের) অন্তর্গত।

প্রত্যেক কর্ম্মের উদ্দেশ্য আছে। মহামুনি ব্যাসের গীতা প্রণয়ন করিবার উদ্দেশ্য কি ছিল? তিনি "প্রজ্জ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ" অর্থাৎ তিনি জ্ঞানময় প্রদীপ জ্বালিয়াছেন। আমরা কিরূপে প্রকৃত জ্ঞান পাইতে পারি তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং "কলিমলপ্রধ্বংসিনঃ শ্রেয়সে" অর্থাৎ আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহাতে এই কলিকাল জনিত মলা বা পাপের ধ্বংস হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বস্তুতঃ যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ হয় এবং যাহা না থাকিলে মানুষ মানুষ হয় না গীতা পাঠ বা শ্রবণ করিলে তাহাই পাওয়া যায় অর্থাৎ মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়। হস্তপদবিশিষ্ট মনুষ্যকে আমরা পশু বলি যখন একই ডাবায় দুইটী বলদের ন্যায় সে নিজ নীচ স্বার্থের জন্য অপরের অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়, আবার তাহাকেই মানুষ বলি যখন সে নিজ স্বার্থ বজায় রাখে অথচ অপরের অনিষ্টসাধনের চেষ্টাও করে না, এবং তাঁহাকে দেবতা বলা হয় যখন তিনি মহাত্মা বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট প্রভৃতির ন্যায় নিজ অনিষ্টসাধনে ও অপরের হিতকামনা করিয়া থাকেন। মানুষ প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা পশুভাব হইতে মনুষ্যভাবে এবং মনুষ্যভাব হইতে দেবভাবে উন্নীত হয়। রত্নাকর ও অশোক ইহার জলন্ত প্রমাণ। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই তিনের একাধারে স্ফূরণের নাম শিক্ষা। কেবলমাত্র পুস্তক পাঠে মানসিক স্ফূরণ সম্ভব হইতে পারে। যাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় নাই, তাঁহাকে প্রকৃত শিক্ষিত বলা যাইতে পারে না।

অর্থযুক্ত গীতা পাঠ বা শ্রবণ করিলে প্রকৃত মনুষ্য হইতে পারা যায়। পুনঃ পুনঃ পাঠ বা শ্রবণ করিলে গীতার উপদেশ মত কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি আপনিই আসিবে, তবে অর্থযুক্ত ও ভাবযুক্ত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ ভাসা ভাসা পাঠ বা অং বং শ্রবণ করিলে কোনও ফল হইবে না।

মনে করুন একজন ভুটানি, একজন চতুর বাঙ্গালী ও আমার পৌত্র আমার কাছে আছে। আমি তিনজনকেই একই শব্দ "শালা" প্রয়োগ করিলাম।

ভুটানি কোনও ক্রিয়া না দেখাইয়া স্বস্থানে বসিয়া রহিলেন, কেননা তিনি "শালা" শব্দের অর্থ জানেন না। দ্বিতীয় ব্যক্তি বুঝিলেন "শালা" শব্দের অর্থ পত্নীর সহোদর, সুতরাং উৎকট গালি ভাবিয়া তিনি আমার গালে এক চপেটাঘাত করিলেন। আমার পৌত্র বুঝিল 'শালা' আদরের কথা, কারণ সে এরূপ আদর-সম্ভাষণসূচক বাক্য শ্রবণ করিতে অভ্যস্ত। সে তৎক্ষণাৎ আমার ক্রোড়ে উঠিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। দেখা গেল অর্থবোধে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া হইল।

আবার অর্থ বা প্রতিশব্দ জানিলেই ফল হয় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর পুস্তকে প্রভাত বর্ণনা করিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন।

"বিবিধ বরণ, কুসুম কানন, বিতরি উজল বিভা।
ছাড়িয়া গগন, তারা অগণন, ভূতলে নামিল কিবা॥"

সাধারণ গুরুমহাশয়কে ছাত্রদিগকে এইরূপ ভাবে বুঝাইতে দেখা গিয়াছে—বাগানে নীল, লাল প্রভৃতি নানা রঙএর ফুল ফুটিয়াছে এবং উজ্জ্বল কিরণ দান করিতেছে; মনে হইতেছে যেন অসংখ্য নক্ষত্র আকাশ ছাড়িয়া পৃথিবীতে নামিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে ছাত্রদিগের প্রভাত সম্বন্ধে জ্ঞানের উন্মেষ হইল বোধ হয় না।

শিক্ষিত গুরুমহাশয়কে ছাত্রদিগকে নিম্নলিখিতভাবে বুঝাইতে দেখা গিয়াছে।

প্রভাতের পূর্ব্বে আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলিতেছিল; অন্ধকার থাকায় তারাগুলি খুব উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। এক্ষণে প্রভাতে সূর্য্য উদিত হইয়াছে। সূর্য্যের কিরণ অত্যধিক উজ্জ্বল হওয়ায় তারাগুলি নিষ্প্রভ অর্থাৎ মলিন হইয়া গেল; বস্তুতঃ তাহারা আকাশেই রহিয়া গেল কিন্তু উহাদিগকে আর দেখা গেল না। এদিকে সূর্য্যোদয়ে উদ্যানের সমস্ত ফুলই ফুটিয়া উঠে। এই ফুলগুলি নানা রঙের, কোনটী লাল, কোনটী নীল, কোনটী হলদে রঙের ইত্যাদি।

প্রাতঃকালীন সূর্য্যরশ্মি এই সকল ফুলের দলের উপর পড়াতে ফুলগুলি প্রতিফলিত সূর্য্য কিরণে চক্ চক্ করিতে থাকায় এক একটী নক্ষত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এক্ষণে ছাত্রের প্রভাত সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান হইল মনে হয়।

আবার প্রতিশব্দ ও ব্যাকরণ জানিলেই হইবে না।

কোনও সময়ে ভোজরাজ কতিপয় শ্রুতিধর পণ্ডিতের সাহায্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন যিনি তাঁহাকে নূতন শ্লোক শুনাইতে পারিবেন তিনি এক লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক পাইবেন। বহু দরিদ্র পণ্ডিত পারিতোষিক পাইবার আশায় নূতন শ্লোক রচনা করিয়া আনিতেন কিন্তু শ্রুতিধর পণ্ডিতগণ তৎক্ষণাৎ সেই শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিতেন শ্লোক নূতন নহে উহা তাঁহাদিগের জানা ছিল। সকল পণ্ডিতই অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিয়া যাইতেন। ভোজরাজকে পারিতোষিক দিতে হয় নাই।

কালক্রমে এই সংবাদ কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের কর্ণগোচর হইল। তিনি একটী শ্লোক রচনা করিয়া ভোজরাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "মহারাজ আমি কিছু পাইবার আশায় একটী নূতন শ্লোক রচনা করিয়াছি, অনুমতি হইলে আবৃত্তি করি।"

ভোজরাজ আবৃত্তি করিতে বলায় কালিদাস বলিলেন :—

"স্বস্তি শ্রীভোজরাজস্ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী।
পিত্রা তে যা গৃহীতা নবনবতিযুতারত্নকোটির্ম্মদীয়া॥
তাং ত্বং মে দেহি তূর্ণং সকলবুধজনৈর্জ্ঞায়তে।
সত্যমেতন্নোবা জানন্তি কেচিৎ নবকৃতমিতি চেদ্দেহিলক্ষং ততোমে॥"

হে মহারাজ আপনার মঙ্গল হউক। আপনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল জয় করিয়াছেন এবং আপনি ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী। আপনার পিতা আমার নিকট

হইতে নিরানব্বই লক্ষ মুদ্রা ধার লইয়াছেন। ইহা পণ্ডিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন। আপনি তাঁহার সৎপুত্র। অতএব আপনি ত্বরায় পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হউন। আর যদি (এই) পণ্ডিতগণ ইহা না জানেন তবে আমার এই শ্লোক নূতন হইল, সুতরাং ঘোষণা অনুযায়ী আপনি আমাকে এক লক্ষ মুদ্রা প্রদান করুন।

ভোজরাজ শ্লোকের মর্ম্ম বুঝিয়া ভাবিলেন কালিদাসের নিকটে চাতুরী খাটিবে না, যেমন করিয়া হউক কালিদাসকে টাকা দিতেই হইবে। পণ্ডিতগণও সহজে হটিবার লোক ছিলেন না। তাঁহারা তিন দিবসের সময় চাহিলেন এবং অনেক অনুসন্ধানের পরে ভোজরাজের পিতার স্বহস্তলিখিত একখানি পুরাতন চিরকুট প্রাপ্ত হইয়া ভোজরাজকে বলিলেন "মহারাজ, কালিদাসকে ঠকান গিয়াছে, কারণ প্রাপ্ত চিরকুটে লেখা আছে 'আমি আষাঢ়ান্ত দিবসের মধ্যাহ্নকালে অমুক স্থানের অমুক তালবৃক্ষের মস্তকোপরি এক কোটি রত্ন মুদ্রা রাখিলাম' এবং আমরা তালবৃক্ষের মস্তক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি মুদ্রা নাই। এই চিরকুট দ্বারাই ঋণ শোধ হইবে।" কালিদাস চিরকুটখানি প্রাপ্ত হইয়া ভোজরাজকে বলিলেন "মহারাজ আমাকে একখানি কোদালি দিতে আজ্ঞা হয়।" ভোজরাজ বলিলেন "কবিশ্রেষ্ঠ, কোদালি লইয়া কি করিবেন?" কালিদাস বলিলেন "মহারাজ মুদ্রা নিশ্চয়ই আছে; তালগাছের মাথায় না থাকিলেও গোড়াতে থাকিবে। আপনার পিতা আপনার ন্যায় প্রতারক ও মিথ্যাবাদী ছিলেন না।" এই বলিয়া কালিদাস পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট তালবৃক্ষের গোড়া খনন করিয়া এক কোটি রত্নমুদ্রা বাহির করিলেন এবং ভোজরাজকে এক লক্ষ মুদ্রা ফিরাইয়া দিলেন।

ভোজরাজ ও পণ্ডিতগণত অবাক। ভোজরাজ বলিলেন "পণ্ডিতবর, চিরকুটে তালগাছের মাথায় মুদ্রা রাখার কথা ছিল, আপনি গোড়া খনন করিলেন কেন?" কালিদাস বলিলেন "মহারাজ, আপনার পণ্ডিতগণ

বৈয়াকরণ; তাঁহারা বিজ্ঞান জানেন না। জ্ঞান অপেক্ষাও বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। জগতে এমন মূর্খ কে থাকিতে পারে যে গাছের মাথায় টাকা রাখিবে? অধিকন্তু 'আষাঢ়ান্ত দিবসের মধ্যাহ্নকালে' ইহার তাৎপর্য্য কি? ঐ সময়ে সূর্য্য ঠিক মাথার উপরে থাকে বলিয়া সকল পদার্থের মাথার ছায়া ঠিক পায়ের নীচে পড়ে; ইহা হইতে বুঝিয়াছিলাম মুদ্রা গাছের মাথায় নাই, গোড়ায় আছে।"

ভোজরাজ কালিদাসকে ঐ লক্ষ মুদ্রা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন "মহাত্মন্, নিরানব্বই লক্ষ মুদ্রাও আপনার প্রাপ্য। এক্ষণে এই ব্যাপারে আমি বহু নিরীহ ও যোগ্য পণ্ডিতকে প্রতারিত করিয়াছি এবং তজ্জনিত পাপ অর্জ্জন করিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করতঃ বক্রী লক্ষ মুদ্রা লইয়া যাউন।" তদুত্তরে কালিদাস বলিলেন "মহারাজ, মনের প্রায়শ্চিত্তই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত। যখন আপনি বুঝিয়াছেন অন্যায় করিয়াছেন, তখন প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে। তবে তিন কাহণ কড়ি ও একটী গাভী দান লৌকিক মাত্র, তাহা আপনি করিতে পারেন এবং না করিলেও কোন প্রত্যবায় হইবে না।"

বলা বাহুল্য কালিদাস একটী মুদ্রাও গৃহে লইয়া যান নাই। তিনি সমস্ত অর্থই পথে দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত পণ্ডিতগণ অর্থকে "কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ" বা ছেঁড়া কাথার ন্যায় জ্ঞান করিয়া অর্থ সঞ্চয়ের প্রয়াস করেন না।

কোনও রাজার এক ধার্ম্মিক ও সুদক্ষ মন্ত্রী ছিলেন। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক বয়স হওয়ায়, "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" বা পঞ্চাশ বৎসর বয়সের অধিক হইলে বনে যাওয়া উচিত, ভাবিয়া, মন্ত্রী কার্য্যে অবসর গ্রহণ করিয়া অরণ্যে ভগবদারাধনায় সময় অতিবাহিত করিবার মনস্থ করিলেন এবং রাজাকে স্বীয় মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। রাজার নিষেধ সত্ত্বেও মন্ত্রী প্রধান সেনাপতির উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন এবং উপযুক্ত পুত্রকে

সংসার সম্বন্ধে যথারীতি উপদেশ প্রদান করিলেন। পরে শুভদিনে ও মাহেন্দ্র ক্ষণে বাম পা বাড়াইবামাত্র তিনি সভয়ে ও সবিস্ময়ে সম্মুখে এক দেবী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। মূর্ত্তি তাঁহার গতিরোধ করিয়া বলিলেন "মন্ত্রী মহাশয়, যান কোথায় ?" মন্ত্রী মূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "আমি ভগবদারাধনার জন্য বনে যাইতেছি; কিন্তু কে মা আপনি ?" মূর্ত্তি বলিলেন "যাবেন না, উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, আমি লক্ষ্মী।" মন্ত্রী বলিলেন "আমার অপরাধ ?" লক্ষ্মী বলিলেন "আপনার অপরাধ এই যে আমি আপনার উপর সুপ্রসন্ন আছি। আপনিত বিজ্ঞ, সুতরাং জানেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী সপত্নী। ইহার প্রকৃত অর্থ আর কিছুই নহে যাহার লক্ষ্মী আছে অর্থাৎ যে ধনী সে সরস্বতীর অর্চ্চনা করিতে বা বিদ্যা শিখিতে তত ইচ্ছা করে না; কারণ সে জানে তাহার প্রচুর ধন আছে। অর্থের সাহায্যে সে পণ্ডিত ব্যক্তির পরামর্শ ক্রয় করিতে পারিবে। আবার যাহার সরস্বতী আছে অর্থাৎ যে বিদ্বান্ সে লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিতে বা ধনসঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করে না কারণ সে জানে তাহার যথেষ্ট বিদ্যা আছে যদ্দ্বারা সে প্রয়োজন মত ধন উপার্জ্জন করিতে পারিবে। আমি (ভাগ্যলক্ষ্মী) যত দিন আপনার উপর সুপ্রসন্ন থাকিব তত দিন আপনার সরস্বতীর বা জ্ঞানের অর্চ্চনায় বা ঈশ্বরারাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে না। যখন আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিব, তখন যাইবেন সিদ্ধিলাভ হইবে।" তাহাতে মন্ত্রী বলিলেন "মা, আমি কেমন করিয়া জানিতে পারিব আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ?" "এখন আমি আপনার উপর সুপ্রসন্ন আছি, সুতরাং আপনি মন্দ কাজ করিলেও তাহা ভাল হইয়া দাঁড়াইবে। যখন দেখিবেন ভাল কাজ করিতে গিয়াও ফল মন্দ হইয়া দাঁড়াইবে, তখন জানিবেন আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়াছি" এই বলিয়া লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইলেন।

মন্ত্রীর মনে আনন্দ হয় নাই। পরদিন রাজসমীপে গমন করিয়া মন্ত্রী বলিলেন "মহারাজ, আমার এখন বনে যাওয়া হইল না। আমি পুনরায়

কার্য্যে যোগদান করিব।” রাজা আনন্দচিত্তে অনুমতি দিলেন। এই ঘটনার ছয়মাস পরে রাজা আহারান্তে হলঘরে চক্রবিশিষ্ট পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াছিলেন এবং মন্ত্রী কটিদেশে তরবারি লইয়া পরিক্রম করিতেছিলেন। হঠাৎ লক্ষ্মীর কথা মনে পড়ায় মন্ত্রী রাজার মস্তকে পদাঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ পর্য্যঙ্ক সহ রাজা সাত হাত দূরে সরিয়া গেলেন এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একখানি টালি খসিয়া নীচে পড়িয়া গেল। রাজা সরিয়া না গেলে টালিখানি তাঁহার মস্তকে পড়িত ও তাহাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়া যাইত। রাজা বিবেচনা করিয়া মন্ত্রীকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দান করিলেন এবং মন্ত্রীর পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিলেন। মন্ত্রী জানিতেন তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক রাজার মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার মঙ্গল হইল। এই ঘটনায় তিনি বুঝিতে পারিলেন মা লক্ষ্মী তাঁহাকে প্রতারিত করেন নাই।

আরও এক বৎসর পরে একদিন নূতন মন্ত্রীর গ্রামান্তরে কার্য্য থাকায় পুরাতন মন্ত্রী সেই দিনের জন্য মন্ত্রীর কার্য্য করিতেছিলেন। এদিন রাজা দেওয়ালের নিকটে মস্তক রাখিয়া ঊর্দ্ধমুখে শয়ন করিয়াছিলেন। হঠাৎ মন্ত্রী দেখিলেন এক ভীষণ সর্প ফণা বিস্তার করিয়া রাজার মস্তকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ শশব্যস্ত হইয়া কটিদেশস্থ তরবারি দ্বারা সর্পকে ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা চক্ষু উন্মীলন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। পশ্চাতে সর্প থাকায় তিনি সর্প দেখিতে পান নাই কিন্তু তিনি সম্মুখে দেখিতে পাইলেন মন্ত্রী তাঁহাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে তরবারিখানি তাঁহার মস্তকের নিকটে আনয়ন করিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তরবারি ধরিয়া ফেলিলেন এবং মন্ত্রীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রী তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন তিনি সর্পকে বিনাশ করিবার জন্যই তরবারি লইয়া যাইতেছিলেন,

তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য নহে। সর্পকে দেখিতে না পাওয়ায় রাজা মন্ত্রীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না; অধিকন্তু তিনি মনে করিলেন মন্ত্রী অর্দ্ধেক রাজ্য পাইয়াছেন, তাঁহাকে বিনাশ করিলে সমগ্র রাজ্যই তাঁহার হইতে পারে এই আশা মনে পোষণ করিয়া মন্ত্রী বাস্তবিকই তাঁহাকে নিহত করিবার অভিপ্রায়ে তরবারি লইয়া যাইতেছিলেন। পরদিন নূতন মন্ত্রী উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার সহিত বিচার করিয়া পুরাতন মন্ত্রীর মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালার ব্যবস্থা করিলেন। এই ঘটনায় মন্ত্রী বুঝিলেন মা লক্ষ্মী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, কারণ বাস্তবিকই তিনি ভাল করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে ফল মন্দ হইয়া গেল। তখন মন্ত্রী বালকের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে স্বীয় ভবনে গমন করিলেন এবং ভগবদারাধনার সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া মহা আনন্দের সহিত অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় প্রশ্ন উঠিল লক্ষ্মী বড় না সরস্বতী বড় বা ধন বড় না বিদ্যা বড়। স্তাবকগণ বলিল ধন বড় এবং পণ্ডিতগণ বলিলেন বিদ্যা বড়, কারণ—

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে, উহা রাজার কর্ণে উঠিল। রাজা স্তাবকদিগকে বলিলেন "তোমরা যে বলিতেছ ধন বড়, কারণ পণ্ডিতগণ আমার অধীনে চাকুরী স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তাহা ঠিক নহে। আমার নিজের স্বার্থের জন্য আমি উঁহাদিগকে সভায় আদর ও যত্ন করিয়া রাখিয়াছি।" স্তাবকগণ সন্তুষ্ট হইল না। এমত সময়ে এক ব্রাহ্মণ দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং মস্তকে হাত রাখিয়া বলিলেন "মহারাজ, রক্ষা করুন, গেলাম, গেলাম!" এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মণ অজ্ঞান হইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া রাজা চিন্তিত হইলেন এবং স্তাবকগণকে বলিলেন "দেখ ত ব্রাহ্মণের কি হইল।" স্তাবকগণ নিরুত্তর রহিল। তখন রাজা ধন্বন্তরীকে

আহ্বান করিয়া বলিলেন "দেখুন ত বৈদ্যরাজ, ব্রাহ্মণের কি রোগ হইয়াছে এবং উহার প্রতীকার কি?" ধন্বন্তরী ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "মহারাজ, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মকীট নামক পীড়া হইয়াছে। পোকাটী মস্তিষ্কের মধ্যে নড়িতে থাকিলে, এইরূপ অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হয়। উৎকট রোগের উৎকট ঔষধের আবশ্যক। ব্রাহ্মণকে সুরাপান করাইলেই পীড়ার উপশম হইবে।" রাজা ভাবিলেন সুরাপান করাইলেও যদি ব্রাহ্মণ প্রাণ না পান, তবে ত তাঁহার পাপ হইবে, কারণ সুরাপান ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। তখন তিনি বরাহমিহিরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "দেখুনত ব্রাহ্মণের বর্ত্তমান বয়স কত এবং ইঁহার আয়ু কত?" গণকঠাকুর ব্রাহ্মণের হস্তরেখা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "মহারাজ, ব্রাহ্মণের বর্ত্তমান বয়স ৪৫ বৎসর এবং ইঁহার আয়ু ৮৫ বৎসর।" তখন রাজা বুঝিলেন ব্রাহ্মণকে সুরাপান করাইলে তাঁহার পাপ হইবে না, বরং পুণ্য হইবে এবং সুরাপান না করাইলে ব্রাহ্মণ মারা যাইতে পারেন। প্রতীকারের অভাবে তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যা পাপের ভাগী হইতে হইবে। তিনি সুরা আনয়ন করিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণের অল্প অল্প জ্ঞানের সঞ্চার হইতেছিল। তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন "ভগবন্ এমন করিলেন যে আমাকে সুরাপান করিতে হইল? কেন আবার আমার জ্ঞানের উদয় হইল?" বৈদ্যরাজের আশ্চর্য্য ক্ষমতা যে ব্রাহ্মণকে সুরাপান করিতেও হইল না। ব্রাহ্মণের নাসিকার নিকটে সুরার পাত্রটী ধরিবামাত্র, উহার ঘ্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌছিবামাত্র কীটটী মরিয়া গেল। তখন আশ্বস্ত হইয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন "আ মহারাজ বাঁচিলাম! আপনাকে আর কি আশীর্ব্বাদ করিব। আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া প্রজারঞ্জন করতঃ রাজা নামের সার্থকতা দেখান।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা স্তাবকদিগকে বলিলেন "কিহে, তোমরা যে ধন বড় বলিতেছিলে, তাহার কি পরিচয় পাওয়া গেল? বিদ্যার ক্ষমতা দেখিলেত? যাহার বিদ্যা আছে

সে কিছু না কিছু ধন উপার্জ্জন করিতে পারে কিন্তু যাহার ধন আছে তাহার বিদ্যা হইতে পারে আবার নাও হইতে পারে। অতএব জানিয়া রাখ বিদ্যাই বড়।"

অপিচ বেদে আছে

"যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ······তস্মাৎ যজ্ঞে বধো-বধঃ।"

যজ্ঞের জন্য পশু সৃষ্ট হইয়াছে···অতএব যজ্ঞে পশু বধ কর। ইহার প্রকৃত অর্থ ছাগমহিষাদির বলি ঠিক মনে হয় না। হিন্দু শাস্ত্রে পঞ্চযজ্ঞের উল্লেখ আছে যথা—ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ। এই ভূতযজ্ঞের অর্থ পশুপক্ষিগণকে আহার দান; সুতরাং যে শাস্ত্রে পশুপক্ষিগণকে আহারদানের ব্যবস্থা আছে, সেই শাস্ত্রের দোহাই দিয়া তাহাদিগকে নিহত করিতে হইবে ইহা ত সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে পশুবলির অর্থ আর কিছুই নহে কেবল পশুদিগের দুষ্টভাব (দোষ) বলি দেওয়া। ছাগের দুষ্টভাব কাম, মহিষের ক্রোধ, মেষের লোভ, গাভীর মোহ, হস্তীর মদ এবং অশ্বের মাৎসর্য্য। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এইগুলিই মানবের মোক্ষের অন্তরায়; তজ্জন্য ইহাদিগকে ষড়রিপু বলা হয়। ইহাদিগকেই পূর্ব্বে ঘরের শত্রু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

পঞ্চভূত—ক্ষিত্যপ্‌তেজঃমরুৎব্যোম্—ইহাদের বিষয় ভোগের উৎকট অভিলাষের নাম কাম; অভিলষিত দ্রব্য না পাইলে মনে যে বিরক্তি জন্মে তাহাকে ক্রোধ বলে; অপরের দ্রব্য পাইবার ইচ্ছার নাম লোভ। সর্ব্বদা অজ্ঞানরূপ তিমিরে ডুবিয়া থাকিয়া 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞানের নাম মোহ। আমার ধন আছে, আমার যৌবন আছে, আমার জন আছে ইত্যাদি ধারণার নাম মদ এবং এইগুলি অপরকে দেখাইয়া পরশ্রীকাতরতার নাম মাৎসর্য্য। মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভ। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভ

আত্মদর্শন ভিন্ন হয় না এবং কামাদিষড়রিপু আত্মদর্শনের প্রধান অন্তরায়; সুতরাং এইগুলিকে বলি না দিলে মানুষ হওয়া যায় না।

আমার একটী ছাগকে দেবতার উদ্দেশে বলি দিলাম, ইহার অর্থ আমি ঐ ছাগটীকে চিরদিনের তরে ত্যাগ করিলাম। জগন্নাথদেবকে একটী আম্রফল প্রদান করিলাম ইহার অর্থ আমি জীবনে কখনও আম খাইব না। অতএব ছাগ বলি দেওয়া অর্থে বুঝিতে হইবে ছাগের দোষ কাম চিরকালের জন্য ত্যাগ করা। ভিন্ন ভিন্ন পশু বলি দেওয়ার অর্থ ঐ সকল পশুদিগের দোষ অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য চিরদিনের জন্য ত্যাগ করা। ইহাই বোধ হয় বেদের প্রকৃত অর্থ। সাধারণ অর্থ লইয়া স্বার্থের জন্য দেবদেবীর সম্মুখে ছাগমহিষাদি বলি দেওয়া মহাপাপ বলিয়া মনে হয়।

চার্ব্বাক মুনি বলিয়াছেন "যদি যূপকাষ্ঠে পশুদিগকে নিহত করিলে উহারা স্বর্গে যায়, তবে তুমি তোমার বৃদ্ধ পিতা ও মাতাকে বলি দাও না কেন?"

আমার পুত্র হয় নাই। আমি কোন দেবতাকে মানত করিলাম যদি আমার পুত্র হয় তবে ছাগ বলি দিব। মানতের ফলে পুত্র হইতে পারে আবার নাও হইতে পারে।

"A leper once he lost but gained a king." Milton.

এক কুষ্ঠরোগী 'মলক' দেবতাকে মানত করিয়াছিল যদি তাহার কুষ্ঠরোগ সারিয়া যায়, তবে সে দেবতার পূজা দিবে। তাহার ঐ রোগের উপশম হয় নাই। কোন রাজার মানত সিদ্ধ হইয়াছিল। কুষ্ঠরোগী দেবতার নিন্দাবাদ করিয়া বেড়াইত এবং রাজা দেবতার উদ্দেশে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন।

দুই ভ্রাতার মধ্যে মোকদ্দমা বাধিয়াছিল। উভয়েই একই দেবতার নিকটে মানত করিয়াছিল যদি সে মোকদ্দমায় জিতে তবে সে দেবতাকে একটী 'ডেলাইট' (deylight) দিবে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা মোকদ্দায় জিতিয়াছিল বলিয়া দেবতাকে একটী ডেলাইট দিয়াছিল। অবশ্য দুই ভ্রাতার মধ্যে একজন ভ

জিতিবেই। ফলে দেবতার বা দেবতার সেবায়েতের একটী ডেলাইট লাভ হইল।

যদি আমার পুত্র জন্মিল আমি দেবতার উদ্দেশে বলি দিলাম। এরূপ মানতকে আসুরিক মানত বলিতে হইবে এবং যিনি বলি দিবেন তিনি নিশ্চয়ই অসুরভাবাপন্ন। যদি বলি দিবার সময়ে ঘাতক এককোপে ছাগটীকে বিনাশ করিতে সমর্থ না হয়, তবে জরিমানা স্বরূপ ডাইনে বামে দুইটী ছাগ বলি দিবার ব্যবস্থা আছে। একটী পুত্রের জন্য তিনটী প্রাণীর নাশ হইল। এরূপ প্রথা অতীব নৃশংস বলিয়া মনে হয়।

আমাদের দেশে মাংস খাওয়া সুবিধাজনক না হইলেও

"অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্।
ক্ষুদ্রাণি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্॥"

যাহাদের হাত নাই অর্থাৎ গবাদি পশু হস্তবিশিষ্ট মনুষ্যের খাদ্য। যাহাদের পা নাই অর্থাৎ তৃণাদি গবাদি পশুদিগের খাদ্য; অতএব জীবই জীবের জীবন।

জলবায়ু হিসাবে খাদ্যাখাদ্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। শীতপ্রধান দেশে অধিক পরিমাণে খাদ্যের প্রয়োজন হয় এবং মাংস ও সুরা ব্যবহার না করিলে শরীরেব প্রয়োজনমত তাপ থাকে না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অপেক্ষাকৃত কম খাদ্যের প্রয়োজন হয় এবং মাংস ও সুরা ব্যবহার করিলে শরীরের অনিষ্ট হয়। অধিক পরিমাণে মাংস বিশেষতঃ গোমাংস ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠরোগ হইবার সম্ভাবনা আছে এবং অত্যধিক সুরাপান করিলে যকৃতের পীড়া হইতে পারে। আর্য্যগণ যখন হিন্দুকোশ পর্ব্বতে ছিলেন তখন গোমাংস ও সুরার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এখন যেমন কোন লোক কোনও ভদ্রলোকের বাটীতে উপস্থিত হইলে এক কাপ্ চা দেওয়া হয়, সেইরূপ কোনও ভদ্রলোক অপর ভদ্রলোকের বাটীতে উপস্থিত হইলে তখন একটী ক্ষুদ্র বাটীতে কিছু মধু ও গোমাংস (পক্ক) দেওয়া হইত। এই আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,

তখন তাঁহারা দেখিলেন ভারতবর্ষ অপেক্ষাকৃত গরম দেশ; সুতরাং ঐ দুইটীর অর্থাৎ মদ্য ও মাংসের ব্যবহারে শরীরের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। তখন হইতে ঐ দুইটী দ্রব্য ত্যাজ্য হইল। যাহা পাপ তাহা চিরকালই পাপ; কল্য যাহা পুণ্য ছিল অদ্য তাহা পাপ হইবে কিম্বা পূর্ব্বে যাহা পাপ ছিল এখন তাহা পুণ্য হইবে, এরূপ হইতেই পারে না। সৃষ্টির আদি হইতে মিথ্যা বলা বা চুরি করা পাপ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে।

পাপ তিন প্রকার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। কার্ত্তিক মাসে শরীরে ক্রমাগত হিম লাগানকে বা আমাশয় পীড়ার উপর চা পান করাকে শারীরিক পাপ বলে; মনে মনে নানারূপ কুচিন্তা করার নাম মানসিক পাপ এবং মিথ্যা বলা বা চুরি করাকে আধ্যাত্মিক পাপ বলে।

যদি কাহারও কোন দিন মাংস খাইবার স্পৃহা জন্মে, তবে তিনি দেওয়ালে কাটিয়া ছাগমাংস খাইতে পারেন, তাহাতে তাঁহার তত পাপ হইবে না, যত পাপ হইবে দেবতার উদ্দেশে ছাগ বলি দিয়া খাইয়া, কারণ কোনও দেবতাই মাংস খান না। রক্ত, মাংস প্রভৃতি অসুরদিগের খাদ্য। নিরামিষ ও সাত্ত্বিক খাদ্যই দেবতাদিগকে নিবেদন করা যাইতে পারে।

কোনও এক ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্ব্বে কালী ঠাকুরের নিকটে মানত করিয়াছিল যদি সে উক্ত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারে তবে সে ছাগ বলি দিয়া ঠাকুরের পূজা দিবে। ছাত্র কৃতকার্য্য হইয়াছিল; সুতরাং সে বলি দিবার জন্য একটী ছোট নিখুঁত ছাগ ক্রয় করিয়াছিল। অমাবস্যার বিলম্ব ছিল বলিয়া ছাত্রটী ১৫।১৬ দিন ছাগশিশুটীকে পালন করিয়াছিল; তাহাতে তাহার ছাগশিশুর উপর মমতা জন্মিয়াছিল। ছাত্র তাহার পিতাকে বলিল "বাবা, আমি ছাগল বলি দিব না; আমার বোধ হইতেছে জীবহিংসা মহাপাপ।" তাহাতে তাহার পিতা বলিয়াছিলেন "বৎস, তাহা হইতে পারে না। যখন দেবতার নিকটে মানত করিয়াছ তখন বলি

দিতেই হইবে; তবে ভবিষ্যতে আর কখনও ছাগবলির মানত করিও না। সাত্ত্বিক পূজার মানত করাই উচিত।" অমাবস্যা তিথিতে পূজা ও বলির বন্দোবস্ত হইল। পুরোহিত মহাশয় পূজায় বসিলেন। বলির সময় উপস্থিত হইলে ছাত্রটী ছাগশিশুটীকে স্নান করাইয়া আনিল। তাহার হৃদয় ব্যথিত হইল কিন্তু পিতার আজ্ঞা বলি দিতেই হইবে। পূজক নিজেই ঘাতক এবং ছাগের মুণ্ডটী তাঁহার প্রাপ্য। পূজার নৈবেদ্য ও দক্ষিণাত আছেই। ছাগশিশুর মুণ্ড যূপকাষ্ঠে প্রবেশ করান হইল এবং ছাত্র চারিটী পা ধরিয়া টানিয়া রহিল। পূজক ও ঘাতক এমন কোপ মারিল যে ছাগের সম্মুখের একখানি ঠ্যাংএর অর্দ্ধেক কর্ত্তিত হইয়া গেল। এরূপ কর্ম্ম অতীব নৃশংস বলিতে হইবে।

কামাদি ষড়রিপুর মধ্যে লোভই সর্ব্বপ্রধান। বয়সের তারতম্যে লোভ ব্যতীত অন্য পঞ্চরিপুর প্রভাব কমিয়া আসিতে পারে, কিন্তু লোভের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

রাজা বিক্রমাদিত্যের স্কন্ধস্থিত বেতাল বিক্রমাদিত্যকে বলিতেছে—

মহারাজ, কোন গ্রামে এক কন্যা বাস করিত। দুই ক্রোশ দূরে এক গ্রামের কোনও যুবকের সহিত তাহার বিবাহের কথা হইয়াছিল। প্রথা অনুসারে কন্যাকে বরের গৃহে গিয়া বিবাহ করিতে হইবে। রাত্রি এগারটার সময়ে বিবাহের লগ্ন ছিল। রাত্রি নয়টার সময়ে কন্যা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বরের গৃহাভিমুখে যাইতেছিল। এক ক্রোশ দূরে এক রাক্ষসী কন্যাকে দেখিয়া বলিল "বাছা, আর অগ্রসর হইও না, আমি তোমাকে ভক্ষণ করিয়া উদরের জ্বালা নিবারণ করিব।" কন্যা বলিল "দেখ আজ রাত্রিতে আমার বিবাহ হইবে, অবিবাহিত অবস্থায় আকাঙ্ক্ষার সহিত প্রাণত্যাগ করিলে, আমার হীনগতি হইবে। আমি অনুনয় করিতেছি আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি বিবাহ হইয়া গেলে আমি তোমার নিকটে আসিব, তখন তুমি আমাকে খাইও।" রাক্ষসী কি ভাবিয়া কন্যাকে অব্যাহতি দিল।

আধ ক্রোশ দূরে এক গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে কন্যা দেখিল এক ব্রাহ্মণ যুবক বাহিরের দাওয়ায় শুইয়াছিল। ব্রাহ্মণ কন্যাকে দেখিয়া বলিল "তাহা হইবে না, আমাকে সন্তুষ্ট না করিয়া তুমি যাইতে পাইবে না।" কন্যা বলিল "দেখুন আমি অনূঢ়া কন্যা, অদ্য রাত্রিতে আমার বিবাহ হইবে। আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন; আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি বিবাহ হইয়া গেলে আমি পুনরায় আপনার নিকটে ফিরিয়া আসিব।" ব্রাহ্মণ কি ভাবিয়া কন্যাকে অব্যাহতি দিল। অল্পদূর গিয়া কন্যা দেখিল একদল ডাকাত কালীপূজা করিতেছিল। সর্দ্দার কন্যাকে সালঙ্কারা দেখিয়া বলিল "গহনাগুলি খুলিয়া যাও, নচেৎ আমরা মারিয়া কাড়িয়া লইব।" কন্যা বলিল "অদ্য রাত্রিতে আমার বিবাহ হইবে। সালঙ্কারা হইয়া বিবাহ করা উচিত। তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও; আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি বিবাহ হইয়া গেলে আমি তোমার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে গহনাগুলি দিয়া যাইব।" সর্দ্দার কি ভাবিয়া কন্যাকে যাইতে দিল।

কন্যা সাড়ে দশটায় সময়ে বরের নিকটে উপস্থিত হইল এবং যথাসময়ে উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহ হইয়া গেলে কন্যা তাহার স্বামীকে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া নিজ বাক্য রক্ষা করিবার জন্য চলিয়া আসিবার অনুমতি চাহিল। স্বামী সরল অন্তঃকরণে অনুমতি দিল। কন্যা ডাকাতের সর্দ্দারের নিকটে আসিয়া বলিল "সর্দ্দার আমি আসিয়াছি; আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তুমি এই গহনাগুলি লও।" সর্দ্দার বলিল "পাগলী মেয়ে, তোমার মত সত্যবাদিনী কন্যার গহনা লওয়া অতিবড় গর্হিত কার্য্য হইবে। আমি ভাবিতে পারি নাই তুমি ফিরিয়া আসিবে। যাও তুমি স্বস্থানে।" কন্যা ব্রাহ্মণ যুবকের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "ব্রাহ্মণ আমি আসিয়াছি।" ব্রাহ্মণ বলিল "যাও মা, তুমি স্বগৃহে যাও। আমি মনেই করি নাই তুমি আবার ফিরিয়া আসিবে।"

তখন কন্যা জঙ্গলে রাক্ষসীর নিকটে গিয়া বলিল "রাক্ষসি আমি ফিরিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে তুমি আমাকে খাইতে পার।" রাক্ষসী বলিল "যা যা আর তোকে খাব না, তুই যে আবার ফিরিয়া আস্‌বি এই ধারণাই আমি করি নাই।" কন্যা পুনরায় তাহার স্বামীর নিকটে আসিয়া সর্দ্দার, ব্রাহ্মণ ও রাক্ষসী যাহা যাহা বলিয়াছিল সমস্ত বৃত্তান্তই প্রকাশ করিয়া বলিল "এক্ষণে আপনি আমাকে গ্রহণ করিবেন কি না বলুন।" তাহাতে তাহার স্বামী বলিল "নিশ্চয়ই, তোমার মত গুণবতী ও সাধ্বী বালিকাকে গ্রহণ না করা মহাপাপ।"

দেখা গেল কন্যার, কন্যার স্বামীর, সর্দ্দারের, ব্রাহ্মণের এবং রাক্ষসীর ইহাদের প্রত্যেকরই মহত্ব ছিল। এক্ষণে মহারাজ বলুন দেখি ইহাদের মধ্যে কাহার মহত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক? রাজা বিক্রমাদিত্য কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "আমার বোধ হয় সর্দ্দারের মহত্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কারণ কন্যা সর্ব্বত্রই নিজ কর্ত্তব্য করিয়াছিল; কন্যার স্বামীর কন্যার প্রতি অবিশ্বাসের কোনও কারণ ছিল না। ভোর হওয়ায় ব্রাহ্মণের জঘন্য প্রবৃত্তি কমিয়া আসিয়া থাকিবে। রাক্ষসী হয়ত অন্য আহারে উদর পূর্ত্তি করিয়াছিল; তজ্জন্য তখন তাহার ক্ষুধা ছিল না; কিন্তু চোরের কখনও ধনাগমের আশা কমে না। কেহই মনে করে না আমার অর্থ যথেষ্ট আছে, আর অর্থে প্রয়োজন নাই। চোরের আশা কখনও মিটে না। সেই ডাকাতের সর্দ্দার যখন গহণার লোভ ছাড়িয়া ছিল তখন বুঝিতে হইবে চোরের মহত্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।" বেতাল রাজার যথার্থ উত্তর শ্রবণ করিয়া পুনরায় শিংশপাবৃক্ষে ঝুলিতে লাগিল।

এই লোভ মৃত্যু পর্য্যন্ত থাকিয়া যায় ইহাকে সহজে ত্যাগ করা যায় না।

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডম্, দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃত কম্পিত শোভিত দণ্ডম্, তদপিনমুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্॥

মোহমুদ্গর।

অঙ্গ লোল হইয়া যায়, মস্তক কেশবিহীন হয়। চোয়াল দন্তশূন্য হইয়া যায়, হস্তস্থিত দণ্ড কাঁপিতে থাকে, তথাপি আশার ত্যাগ হয় না।

লোভ শুধু থাকিয়া যায় না, ইহা বয়সের বৃদ্ধির সহিত নবভাব ধারণ করিতে থাকে।

"জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ।
জীর্য্যতশ্চক্ষুষী শ্রোত্রে তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে ॥"

চুল পাকিয়া যায়, দাঁত পড়িয়া যায়, চক্ষু ও কর্ণ বিকল হইয়া যায়, লোভ কিন্তু নূতনভাব ধারণ করিতে থাকে।

"Hope springs eternal in human breast,
Man never is but always to be blest. Pope.

মানবহৃদয়ে আশা সততই উদিত হয়। মানুষ সুখের জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত কিন্তু সে কখনও সুখী হইতে পারে না।

এক আশার তরঙ্গ শেষ হইতে না হইতে অন্য এক তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। মানুষের আশার শেষ নাই বলিয়া সে সুখী হইতে পারে না। ভোগে সুখ হয় না; যদি সুখ থাকে, তবে ত্যাগেই আছে। একমাত্র সন্তোষই প্রকৃত সুখ আনয়ন করিতে পারে। অজ্ঞান বা ষড়রিপুই দুঃখের কারণ।

"ত্যাগাচ্ছান্তি রনন্তরম্"। গীতা ১২।১২
"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।" গীতা ৫।১৫

অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায় জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হয়। কাম ও লোভ ভোগের দ্বারা তৃপ্ত হয় না বরং ভোগ্য বস্তু পাইলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

"সহস্রমিচ্ছতি শতী সহস্রী লক্ষমীহতে।
লক্ষাধিপস্তথা রাজ্যং রাজ্যস্থঃ স্বর্গমীহতে॥"

যাহার শত মুদ্রা আছে সে মনে করে তাহার সহস্র মুদ্রা হউক। যাহার সহস্র মুদ্রা আছে সে লক্ষ মুদ্রার জন্য আশা করে। আবার যাহার লক্ষ মুদ্রা আছে সে রাজ্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে এবং রাজা ইন্দ্রত্ব কামনা করে।

অতএব আশার শেষ কোথায়? এই দুষ্পূর আশা বা লোভ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে ইহাকে হরিপাদপদ্মে ধাবিত করা। হিংসা পাপ, কারণ স্বর্ণ ও লৌহের বিবাদে স্বর্ণ লৌহকে বলিয়াছিল

"হিংসা পাপ অতি মন্দ কভু নহে ভাল।
হিংসার কারণে তোর বর্ণ হ'লো কাল॥"

অতএব এই হিংসা নিন্দনীয়, কিন্তু ছাত্রদিগের মধ্যে অর্থাৎ পাঠে হিংসা পাপ নহে বরং প্রশংসনীয়; সেইরূপ হরিপাদপদ্মে লোভ পাপ নহে বরং প্রশংসনীয়।

লোভই সর্ব্বনাশের হেতু

"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।"

চন্দ্র নামে কোনও ভূপতির হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, মেষ, বানর ইত্যাদি ছিল। রাজপুত্রগণ বানরদিগের নৃত্যে আনন্দলাভ করিত। একটী মেষ লোভ বশতঃ প্রত্যহ রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া তরকারির খোলা ইত্যাদি ভক্ষণ করিত এবং পাচক যে দিন যাহা সম্মুখে পাইত (অর্থাৎ হাতা, খুন্তি ইত্যাদি) তদ্দ্বারা মেষকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিত। বানরদলের মধ্যে একটী শিক্ষিত নেতা ছিল। এই দলপতি মেষ ও পাচকের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বানরদিগকে একত্রিত করিয়া বলিল "ভাই সব, যদি প্রাণের মায়া রাখ তবে ত্বরায় এস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন কর।" নবীন বানরগণ কারণ জিজ্ঞাসা করায় দলপতি বলিল "এই যে মেষটী লোভের বশীভূত হইয়া প্রত্যহ

রন্ধনশালায় তরকারির খোলা ইত্যাদি খাইতে যায়, ইহাই আমাদিগের মৃত্যুর কারণ হইবে; যেহেতু পাচক যেদিন যাহা পায় তাহা দ্বারা মেষকে প্রহার করে, এমন একদিন আসিতে পারে বা আসিবে যে দিন পাচক সম্মুখে অন্য কিছু না পাইয়া অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ দ্বারা মেষকে প্রহার করিবে। মেষের লোমে আগুণ লাগিলে উহা নিভাইবার অভিপ্রায়ে মেষ নিকটস্থ অশ্বশালায় গমন করিয়া স্তূপীকৃত তৃণরাশির উপর নিজ পৃষ্ঠদেশ অবলুণ্ঠন করিতে থাকিবে। সুতরাং রজ্জুবদ্ধ অশ্বগণ চোখ ফাটিয়া প্রাণত্যাগ করিবার উপক্রম করিবে।”

দলপতির পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া উদ্ধত বানরগণ বলিয়া উঠিল “ঘোড়াগুলি পুড়িয়া গেল ত আমাদের কি?” দলপতি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল “নিদানে আছে—

কপীনাং বসয়াশ্বানাং বহ্নিদাহনমুদ্ভবা।
ব্যথা বিনাশমভ্যেতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥

যদি অশ্বগণ পুড়িয়া যায় তবে বানরের চর্ব্বি প্রয়োগ করিবামাত্র সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় অশ্বের ব্যথা দূরীভূত হইবে। একটী বানরের মূল্য আট আনা ও একটী অশ্বের মূল্য পঞ্চাশ টাকা; সুতরাং পঞ্চাশ মুদ্রা বাঁচাইবার জন্য আট আনা মূল্যের বানর নিহত করিতে রাজা দ্বিধা বোধ করিবেন না।” এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নবীন বানরগণ দলপতিকে উপহাস করিয়া বলিল “বুড়া হইলে সকলেরই ভীমরতি হয়। কবে কি ঘটিবে এরূপ অনিশ্চিত বিষয় ভাবিয়া রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া কটু, তিক্ত ও কষায় পাতা ও ফল ভক্ষণ করিতে বনে যাইতে হইবে?” তখন দলপতি বলিল “যখন তোমরা সদুপদেশ অবহেলা করিলে, তখন তোমরা দুর্জ্জন। দুর্জ্জনকে সর্ব্বদা পরিহার করা উচিত।” এই বলিয়া দলপতি বানরদল পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রবেশ করিল। দলপতি বনে থাকিয়াও তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হইল কি না এই সংবাদ লইতে ভুলে নাই। কালক্রমে দলপতি যাহা বলিয়াছিল তাহাই

ঘটিল। একদিন পাচক সম্মুখে অন্য কোন দ্রব্য না পাইয়া অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ দ্বারা মেষকে প্রহার করিল এবং মেষ সেই অবস্থায় শুষ্ক তৃণরাশির উপর নিজ পৃষ্ঠদেশ অবলুণ্ঠন করিতে থাকায় অশ্বশালা মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মীভূত হইয়া গেল এবং অশ্বগণ রজ্জুবদ্ধ থাকায় দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার উপক্রম করিল। চন্দ্রভূপতি এই প্রকার দুঃসংবাদ শ্রবণে চিন্তিত হইয়া বৈদ্যরাজকে আহ্বান করতঃ অশ্বগণের ব্যথা নিবারণের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। বৈদ্যরাজ নিদানের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, বানরের চর্ব্বি প্রলেপ করিবামাত্র অশ্বগণ আরোগ্য লাভ করিবে।" তৎক্ষণাৎ বানরদল নিহত হইল। দলপতি বংশনাশের নিদারুণ সংবাদ অবগত হইয়া অত্যন্ত বিষণ্নচিত্তে বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিল।

দৈবযোগে একদিন এক কাকচক্ষু সরোবরের নিকটে গিয়া দলপতি তৃষ্ণার্ত্ত হইল এবং জলপানের অভিপ্রায়ে ঘাটে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্য করিল যাবতীয় জীবজন্তুর পদচিহ্ন ঘাটের দিকে, একটীরও গোড়ালী ঘাটের দিকে ছিলনা। ইহা হইতে সে স্থির করিল নিশ্চয়ই সরোবরাভ্যন্তরে এমন কোন জীব আছে যদ্দ্বারা প্রাণিগণ জলপান করিবার অভিপ্রায়ে জলে নামিলেই ভক্ষিত হয়। তখন দলপতি পদ্মনালের সাহায্যে জলপান করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে সরোবরাভ্যন্তরস্থিত রাক্ষস দিব্য রত্নমালা গলে পরিধানকরতঃ জল হইতে উঠিয়া অতীব বিস্মিত হইয়া দলপতিকে বলিল "ভাই বানর, আমি বহুকাল হইতে এই সরোবরে আছি; যে জলে নামিয়াছে আমি তাহাকেই ভক্ষণ করিয়াছি। তোমার মত চতুর প্রাণী কাহাকেও দেখি নাই। তোমার সহিত মিত্রতা করিতে বাসনা হইতেছে।" তখন উভয়ে সূর্য্যকে সাক্ষ্য করিয়া মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইল।

একদা রাক্ষস দলপতির বিষণ্নতার কারণ জানিতে চাহিলে দলপতি বলিল "তুমি কত প্রাণী খাইতে পার?" রাক্ষস বলিল "যদি লক্ষ লক্ষ প্রাণী জলের সহিত সংযুক্ত থাকে, তবে ব্রহ্মার বরে আমি সকল প্রাণীকেই এক নিঃশ্বাসে

ভক্ষণ করিতে পারি কিন্তু জলের বাহিরে শৃগালও আমাকে নিন্দা করিয়া চলিয়া যায়।" তখন দলপতি বলিল "তবে আমার বিষণ্ণতার কারণ শুন। কোন রাজার সহিত আমার শক্রতা আছে। তিনি আমার বংশ নাশ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইয়াছে। যদি তুমি অনুগ্রহ করিয়া তোমার রত্নমালাটী ধার দাও, তবে আমি ছলে ও কৌশলে সেই রাজাকে সপরিবারে এই সরোবরে আনিতে পারি এবং তুমি তাঁহার পরিজনকে খাইয়া ফেলিলে আমার প্রতিহিংসা সাধিত হইবে।" তদুত্তরে রাক্ষস বলিল "বন্ধুকে অদেয় কি থাকিতে পারে?" দলপতি গলদেশে রত্নমালা পরিধান করিয়া চন্দ্রভূপতির প্রাসাদে উপস্থিত হইল। রাজা দিব্য রত্নমালার সংবাদ পাইয়া দলপতিকে ক্রোড়ে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দলপতি, এতদিন কোথায় ছিলে এবং এরূপ অপূর্ব্ব রত্নমালা কোথায় ও কি প্রকারে পাইলে?" দলপতি উত্তর করিল "মহারাজ, তীর্থে ভ্রমণ করিতে করিতে এক সরোবরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যে সরোবরে ডুবিতেছিল তাহারই গলদেশে এরূপ রত্নমালা লাগিয়া গেল। আমিও ডুবিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে এই রত্নমালাটী আমারও গলদেশে লাগিয়া গেল।" রাজা বলিলেন "বল কি দলপতি?" দলপতি বলিল "আপনি প্রভু, আপনার নিকটে কি মিথ্যা বলিতে পারি?" রাজা অত্যন্ত লোভী ছিলেন সুতরাং অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সপরিবারে সেই সরোবরে যাইবার জন্য ব্যবস্থা করিলেন। সকলেই অশ্বযানে গমন করিল, কেবল রাজা দলপতিকে ক্রোড়ে লইয়া নরবাহনে চলিলেন। নির্দ্দিষ্ট সরোবরে উপস্থিত হইয়া দলপতি বলিল "মহারাজ এই সেই সরোবর, সকলেই এক সঙ্গে ডুব দিক, কেবল আপনি ও আমি পরে ডুবিব।" নরপতির মনে বহু রত্নমালা পাইবার কথাই উদিত হইতেছিল, তাহাতে তিনি লোভে এক প্রকার অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি সামান্য বনের পশুর কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পরিজনকে এমন কি বাহকদিগকে জলে নামিবার আদেশ দিলেন। পাঁচ সাত মিনিট পরে যখন কেহই গলে মালা

লইয়া জল হইতে উঠিল না, তখন রাজা বলিলেন "দলপতি, সকলে গলে মালা লইয়া উঠিতেছে কই?" দলপতি বলিল "থামুন মহারাজ, মালা গলায় লাগুক, তবেত সকলে উঠিবে।" আরও পাঁচ সাত মিনিট পরেও যখন কেহই জল হইতে উঠিল না, তখন রাজা চিন্তিতচিত্তে বলিলেন "এক্ষণে আমার বড় ভয় হইতেছে, এখনও কেন একজনও জল হইতে উঠিল না।" তখন দলপতি রাজার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল "মূর্খ ও লোভী রাজা, মনে নাই তুমি আমার বংশ নাশ করিয়াছ? আমিও তোমার বংশ নাশ করিলাম। জলের ভিতরে রাক্ষস আছে, সে তোমার পরিজন ও বাহকদিগকে ভক্ষণ করিয়াছে। তুমি ডুবিলে কে আমার মত যন্ত্রণা ভোগ করিবে? যাও, পদব্রজে গৃহে ফিরিয়া যাও। এতদিনে ঋণ পরিশোধ করিলাম।" চন্দ্রভূপতি কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়া গেল।

রাক্ষস উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে জল হইতে উঠিয়া বলিল "ভাই মিতে, অনেক দিন এরূপ ভূরিভোজন হয় নাই। তোমার প্রতিহিংসা সাধনে আমি যারপর নাই হৃষ্ট হইয়াছি।" তখন দলপতি বলিল "মিতে, আমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে তোমার মালা লও।" তাহাতে রাক্ষস বলিল "ভাই মিতে, দত্তাপহারী হইতে ইচ্ছা নাই। তুমি অতি চতুর ও পণ্ডিত; তুমি মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাকে শাস্ত্রকথা শুনাইও, যাহাতে আমি শীঘ্র রাক্ষস জন্ম হইতে নিষ্কৃতি পাই; আমি শাপে রাক্ষস যোনি প্রাপ্ত হইয়াছি।"

লোভ অত্যন্ত দুর্জ্জয়। লোভের পরিণাম ভয়ানক; লোভের বশীভূত হইলে মরিব কি বাঁচিব এরূপ জ্ঞান থাকে না।

এক বৃদ্ধা পাকা কলা লইয়া বসিয়াছিল। এক কাকের লোভ জন্মিল। সে বৃদ্ধার নিকটে গিয়া বলিল "বুড়ি, একটী পাকা কলা দাওনা, খাইব।" বৃদ্ধা বলিল "তুমি ঠোঁট ধুইয়াছ?" কাক বলিল "না"। বৃদ্ধা বলিল

"তুমি ঠোঁট ধুইয়া আইস, তবে কলা দিব।"

কাক বলিল "ঠোঁট ধুইয়া আসিলে কলা দেবেত?" বৃদ্ধা বলিল "নিশ্চয়ই।" তখন কাক গঙ্গার নিকটে গিয়া বলিল

"হে গঙ্গে হে গঙ্গে দেওনা পানি,
ধুইব ঠুটি,
তবে খাব বুড়ির পাকা কলাটী।"

গঙ্গা বলিলেন "জলেরত অভাব নাই; কিন্তু তোর অপবিত্র ঠোঁট আমার পবিত্র জলে ডুবাইতে দিব না। তুই টাটি আনিতে পারিস্, তাহা হইলে উহার দ্বারা জল তুলিয়া ঠোঁট ধুইতে পাইবি।"

তখন কাক কুমারের নিকটে গিয়া বলিল

"হে কুমার, হে কুমার দেওনা টাটি,
তুল্‌বো পানি ধুইব ঠুটি,
তবে খাব বুড়ির পাকা কলাটী।"

কুমার বলিল "একটী টাটি দিব তা আর বেশী কথা কি? কিন্তু মাটীর অভাবে চারিদিন শাল বন্ধ আছে; তুমি মাটী আনিয়া দিলে আমি এখনই টাটি গড়িয়া দিতে পারি।"

কাক পৃথিবীর নিকটে গিয়া বলিল

"হে পৃথিবি, হে পৃথিবি, দেওনা মাটী,
দেব কুমারকে, দেবে টাটি,
তুল্‌বো পানি, ধুইব ঠুটি,
তবে খাব বুড়ির পাকা কলাটী।"

পৃথিবী বলিলেন "তাইত রে কাক, মাটীরত অভাব নাই, কিন্তু তুই খুঁড়্‌বি কিসে? হরিণের শিং আনিতে পারিস্, তাহ'লে শিং দ্বারা মাটী খুঁড়িতে পাইবি।" কাক বলিল "হরিণের শিং আনিলে, মাটী খুঁড়্‌তে দেবেত?" পৃথিবী বলিলেন "নিশ্চয়ই।"

তখন কাক হরিণের নিকটে গিয়া বলিল

"হে হরিণ, হে হরিণ দেওনা শিং,
খুঁড়্‌বো মাটী,
দেব কুমারকে দেবে টাটি,
তুল্‌বো পানি ধুইব ঠুটি,
তবে খাব বুড়ির পাকা কলাটী।"

হরিণ বলিল "তাইত রে ভাই কাক, শিং দিব তা আর বিচিত্র কি? শুনিয়াছি দধিচী মুনি দেবতাদিগের হিতার্থে নিজ প্রাণ দিয়াছিলেন। আমারত হাত নাই যে শিং ভাঙ্গিয়া দিব। গায়ে বলও নাই যে পাহাড়ের সহিত যুদ্ধ লাগিতে সমর্থ হইব। তুমি যদি কালী গাইএর দুধ আনিয়া দিতে পার, তবে দুধ খাইয়া এখনি গায়ে বল করিয়া পাহাড়ের সহিত যুদ্ধ লাগিলেই শিং খসিয়া পড়িবে।"

তখন কাক কালী গাইএর নিকটে গিয়া বলিল

"হে কালী গাই, হে কালী গাই, দেওনা দুধ,
খাবে হরিণ লাগ্‌বে যুধ,
পড়্‌বে শিং খুঁড়্‌বো মাটী,
দেব কুমারকে দেবে টাটি,
তুল্‌বো পানি ধুইব ঠুটি,
তবে খাব বুড়ির পাকা কলাটী।"

কালী গাই বলিল "তাইত ভাই কাক, দুধ দিব তা আর বেশী কথা কি? কিন্তু ঘাসের অভাবে আমার গায়ের রস একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। যদি তুমি নর্ম্মদা নদীতীরস্থ লম্বা লম্বা ঘাস আনিয়া দিতে পার, তবে ঐ ঘাস খাইয়া আমি এখনি দুধ দিতে পারিব।"

কাক বলিল "ঘাস আনিয়া দিলে, দুধ দেবেত?" কালী গাই বলিল "নিশ্চয়ই।"

তখন কাক নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইয়া বলিল

"হে নর্ম্মদে হে নর্ম্মদে দেওনা ঘাস
খাবে কালী গাই দেবে দুধ,
খাবে হরিণ লাগ্‌বে যুধ,
পড়্‌বে শিং খুঁড়্‌বো মাটী,
দেব কুমারকে দেবে টাটি,
তুল্‌বো পানি ধুইব ঠুটি,
তবে খাব বুড়ির পাকা কলাটী।"

নর্ম্মদা বলিলেন "তাইত রে ভাই কাক, ঘাসত বিস্তর রহিয়াছে, কিন্তু তুই কাট্‌বি কিসে? দা আনিতে পারিস্, তা'হলে দা দিয়া ইচ্ছামত ঘাস কাটিয়া লইতে পাইবি।" কাক বলিল "দা আনিলে ঘাস কাট্‌তে দেবেত?" নর্ম্মদা বলিলেন "নিশ্চয়ই।"

তখন কাক কামারের নিকটে গিয়া বলিল,

"হে কামার হে কামার দেওনা দা,
কাট্‌বো ঘাস খাবে কালী গাই,
দেবে দুধ খাবে হরিণ লাগ্‌বে যুধ,
পড়্‌বে শিং খুঁড়্‌বো মাটী,

দেব কুমারকে দেবে টাটি,
তুল্‌ব পানি ধুইব ঠুটি,
তবে খাব বুড়ির পাকা কলাটী।"

কামার বলিল "তাইত রে ভাই কাক, একটা দা গ'ড়ে দোবো তা আর বেশী কথা কি? পরোপকারের জন্য কত লোক কত কাজ করিতেছে, কিন্তু অগ্নি বিহনে আজ তিন দিন শাল বন্ধ আছে। তুমি যদি আগুণ আনিয়া দিতে পার, তবে আমি এখনি দা গড়ে দিতে পারি।"

কাক বলিল "আগুণ আনিয়া দিলে, দা গ'ড়ে দেবেত?" কামার বলিল "নিশ্চয়ই।"

তখন কাক অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া এক গৃহস্থের নিকটে গিয়া বলিল—

"হে গৃহস্থ, হে গৃহস্থ দেওনা আগুণ,
দেব কামারকে, গড়্‌বে দা দেবে আমাকে
কাট্‌বো ঘাস, খাবে কালী গাই, দেবে দুধ,
খাবে হরিণ লাগ্‌বে যুধ,
পড়্‌বে শিং খুঁড়বো মাটী,
দেব কুমারকে দেবে টাটি,
তুল্‌বো পানি ধুইব ঠুটি,
তবে খাব বুড়ির পাকা কলাটী।"

গৃহস্থ বলিল "হায় মতিহীন, আগুণ লইবি কিসে? তোমার পাত্র কই?" তাহাতে কাক বলিল "আর ভাই, পাত্রাপাত্রের বিচার করিতে গেলে আমার কলা খাওয়া হয় না। এই ডানা বিস্তার করিলাম, তুমি আগুণ দাও। জানিও এই আগুণের উপর নির্ভর করিতেছে আমার কলা খাওয়া।" গৃহস্থ কাকের ডানায় অগ্নি প্রদান করিবামাত্র

"ধড়্‌ফড়্‌করি' কাক পুড়িয়া মরিল।"

"যতন করিলে লভে রতন নিশ্চয়,
তা ব'লে সাপের মাথে বেঙ কোথা নাচে।
দেখ কাক হাতে হাতে পুড়িয়া মরিছে,
লোলুপের পরিণাম এইরূপে হয়॥"

অতএব
"অতি লোভো ন কর্ত্তব্যো লব্ধং নৈব পরিত্যজেৎ।
অতি লোভাভিভূতস্য চক্রং ভ্রমতি মস্তকে॥"

বেশী লোভ করা ভাল নহে এবং ভগবৎ কৃপায় যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাও পরিত্যাগ করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত লোভ করে তাহার মাথায় চাকা ঘুরে।

কোনও স্থানে চারিজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিত। ভিক্ষাই তাহাদিগের উপজীবিকা ছিল। দৈবযোগে দেশে দুর্ভিক্ষ করাল গ্রাস বিস্তার করায় তাহারা তিন দিবস ভিক্ষা পাইল না। তাহাতে তাহাদিগের দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইল। তখন তাহারা স্থির করিল পলে পলে মরা অপেক্ষা একেবারে মরা ভাল। পর দিবসের প্রাতে তাহারা এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত এক সরোবরে অবগাহন স্নান করিয়া ফুল ও বিল্বপত্র চয়ন করিয়া তত্রাবস্থিত মহাকাল ভৈরবের পূজা সমাপন করিয়া বর প্রার্থনা করিল "হে প্রভো, জঠর যন্ত্রণায় আমরা আত্মঘাতী হইব, আপনি কৃপাপরবশ হইয়া ঐ পাপ হইতে আমাদিগকে অব্যাহতি দিবেন।" তাহারা এক গলা জলে নামিলে তীর হইতে জনৈক জটাধারী সন্ন্যাসী তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে পুত্রগণ, কি জন্য তোমরা এরূপ শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছ? আত্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, ইহার ফল অনন্ত নরক।" ব্রাহ্মণগণ কারণ বলিলে,

সন্ন্যাসী বলিলেন "বৎসগণ, অর্থাভাবে মরিতে হইবে না। আমি তোমাদিগকে একটী করিয়া বাতি দিতেছি। বরাবর দক্ষিণ দিকে যাইবে, যেখানে হাত হইতে বাতি পতিত হইবে, জানিবে সেইখানে ধন আছে। ইচ্ছামত ধন গ্রহণ করিবে; কিন্তু সাবধান! অতি লোভ করিয়া সিদ্ধিভূমির সীমা অতিক্রম করিও না, করিলে বিপদ হইবে।"

বিশ ক্রোশ রাস্তা হাঁটার পরে একজনের হাত হইতে বাতি ভূমিতে পতিত হইল। তথায় তাম্রের খনি পরিলক্ষিত হইল। যাহার হাত হইতে বাতি পড়িল সেই ব্রাহ্মণ বলিল "ভাই আর অধিক দূর গিয়া কাজ নাই। প্রচুর তামা রহিয়াছে। ইচ্ছামত তামা লইয়া চল গৃহে গিয়া সুখে বাস করি।" অপর তিনজন ব্রাহ্মণ বলিল "তাও কি হয়? আমাদিগের বাতি পড়ে নাই। কতকগুলা তামা লইয়া কি হইবে? অগ্রে নিশ্চয়ই রূপা আছে; তাহা লইয়া গৃহে যাইব। তুমিও অগ্রসর হও।" তাম্রপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ বলিল "না ভাই, আমি ইহাতেই সন্তুষ্ট আছি।" আরও বহুদূর অগ্রসর হইলে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের হাত হইতে বাতি পড়িয়া গেল। বাস্তবিকই সেখানে রূপার খনি ছিল। অনেক অনুনয় সত্ত্বেও অপর দুই ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইল। ষাট ক্রোশ দূরে তৃতীয় ব্রাহ্মণের হাত হইতে বাতি পড়িয়া গেল। তথায় সোণার-খনি বাহির হইল। তৃতীয় ব্রাহ্মণ বলিল "ভাই, আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই; চল দুইজনে প্রচুর পরিমাণে সুবর্ণ লইয়া গিয়া দেশে রাজার হালে দিন কাটাইব।" চতুর্থ ব্রাহ্মণ (যাহার হাত হইতে বাতি পড়ে নাই) বলিল "দূর্ বোকা, প্রথমে তামা, পরে রূপা, এক্ষণে সোণা, অগ্রে নিশ্চয়ই মাণিক আছে। অতএব সোণা লইয়া কি হইবে? সামান্য মাণিক করচে গুঁজিয়া বাটী যাইব। তুমিও অগ্রসর হও।" তৃতীয় ব্রাহ্মণ বলিল "ভাই আমি ইহাতেই সন্তুষ্ট আছি; আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করি না; তবে আমি তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছি।"

চতুর্থ ব্রাহ্মণ শতক্রোশ পথ অতিক্রম করিল তথাপি তাহারা হাত হইতে বাতি পড়িল না। অবশেষে সে সিদ্ধিভুমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন মাণিক পাইবার আশায় সেই লোভী ব্রাহ্মণ মহাকাল ভৈরবের নিষেধাজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া সিদ্ধিভূমির সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ কোথা হইতে ব্রাহ্মণের দারুণ পিপাসা আসিয়া জুটিল। ব্রাহ্মণ পিপাসায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে দেখিতে পাইল অদূরে একটী মনুষ্য দাঁড়াইয়াছিল। যখন মনুষ্য আছে এবং প্রত্যেক মনুষ্যকে জলপান করিতে হয়, তখন জল নিশ্চয়ই আছে ইহা স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ অতি দ্রুতবেগে সেই লোকটীর নিকটে গমন করিল। সেখানে গিয়া ব্রাহ্মণ যাহা দেখিল তাহাতে তাহার গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল। সেই দণ্ডায়মান লোকটীর মস্তকে একখানি লোহার চাকা ঘুরিতেছিল। তাহার মস্তক হইতে শোণিত গড়াইতেছিল। তাহার মুখের ভঙ্গী দেখিয়া অনুমিত হইল সে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। পিপাসা হইতে রক্ষা পাইবার মানসে ব্রাহ্মণ সেই লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিল "ভাই হে, জল কোথায় আছে বলিতে পার? তৃষ্ণায় আমার প্রাণ বাহিবার উপক্রম হইতেছে।" মুহূর্ত্তমধ্যে চাকাটী লোকটীর মস্তক হইতে উঠিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণের মস্তকে বসিল ও দ্রুতবেগে ঘুরিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের পিপাসা অন্তর্হিত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ এরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে লোকটী বলিল "ভাই হে, আমিও তোমার মত লোভের বশীভূত হইয়া মহাকাল ভৈরবের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এই স্থানে আসিয়া অপর একজন লোককে এইরূপ অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। এই স্থানের মহিমা এই যে এখানে আসিলেই তৃষ্ণার্ত্ত হইতে হয়। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আমি সেই লোকটীকে জলের কথা জিজ্ঞাসা করায় চাকাটী তাহার মস্তক হইতে আমার মস্তকে বসিয়াছিল। তদবধি ক্ষুধাতৃষ্ণা বিবর্জ্জিত হইয়া এই খানেই আছি।" তখন ব্রাহ্মণ বলিল "তুমি কত দিন এখানে ছিলে" লোকটী বলিল "এখানে ত ভাই পাঁজি পুঁথি নাই;

সুতরাং বৎসর মাস দিনের হিসাব করা যায় না। তবে ভারতবর্ষে এখন রাজা কে বলিতে পার?" ব্রাহ্মণ বলিল "এক্ষণে বীণাবৎস ভারতবর্ষের রাজা"। লোকটী বলিল "ভাই হে, যখন রামচন্দ্র ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন, তখন আমি এখানে আসিয়াছিলাম। অতএব কত বৎসর হয় হিসাব করিয়া লও। যাহা হউক তুমি পূর্ব্বজন্মে আমার কেহ ছিলে, তুমি আমার অশেষ উপকার করিলে। তোমার প্রসাদে আমি যন্ত্রণা হইতে নিস্কৃতি পাইলাম। এক্ষণে অনুমতি দাও গৃহে যাই।"

স্বর্ণ প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ চতুর্থ ব্রাহ্মণের অযথা বিলম্ব দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করতঃ গৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং ব্রাহ্মণের আত্মীয়বর্গকে এই নিদারুণ সংবাদ প্রদান করিলেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি সেই ব্রাহ্মণের মস্তকে চক্র এখনও ঘুরিতেছে; কেননা আর কোন লোক লোভ বশতঃ তথায় গমন করে নাই; করিলে আমরা অবশ্যই সংবাদ পাইতাম।

এহেন লোভ যে মহানুভব ব্যক্তি জয় করিতে সমর্থ হন্ তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার!

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গীতার অর্থযুক্ত পাঠ না হইলে পাঠ বা শ্রবণ বৃথা। গীতার শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত ভূমিকাটী হৃদয়ঙ্গম করা একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু ভূমিকাটী গীতা হইতেই সংগৃহীত, ইহাকে ভূমিকা বলা যায় আবার গীতার সার মর্ম্মও বলা যাইতে পারে। ইহা বুঝিলে গীতা পাঠ বা শ্রবণ সহজ হইয়া যায়। এমন কি ইহা সম্যক্ অবগত হইলে গীতা পাঠ বা শ্রবণ না করিলেও গীতা পাঠ বা শ্রবণের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

এই মানব জগতে মানব সম্বন্ধে প্রশ্ন তিনটী যথা (১) মানব জীবনটী কি, (২) মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি (৩) এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা কি। এই তিনটী প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সৃষ্টির আদি হইতে কত গুণী কত মুনি কত

ঋষি কত যোগী কত ছন্দ কত মন্ত্র কত গান রচনা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। একমাত্র গীতাতেই এই তিনটী প্রশ্নের মীমাংসা একাধারে হইয়াছে। এই জন্যই মহামুনি ব্যাস আমাদের ও জগতের পূজ্য। প্রথমে প্রশ্ন তিনটীর সাধারণ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যথা (১) মানব জীবন কর্ম্মের সমষ্টি মাত্র (২) আনন্দ লাভই মানব জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য এবং (৩) শ্রীভগবানে মতিই এই আনন্দ লাভের একমাত্র উপায়।

প্রমাণ যথা।

(১) মানব জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কর্ম্মই করিয়া আসিতেছে, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক। সুতরাং কর্ম্মের সমষ্টিই মানব জীবন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে কর্ম্মটী আবার কি বা প্রত্যেক কর্ম্ম কি করিয়া হয় অর্থাৎ কি কি প্রক্রিয়া দ্বারা প্রত্যেক কর্ম্ম সম্পাদিত হয়।

"কে খেলায় আমি খেলি বা কেন,
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন,
এ কেমন ঘোর হবেনা কি ভোর,
অধীর অধীর যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই।"

আমরা প্রথমে মানব জগত লইয়াছিলাম কারণ অন্য জগতে কি আছে তাহা জানিবার উপায় নাই, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে কি প্রশ্ন সম্ভব হইতে পারে তাহা জানা যাইবে কি প্রকারে? এক্ষণে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে দুইটীর অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়; তন্মধ্যে একটী অব্যক্ত ও অচিন্ত্য এবং অপরটী ব্যক্ত। ব্যক্ত মানে যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায়; এবং চিন্ত্য মানে যাহা মনের দ্বারা ধারণা করা যায়। অতএব অব্যক্ত ও অচিন্ত্য অর্থে বুঝিতে হইবে যাহা ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা যায় না এবং মনের দ্বারাও কল্পনা করা যায় না। যখন

প্রথমটী অব্যক্ত ও অচিন্ত্য বলিয়াছি তখন তাহার সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে সাহস করা বাতুলতা মাত্র। তবে ইহা ধ্রুব সত্য বা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি হইতে এই অব্যক্ত ও অচিন্ত্য শক্তির আদেশে অব্যক্ত শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া অনাদি স্থান হইতে এক ভীষণ নাদ বা শব্দ করিতে করিতে অনন্ত আকাশের মধ্যে দিয়া ছুটিয়াছে, ছুটিতেছে এবং ধ্বংস পর্য্যন্ত ছুটিতে থাকিবে। এই নাদ ওঁ (বা হুম্) শব্দের অনুরূপ এবং ইহা নিরর্থক নহে। এই নাদ বলিতেছে—

"সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ গীতা

হে ভ্রান্ত জীব নশ্বর জগতের সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে এস, আমাকে আলিঙ্গন কর; একমাত্র আমাকে (সত্য) অবলম্বন করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, সুখ পাইবে, শান্তি পাইবে, আনন্দলাভ করিবে; কারণ আমিই আনন্দের একমাত্র আধার; আমি ভিন্ন আর কোথায় আনন্দ নাই।

"এষাস্য পরমা গতি রেষাস্য পরমা সম্পদ্।
এষোহস্য পরমো লোক এষোহস্য পরম আনন্দঃ।
এতস্যৈবানন্দানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি॥"

এই ব্রহ্মই (অব্যক্ত শক্তি) জীবের পরম গতি, এই ব্রহ্মই পরম ধন, ইহাই পরম স্থান এবং ইহাই পরম আনন্দ। এই ব্রহ্মই আনন্দের আধার। জীব এই আনন্দেরই কিঞ্চিৎ মাত্র উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। নাদ, ওঁ এবং অব্যক্ত শক্তি এক।

প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছুটিতেছে এবং শব্দও হইতেছে; কিন্তু শব্দ যে মার্জ্জিত ভাষায় গীতার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটীই বলিতেছে ইহা স্বীকার করিতে কেহই প্রস্তুত হইবেন না। একটী পাখী আকাশে উড়িলে শব্দ শ্রুত হয় তখন এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছুটিবার সময়ে ভীষণ শব্দ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নাদের উক্তি যে একেবারে কল্পনা নহে, তাহার প্রমাণ আছে। যে হস্তের সাহায্যে ইহা লিখিতেছি তাহা দেহের অন্তর্গত এবং দেহ জড় পদার্থ কারণ প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেলে দেহের নড়িবার ক্ষমতা থাকে না। অধিকন্তু যে পৃথিবীতে বসিয়া ইহা লিখিতেছি সেই পৃথিবীও জড় এবং সমস্ত জগতের সমষ্টি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাহাকে প্রকৃতি বলা হয়, তাহাও জড় কারণ ইহা ক্ষিত্যপ্‌তেজঃমরুৎব্যোম্ এই পঞ্চ ভূতের বিকার মাত্র। জড় পদার্থ নির্জীব, শক্তির অভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। সেই অব্যক্ত শক্তিই শক্তির একমাত্র আধার। এই শক্তিই প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার না করিলে প্রকৃতির কার্য্য করিবার ক্ষমতা কোথায়? দেহের মধ্যে যে আত্মা থাকে তাহাও অব্যক্ত শক্তির অংশ সুতরাং শক্তিমান্। এই শক্তিমান্ আত্মার শক্তিতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহের কার্য্য করিবার শক্তি জন্মে। আত্মা দেহত্যাগ করিলেই দেহ ইত্যাদির কোনও শক্তিই থাকে না, সুতরাং দেহ নিঃস্পন্দ হইয়া যায়।

এই অব্যক্ত শক্তি যাঁহাকে আমরা ব্রহ্ম নাম দিয়াছি একমাত্র অবিনশ্বর। ইনি সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলেন এবং ধ্বংসের পরেও থাকিবেন; কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা প্রকৃতির ধ্বংস বা বিকার আছে; সুতরাং ইহা নশ্বর; ইহা চিরকাল থাকে না। যাহা থাকে বা আছে তাহার নাম মার্জ্জিত ভাষায় অস্তি। সৎ শব্দও অস্তি শব্দের রূপান্তর (অস্+শতৃ)। সৎ ও সত্য একই ধাতু হইতে উৎপন্ন বলিয়া যাহাকে সৎ বলে তাহাকেও সত্য বলা যাইতে পারে। যেহেতু অব্যক্ত শক্তি বা ব্রহ্ম চিরকাল অস্তি (আছে), অতএব অব্যক্ত শক্তি সৎ বা সত্য।

"নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়॥
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তি প্রদায়।
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥" মহাতন্ত্রনির্ব্বাণম্

অতএব ব্রহ্ম সৎ, কারণ সৎ শব্দের চতুর্থীর একবচনে সতে শব্দ উৎপন্ন হয়।

আবার

"পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্।
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য॥
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্তশক্তে।
জগদ্ভাসকাদীশ পায়াদপায়াৎ॥" মহাতন্ত্রনির্ব্বাণম্

এখানে ব্রহ্মকে সত্য বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রতিপন্ন হইল অব্যক্ত শক্তি বা ব্রহ্ম সত্য। অব্যক্ত শক্তির উদ্দেশে যে নাদ তাহাও সত্য।

মানুষ পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে লোকভয় বা রাজভয় হইতে অব্যাহতি পাইবার মানসে মিথ্যাদ্বারা পাপকর্ম্মটী ঢাকিবার পন্থা আগে ভাবিয়া রাখে। যখন পাপকর্ম্মটী প্রকাশ পায় তখন সে পূর্ব্বচিন্তিত মিথ্যার আরোপ করিয়া থাকে। যদি ঐ পন্থা পর্য্যাপ্ত হয় তবে সে লোকভয় বা রাজভয় হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে, কিন্তু তাহা হইলেও সে অন্তরে অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে; আর যদি উহা পর্য্যাপ্ত না হয় তবে সে শাস্তি পায় বা অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে। দুই দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় মানুষ মিথ্যার আশ্রয় লয় বলিয়াই অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে। যদি কেহ জীবনের ব্রত করেন যে তিনি কখনও মিথ্যার আশ্রয় লইবেন না অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভ্রমক্রমে বা উপহাসচ্ছলেও সত্য হইতে বিচলিত হইবেন না, তিনি কখনও পাপকর্ম্মে

লিপ্তই হইবেন না, কারণ তিনি জানেন যে পাপকর্ম্মটী প্রকাশ পাইলে তিনি মিথ্যাদ্বারা উহা ঢাকিতে পারিবেন না। মিথ্যা বলিলেই তিনি শাস্তি পাইবেন এবং শাস্তি পাইবার ইচ্ছা কাহারও থাকে না; সুতরাং শাস্তি পাইবার ভয়ে ঐ প্রকার সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি পাপকর্ম্মে লিপ্তই হইবেন না। তাহা হইলে প্রতিপন্ন হইল যে ব্যক্তি সত্যকে আশ্রয় বা আলিঙ্গন করিবেন, তিনি কখনও পাপকর্ম্ম করেন না এবং যে ব্যক্তি কখনও পাপকর্ম্ম করেন না তিনি কখনও শাস্তিভোগ করেন না বা অশান্তি ভোগ করেন না এবং যেহেতু অশান্তিই আনন্দের অভাব, যে ব্যক্তি সত্যকে আলিঙ্গন করেন, তিনি চির-আনন্দ প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অব্যক্ত শক্তি সত্য এবং এখন বলা হইল যে ব্যক্তি সত্যকে আলিঙ্গন করেন তিনি চির-আনন্দ প্রাপ্ত হন। অতএব প্রমাণীকৃত হইল যে ব্যক্তি অব্যক্ত শক্তিকে আলিঙ্গন করেন তিনি চির-আনন্দ প্রাপ্ত হন। পৃথিবী যে গোল এবং সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে ইহা কে দেখিয়াছে? পৃথিবী গোল হইলে এবং সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিলে যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, সেই সব সিদ্ধান্ত যথা তিথি, গ্রহণ ইত্যাদির প্রত্যক্ষদর্শন সত্যে পরিণত হইতেছে বলিয়াই সকলেই বিশ্বাস করেন বা মানিয়া লন যে পৃথিবী গোল এবং সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। নাদ পূর্ব্বোক্ত গীতার শ্লোকটী বলিলে যাহা দাঁড়ায় তাহা সত্য হইতেছে, অতএব নাদ কি বলিতেছে শুনিতে না পাইলেও বিচারশক্তিযুক্ত মানুষকে ইহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইতে হইবে।

অব্যক্ত শক্তির এক নাম ব্রহ্ম এবং অপর নাম সত্য। ইহা নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের বাহিরে। সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশ করা, রজোগুণের কার্য্য ক্রিয়া করা এবং তমোগুণের কার্য্য আবৃত করা বা ঢাকা। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই ব্রহ্ম নির্গুণ ছিলেন; এবং প্রকৃতি উচ্ছৃঙ্খল পরমাণু রাশি (chaos) অবস্থায় ছিল। সৃষ্টির আরম্ভে ব্রহ্ম প্রকৃতিতে শক্তি প্রয়োগ

করাতে ইহা বর্ত্তমান শৃঙ্খলাবস্থায় (chosmos) পরিণত হইয়াছে; সুতরাং ব্রহ্ম তখন প্রকৃতিকে প্রকাশ করিল বলিয়া ইহা সত্ত্বগুণ সম্পন্ন (বিষ্ণু) হইলেন। পরে শক্তিপ্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতি কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে, ব্রহ্ম রজোগুণসম্পন্ন (ব্রহ্মা) হইলেন এবং পরে ক্ষিত্যপ্‌তেজঃমরুৎব্যোমের সৃষ্টি হইয়া গেল। এই পঞ্চভূত তমোময় পদার্থ, কারণ যাবতীয় দৃশ্য পদার্থ আবরণে ঢাকা। তখন ব্রহ্ম তমোগুণসম্পন্ন (মহেশ্বর) হইলেন। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে ধ্বংস পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সগুণ হইলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে ইনি নিগুর্ণ ছিলেন এবং ধ্বংসের পরে নিগুর্ণ থাকিবেন। নিগুর্ণ অবস্থায় ব্রহ্ম নিরাকার থাকেন এবং সগুণ অবস্থায় সাকার হয়েন। তাই সত্যনারায়ণের ধ্যানে আছে

"ওঁ ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয়সমন্বিতম্।"

ভগবান কখনও তিন গুণের বাহিরে আবার কখনও তিন গুণের সমাহার।

ব্যক্ত দুই ভাগে বিভক্ত—আমি ও অ-আমি। আমি কি সকলেই জানেন, অন্ততঃ মনে করেন জানেন। 'আমি' ব্যতীত যাহা কিছু ভাষায় বা চিন্তায় প্রকাশ করা যায় তাহাই অ-আমি (Environment)। আমি ও অ-আমি একত্র করিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়। আমি ও অ-আমি ব্যতীত আর কি বর্ণনীয় বা চিন্ত্যনীয় থাকিতে পারে? অব্যক্ত শক্তি আমি ও অ-আমিকে শাসন করিতেছেন।

অ-আমি ও বর্ণনা করাও দুরূহ; কারণ যে জগতের জীব মানুষ সেই জগতের সহিত তুলনা করিলে সে পিপীলিকা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে এবং পৃথিবী আবার অ-আমির সহিত তুলনা করিলে একটী উৎকুণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া দাঁড়ায়। অন্য জগতে কি আছে তাহা জানিবার উপায় ভগবান আমাদিগকে দেন নাই, কিন্তু ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পৃথিবীতে আমরা

বাস করি উহা আমাদের সূর্য্যের অন্তর্গত। আমাদের সূর্য্য, আমাদের পৃথিবী, গ্রহ ও উপগ্রহ লইয়া একটী সৌরজগৎ হইয়াছে। অনন্ত আকাশে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে যাহাদের আলোক নীলাভ শ্বেতবর্ণ এবং যাহারা মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলে, তাহাদের প্রত্যেকেই এক একটী সূর্য্য। আমাদিগের পৃথিবী হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া এইগুলি এত ছোট দেখায়। এই সকল নক্ষত্ররূপী সূর্য্যের আবার পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি আছে। তাহা হইলে যতগুলি নক্ষত্র আছে, ততগুলি সৌরজগৎ আছে। এই সকল সৌরজগতের সমষ্টিই অ-আমি। সুতরাং অ-আমি যে কত মহৎ তাহা ধারণা করাই দুরূহ।

কোনও সময়ে আমাদের চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা গোলোকে ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। দ্বারপাল ভগবানকে ব্রহ্মার আগমনবার্ত্তা জানাইলে ভগবান দ্বারপালকে বলিয়াছিলেন "কোন্ ব্রহ্মা জানিয়া আইস।" দ্বারপাল ব্রহ্মাকে এই কথা জানাইলে ব্রহ্মা ভাবিলেন এ আবার কি? কোন্ ব্রহ্মা বলেন কেন? আবার ব্রহ্মা আছেন না কি? যাহা হউক তিনি দ্বারপালকে বলিলেন "যাও ঠাকুরকে বলগে, সনকের পিতা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আসিয়াছেন।" যথাসময়ে ব্রহ্মা ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইলে ভগবান বলিলেন "আপনি কোন্ প্রয়োজনে আসিয়াছেন?" তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন "আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি আপনাকে একটী প্রশ্ন করিব। আপনি যে বলিলেন কোন্ ব্রহ্মা, ইহার তাৎপর্য্য কি?" ভগবান ব্রহ্মাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া এক ভীষণ হুঙ্কার দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের কাহারও মাথা দশটী, কাহারও একশত, কাহারও এক সহস্র, কাহারও লক্ষ মাথা ইত্যাদি। দশটীর কম মাথা কাহারও ছিল না আমাদের ব্রহ্মাত দেখিয়াই অবাক। তিনি মনে মনে ভাবিলেন তিনি ইঁহাদের তুলনায় কত নগণ্য। সেই সব ব্রহ্মা

আসিয়াই করযোড়ে বলিলেন "প্রভো, কোন্ প্রয়োজনে আমাদিগকে আহ্বান করিলেন ?" ভগবান বলিলেন "আপনাদের উপর যে কর্ম্মের (প্রজাসৃষ্টির) ভার দেওয়া হইয়াছে, তাহা ঠিক হইতেছে ত ?" তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন "প্রভো, আপনি এরূপ কার্য্যকুশল যে আপনার আদেশ যে বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? সুতরাং এরূপ প্রশ্ন করাই নিষ্প্রয়োজন।" তখন ভগবান বলিলেন "আপনারা এক্ষণে স্বস্থানে গমন করিতে পারেন।"

ইহা আজগুবী হইতে পারে কিন্তু এই গল্প হইতে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে যে, যে ব্রহ্মার দশটী মাথা সেই ব্রহ্মা যে সৌরজগতের ব্রহ্মা সেই নক্ষত্ররূপী সূর্য্য আমাদিগের সূর্য্য অপেক্ষা ১০ : ৪ বা আড়াই গুণ বড়; যে ব্রহ্মার এক লক্ষ মাথা সেই ব্রহ্মা যে সৌরজগতের ব্রহ্মা সেই নক্ষত্ররূপী সূর্য্য আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা ১০০০০০ : ৪ বা পঁচিশ হাজার গুণ বড় ইত্যাদি। এক একটী নক্ষত্র এতদূরে অবস্থিত যে তাহাদের আলোক এখনও পর্য্যন্ত আমাদিগের নয়নপথে আইসে নাই। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৯০০০০০ মাইল। ছায়াপথে অসংখ্য নক্ষত্র ছড়ান আছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় অ-আমি কত মহৎ। বর্ত্তমান যুগে (যখন অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে) যে সব তথ্য সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মুনি ঋষিগণ সূক্ষ্মদৃষ্টির সাহায্যে তাহা অবগত ছিলেন; তবে অর্থ করিয়া লইতে হইবে; উপর উপর দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চন করিলে তিমিরেই থাকিতে হইবে। লঙ্কাধিপতি রাবণ পবনকে আজ্ঞাকারী করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহার অর্থ সেই সময়ে লঙ্কায় বৈজ্ঞানিক উন্নতি যথেষ্ট ছিল বলিয়া তথায় বৈদ্যুতিক পাখার প্রথা প্রচলিত ছিল। অগ্নিকে বশে রাখার অর্থ দেশালাইএর ব্যবহার। সূর্য্য রাবণের দাস ছিলেন ইহার অর্থ বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থাও ছিল। মৃত্যুপতি

যমকে দাস করিয়া রাখার অর্থ আর কিছুই নহে রাবণ মন্ত্র ও ঔষধের সাহায্যে অত্যধিক ইন্দ্রিয়চালনা সত্ত্বেও দীর্ঘজীবী বা প্রায় অমর হইতে পারিয়াছিলেন। ভীষ্মের শরশয্যার সময়ে অর্জ্জুন বাণের সাহায্যে পাতাল হইতে ভোগবতীর জলধারা আনয়ন করিয়া ভীষ্মের মুখে ঐ জল প্রবেশ করাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার অর্থ অর্জ্জুন এক বৎসর কাল নির্ব্বাসনে থাকায় পাতাল-পুরীতে অবস্থানকালে নলকূপ খনন করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইত্যাদিরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। এই অ-আমির সংঘর্ষে আসিয়া 'আমি'র শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। খাদ্য খাইয়া আমাদিগের শরীরের পোষণ হয়, খাদ্য অ-আমি। শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, শিক্ষা অপরের নিকটে পাওয়া যায়। অপর অ-আমি। গুরুকৃপায় আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, গুরু অ-আমি। পরে দেখান হইবে এই অ-আমিই 'আমি'কে কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। অ-আমির সহিত গীতার আর কোনও বিশেষ সম্বন্ধ নাই। 'আমি' লইয়াই গীতা।

'আমি' সাধারণতঃ দেহকেই বুঝায়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 'আমি' দেহ নহে। রাম মরিয়া গেলে বাহকেরা তাহাকে শ্মশানে লইয়া যাইবার সময়ে একজন লোক বাহকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল "কি লইয়া যাইতেছ?" বাহকেরা তখন 'রামকে লইয়া যাইতেছি' বলেনা, 'রামের মড়া লইয়া যাইতেছি' বলে। তাহা হইলে রাম ও রামের মড়া দুইটী পৃথক বস্তু। যদিও 'আমি' আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে, দেহ ও মন ভিন্ন আত্মা অন্য আশ্রয়ে থাকিয়া কার্য্য করিতে পারে না বলিয়া 'আমি' বলিলে দেহ, মন ও আত্মা এই তিনকেই বুঝিতে হইবে। সুতরাং আমি তিন ভাগে বিভক্ত দেহ, মন ও আত্মা।

দেহটী কি, কোথায় থাকে এবং কি কার্য্য করে ইহা জানা আবশ্যক। রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি লইয়া দেহ গঠিত হইয়াছে। ইহা নরজগতে অবস্থিত ও পঞ্চভূতের সমষ্টি বলিয়া ইহা তমোগুণের। ইহার পাঁচটী সহায়

বা অনুচর আছে ইহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে যথা 'বাক্‌পাণ্যাদৌ'; মুখ, হাত, পা, জননেন্দ্রিয় ও মলদ্বার। ইহাদের কার্য্য যথাক্রমে বচন, গ্রহণ, ভ্রমণ, রমণ ও উৎসর্জ্জন বা পরিত্যাগ। এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে এবং মন রাজার হুকুমে দেহ সর্ব্বদা কার্য্য করিয়া থাকে। ইহার স্বামী বা গুরু বা প্রভু হইতেছে মন। মন হুকুম না করিলে দেহ কদাচ কার্য্য করিবে না। আত্মা প্রধান হইলেও মন দেহের গুরু ইহা বিধির বিধি।

নাভিদেশ হইতে মস্তকের অর্দ্ধেক স্থান পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া দড়ির ন্যায় দুইটী মজ্জা চলিয়া গিয়াছে। পাকা মাছের শিরকাঁটায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায় একটী কাচ বা চিনা মাটীর পাত্রে কিছু সালফিউরিক এসিড্ ঢালিয়া তাহাতে একটী দস্তার পাত ও একটী তামার পাত ডুবাইয়া উপরে দুইটী লৌহতার সংযুক্ত করিলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'কোঁ কোঁ' নামক একপ্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। তারের সংযোগ ছিন্ন হইলে শব্দ শ্রুত হয় না; সুতরাং বুঝিতে হইবে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উদরস্থিত খাদ্য হইতে যে রস প্রস্তুত হয়, সেই রসের সাহায্যে মেরুদণ্ডস্থিত মজ্জাদ্বয়ের ভিতর দিয়া শরীরের মধ্যে সর্ব্বদাই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতেছে এবং 'ওঁ'কারের অনুরূপ শব্দ হইতেছে। এই বিদ্যুৎপ্রবাহের নাম প্রাণ। যেহেতু দেহ একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, নাদের 'ওঁ' এবং এই 'ওঁ' একই, কেবল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র। ক্রিয়া করে বলিয়া প্রাণ রজোগুণের। এই প্রাণ হস্ত ও পদের মধ্যে নাই, কারণ হাত ও পা কাটিয়া ফেলিলেও মানুষ বাঁচিতে পারে কিন্তু নাভিদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যে কোনও স্থান ছেদন করিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না, কারণ পরিধি বন্ধ হইয়া যায়। এই প্রাণের আদি নাভিতে এবং শেষ নাভিতে। মৃত্যুকালে নাভিদেশ স্পন্দিত হয়।

বজ্র মনুষ্য শরীরে পতিত হইলে মানুষ মুহূর্ত্তের মধ্যে মরিয়া যায়, ইহার কারণ বজ্র বৃহৎ বিদ্যুৎ এবং প্রাণ ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ। যেমন জলস্রোত প্রবাহের সময়ে পথিমধ্যে একবিন্দু জলকে নিমেষের মধ্যে উড়াইয়া লইয়া যায় এবং প্রবাহের শেষে জলবিন্দুর চিহ্নমাত্রও থাকেনা, সেইরূপ বৃহৎ বিদ্যুৎ ক্ষুদ্র বিদ্যুৎরূপ প্রাণকে নিমেষের মধ্যে উড়াইয়া লইয়া যায়। পূর্ব্ব কথিত তারের কোনও অংশের বিশৃঙ্খলা ঘটিলে বিদ্যুৎপ্রবাহ কমিয়া যায় এমন কি মেরামত না হইলে প্রবাহ একেবারে বন্ধ হইতে পারে কিম্বা এসিড্ ফুরাইয়া গেলে প্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়। মনুষ্যশরীরস্থিত মেরুদণ্ডের কোনও স্থানের বিশৃঙ্খলা ঘটিলে মনুষ্যশরীরে পীড়া হয়, প্রাণ ধুক্ ধুক্ করে। ঔষধ বা প্রক্রিয়া দ্বারা সেই বিশৃঙ্খল স্থানের মেরামত হয় মাত্র এবং মনুষ্য আরোগ্যলাভ করে। কুড়ি একুশ দিন অনশনে থাকিলে উদরস্থিত রস একেবারে শুকাইয়া যায়, সুতরাং মানুষ মরিয়া যায়।

দেখা যায় পাঁচ ছয়টী বাদ্য যন্ত্র একসুরে (same tune) বাঁধা থাকিলে, যদি একটীতে ঘা দেওয়া যায়, তবে প্রত্যেক যন্ত্রই বাজিতে থাকিবে। ইহাকে সহানুভূতিসূচক কম্পন (sympathetic vibration) বলে। মানুষ বাহিরে 'ওঁ' মন্ত্র জপ করিতে থাকিলে, যদি বাহিরের ওঙ্কারের সুর কোনও ক্রমে ভিতরের ওঙ্কারের সুরের সহিত এক হইয়া যায়, তবে সে ভিতরের ওঙ্কারের ধ্বনি (কুলকুণ্ডলিনী) শুনিতে পাইবে। প্রাণ ও আত্মা এক নহে। প্রাণ উদরের ক্রিয়া বিশেষ। উদরের ক্রিয়ার শেষ হইলে প্রাণের ধ্বংস হইবে। ইহা নশ্বর। দেহ হইতে আত্মা ও প্রাণ একসঙ্গে চলিয়া যায়। আত্মা বহির্গত হইয়া যায় বলিয়া প্রাণ দেহে আর থাকিতে পারে না, দেহ নিঃস্পন্দ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। আত্মা অবিনশ্বর ও অসংখ্য, কিন্তু প্রাণ অসংখ্য নহে, একটী মাত্র, অন্ততঃ দুইটীর অধিক নহে (স্ত্রীর প্রাণ ও পুরুষের প্রাণ)। যেমন একটী বাঁশ গাছ হইতে অসংখ্য বাঁশ গাছের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ পিতার প্রাণ হইতে পুত্রের প্রাণ উদ্ভূত হইয়া থাকে।

"আত্মনো জায়তে পুত্রঃ"

নিজ হইতে পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

ভিন্ন ভিন্ন তারের সংযোগে একই বিদ্যুৎ হইতে পৃথক পৃথক বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

'তজ্জায়া জায়া ভবতি'

স্বামী যে পত্নীর গর্ভে প্রবেশ করে, তাহাকেই জায়া বলা হয়। এইজন্যই

"জ্যেষ্ঠভ্রাতা সমঃ পিতা"

জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতার ন্যায়।

পিতা বংশরক্ষার্থ অনাসক্তচিত্তে পত্নীর গর্ভে প্রবেশ করে বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করা উচিত।

গুরুতে আর গুরু পুত্রে প্রভেদ দেখা উচিত নহে।

বংশরক্ষাকার্য্য শেষ হইয়া গেলে অপর পুত্রের জন্মকালীন পিতার আসক্তি বর্ত্তমান থাকে। কালাশৌচের সময়ে পুত্র জন্মিলে বুঝিতে হইবে পিতার দারুণ আসক্তি বর্ত্তমান ছিল, এইজন্য সেই পুত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও পিণ্ডের অধিকারী হয় না।

মেরুদণ্ডটী মস্তকের অর্দ্ধেক স্থান পর্য্যন্ত গিয়া উপরিভাগটী গোল অথচ চেপ্টা হইয়া গিয়াছে। ইহার ভিতরে মজ্জা থাকে। এই জিনিষটীকে নিম্ন মগজ (little or lower brain) বলা হয়। ডাক্তারেরা ইহাকে 'মেডেলা অবলঙ্গাটা' (Medella oblongata) বলেন। নিম্ন মগজের উপরে মস্তিষ্ক বা ঘি বসান থাকে। ইহাকে উচ্চ মগজ (Upper or higher brain) বলে। এই উচ্চ মগজ বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নরম থাকে, পরে ক্রমশঃ কঠিন হইতে থাকে। মন হইতেছে এই উচ্চ মগজের একটী ক্রিয়া মাত্র (function of the higher brain)। নশ্বর পদার্থ হইতে উদ্ভূত বলিয়া

ইহা নশ্বর অর্থাৎ মগজের ধ্বংসের সহিত ইহারও ধ্বংস হয়। মন যাবতীয় পদার্থকে প্রকাশ করে বলিয়া ইহা সত্ত্বগুণের। ইহার কার্য্য হইতেছে চিন্তা দ্বারা দেহকে হুকুম খাটান। যেমন দেহের পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে, সেইরূপ মনেরও পাঁচটী সহায় বা অনুচর আছে। ইহাদিগকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে যথা চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ ও ত্বক। ইহাদের যথাক্রমে পাঁচটী বিষয় আছে যথা "রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শাশ্চবিষয়া অমী"। চক্ষুর বিষয় রূপ, জিহ্বার বিষয় রস, নাসিকার বিষয় গন্ধ, কর্ণের বিষয় শব্দ এবং ত্বকের বিষয় স্পর্শ। এই বিষয় ভোগ হয় পঞ্চভূতে—"ক্ষিত্যপ্‌তেজঃমরুৎব্যোম্"। ক্ষিতি অর্থে মাটী বা পৃথিবী, অপ্ অর্থে জাল বা সাগর, তেজ অর্থে অগ্নি বা সূর্য্য, মরুৎ অর্থে বায়ু এবং ব্যোম্ অর্থে আকাশ (ether)। অহঙ্কার (হঙ্কার) হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি বা সূর্য্য, অগ্নি হইতে বারি এবং বারি হইতে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে।

অগ্নি ও সূর্য্য প্রায়ই এক।

"দিনান্তে নিহিতং তেজঃ সবিত্রেব হুতাশনে"—রঘুবংশম্।

দিবাবসানে সূর্য্যদেব নিজ তেজ অগ্নিতে রাখিয়া যান।

সূর্য্যকেই অনেকস্থলে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হয়। সূর্য্য জল সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং জল হইতে পৃথিবীর প্রকাশ।

একজন কন্যাযাত্রীর লোক বরযাত্রীর লোককে প্রশ্ন করিল "মহাশয় আপনার নাম কি?" দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে বলিল

পৃথিবী ভাসিয়ে যবে হৈল জলময়।
কোন্‌খানে বসি নাম পুছ মহাশয়॥
নাম পুছিবার স্থান কর নিরূপণ
তবে নাম জিজ্ঞাসিবে মনুর নন্দন॥

প্রথম ব্যক্তি উত্তর করিল

যখন হৈলেন প্রভু বরাহ মূরতি।
দন্তেতে ধরিয়া তিনি রাখিলেন ক্ষিতি॥
সেই অবধি হইল পৃথিবী সঞ্চয়।
পৃথিবীতে বসি নাম পুছি মহাশয়॥

ভীষণমূর্ত্তি সূর্য্যদেবকেই বরাহমূর্ত্তিরূপে কল্পিত করা হইয়াছে।

আকাশের গুণ মাত্র শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নির গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। পদার্থের এই গুণকেই সেই পদার্থের ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যতিরেকে মনের ছয়টী চাটুকার বা বয়স্য বা মোসাহেব আছে; যথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য। ইহাদিগকে নরের শত্রু বলা হয়। ইহারা সকলেই মন হইতে উদ্ভূত কিন্তু মহাপরাক্রমশালী বলিয়া রজোগুণের। মনের একজন জ্ঞাতি ভাইও আছে; ইহাকে বুদ্ধি বলা হয়। মন রাজা হইলেও ইহা চঞ্চল ও সন্দিগ্ধচিত্ত। সহসা কর্ম্ম করাইতে ইহার সাহসে কুলায় না, সেইজন্য ইহা সর্ব্বদা বুদ্ধির পরামর্শ চায়। বুদ্ধির উপরে মনের যথেষ্ট আস্থা আছে; বুদ্ধি যাহা বলে, মন তাহাই মানিয়া লয়। মোসাহেবগণ বা ষড়রিপু মহাবলশালী ও মনকে উৎসন্নপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে।

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।" গীতা ৬।৩৪

হে কৃষ্ণ, মন বায়ুর ন্যায় সর্ব্বদাই অস্থির কিন্তু রিপুগণ মহাবলশালী ও স্থিরসংকল্প।

বুদ্ধি সত্ত্বগুণের। বুদ্ধি বা জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করাও দুরূহ, কারণ "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্"।

প্রকৃত জ্ঞান অসীম।

ভগবান কি উদ্দেশ্যে তৃণ সৃজন করিয়াছেন, তাহা জানিবার ক্ষমতা মনুষ্যের এখনও হয় নাই। সেই সীমাহীন বস্তুকে সীমাবদ্ধ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এইমাত্র নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে এই বুদ্ধি তিন ভাগে বিভক্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান ও অজ্ঞান। জ্ঞান হইতেছে এই যে যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হয় যেমন আমটী বোঁটা হইতে খসিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল ইহার প্রকাশকে জ্ঞান বলে। আমটী বোঁটা হইতে খসিয়া কেন সোজা নীচের দিকে পড়িল ইহার তত্ত্বানুসন্ধানের নাম বিজ্ঞান। বি অর্থাৎ বিশিষ্টরূপে জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। ইহা নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি এবং ইহাকে বিবেক বলা যায়। আমটী লইয়া একজন লোকের চক্ষুতে আঘাত করার নাম অজ্ঞান। অজ্ঞান সর্ব্বদাই ষড়রিপুর দিকে থাকে সুতরাং অজ্ঞান ও ষড়রিপু প্রায়ই একই এবং অজ্ঞান মোক্ষের অন্তরায়। বিজ্ঞান সাধারণতঃ অকর্ম্মা হইয়া থাকে। সাধারণ ব্যক্তির ইহা কার্য্য করে না, তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিরই ইহা কার্য্য করিয়া থাকে। জ্ঞান মনকে সর্ব্বদা পরামর্শ দেয়। অজ্ঞানে ভগবানকে পাওয়া যায় না, আবার কেবল জ্ঞানেও হয় না। জ্ঞান ও বিজ্ঞান মিশ্রিত হইলেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। এই উভয়ের মিশ্রণই ভগবৎপ্রাপ্তির বা মোক্ষের সহায়।

"জ্ঞান বিজ্ঞান সহিতং"। গীতা ৯।১

ভগবানকে ইহজন্মে পাওয়া অর্থে ভগবানের তত্ত্ব বা মহিমা অবগত হওয়া এবং দেহান্তে পাওয়া অর্থে তাঁহার সহিত মিলিত হওয়া। তাঁহার সৃষ্টিরহস্য জানিলেই তাঁহাকে জানা হইল। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ ভগবানের সৃষ্টির বিষয় বা তাঁহার তত্ত্ব বা মহিমা অবগত হইতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মনের স্থান উচ্চ মগজে। মনুষ্য ব্যতিরেকে কোনও প্রাণীরই উচ্চ মগজ নাই, সুতরাং মনও নাই এবং বুদ্ধি নাই, কিন্তু আত্মা ও

প্রাণ আছে। তাহাদের যাবতীয় কার্য্য নিম্ন মগজের সাহায্যে হয়। ইহাকে পশুবুদ্ধি (Instinct) বলে।

"The lamb thy ryot dooms to bleed to-day,
Had he thy reason would he skip and play
Pleased to the last, he grips the flow'ry food,
And licks the hand just raised to shed his blood."

Pope.

যে মেষটীকে তুমি বলি দিতে উদ্যত হইয়াছ, সে দেখিতেছে অসি শাণিত হইতেছে, কিন্তু সে বুঝে নাই সে অসি তাহারই স্কন্ধে পতিত হইবে। তোমার যে বুদ্ধি আছে সেই বুদ্ধি যদি তাহার থাকিত, তাহা হইলে সে ফুল ও চাউল খাইত না এবং যে হস্ত তাহাকে ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছে সেই হস্ত সে চাটিত না।

উচ্চ মগজের দ্বারা চিন্তাকার্য্য হয় এইজন্য মনের অপর নাম চিন্তাশক্তি। নিম্ন মগজ উচ্চ মগজের কার্য্য চর্ব্বিতচর্ব্বন করে; সেইজন্য এই প্রক্রিয়াকে অভ্যাস বলে। কোনও শ্লোক মুখস্থ করিবার সময়ে উচ্চ মগজকে আসরে নামিতে হয়; সেই প্রক্রিয়াকে 'মন দেওয়া' (attention) বলে; পরে যখন শ্লোকটী সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া যায়, তখন মন উহা নিম্ন মগজের উপর ভার দিয়া অন্য প্রয়োজনীয় চিন্তায় প্রবৃত্ত থাকে। পুনরাবৃত্তির সময়ে শ্লোকটী দিব্য উচ্চারিত হইয়া যায় নিম্ন মগজের সাহায্যে বা অভ্যাসের সাহায্যে যদিও মন সুদূর দিল্লী সহরের শোভা দর্শন করে। এই অবস্থাকে অন্যমনস্ক বলে। উচ্চারণ সময়ে উচ্চ ও নিম্ন মগজ একত্র থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক শব্দের ভাব বা প্রতিবিম্ব আছে। নিম্ন মগজ অভ্যাসের সাহায্যে শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়া যাইবে এবং উচ্চ মগজ প্রতিবিম্ব গড়িয়া যাইবে, তবেই মন্ত্র উচ্চারণের সার্থকতা, নচেৎ চীনাবাড়ীর জুতা কেনা হইবে।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া জপ করিতেছিলেন এবং শিষ্যেরা তাঁহার বস্ত্র লইয়া তীরে বসিয়াছিল। বিশু নামে এক পাগল তাড়াতাড়ি জলে নামিতে যাওয়ায় জল ছিটকাইয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের গায়ে লাগিয়াছিল। শিষ্যেরা বলিল "আচ্ছা পাগল ত, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় জপ করিতেছেন, তুই তাঁহার গায়ে অশুদ্ধ জল দিলি!" বিশু পাগল তখন বলিয়া উঠিল "তোমাদের বিদ্যাবাগীশ মহাশয় জপ করিতেছেন না চীনাবাড়ীর জুতা কিনিতেছেন তার ঠিক কি?" বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বাস্তবিকই উচ্চ মগজে জুতা কিনিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র বলিয়াছিল "বাবা, এবার পূজার সময়ে তালতলার জুতা লইব না; সুরেশের মত চীনাবাড়ীর জুতা চাই।" বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অতিশয় কৃপণ লোক ছিলেন; তালতলার জুতার দাম ছয় আনা এবং চীনাবাড়ীর জুতার দাম নয় সিকা; সুতরাং তিনি উচ্চ মগজে চিন্তা করিতেছিলেন "ছয় আনার স্থলে নয় সিকা খরচ করি কি করিয়া?" অথচ জপের মন্ত্র সকল নিম্ন মগজের সাহায্যে দিব্য উচ্চারিত হইয়া যাইতেছিল। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় পাগলের কথা শুনিয়া জপ বন্ধ করিয়া পাগলের পায়ে ধরিলেন। বিশু পাগল প্রকৃত পাগল নহে, আত্মদর্শী পাগল। যিনি নিজ আত্মা দর্শন করিতে সক্ষম হন, তিনি সকলের মনে কি হইতেছে তাহা অনায়াসে বলিতে পারেন। সকল আত্মাই সমান। দেহ ও মন বাদ দিলে যাহা থাকে অর্থাৎ আত্মা, তাহা মনুষ্যের ও পিপীলিকার সমান। পিপীলিকার আত্মা ক্ষুদ্র দেহ পাওয়ায় হস্তীর ন্যায় বা মনুষ্যের ন্যায় কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না। হস্তীর আত্মাও যাহা পিপীলিকার আত্মাও তাহা। এই কারণেই ঋষিগণ ত্রিকালজ্ঞ হইতে পারিতেন। নারদ মুনি নিজ আত্মা দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া একস্থানে বসিয়া পৃথিবীর কোন্ স্থানে কি হইত জানিতে পারিতেন। ইহাতে দেবতাদিগের মধ্যে কলহ বাধাইবার সুবিধা হইত।

ভগবান প্রায়ই বলিতেন "অমুক গ্রামের হারু চাষা আমার ভক্তশ্রেষ্ঠ।"

দেবর্ষি নারদের মনে অহঙ্কার ছিল তাঁহা অপেক্ষা ভক্ত আর কেহই ছিল না, কেননা তিনি সর্ব্বদাই বীণার সাহায্যে ভগবানের নাম জপ করিতেন। ভগবানের মুখে হারুর প্রশংসা শুনিয়া নারদের গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইল। তিনি হারুর গৃহে গিয়া তাহার চব্বিশ ঘণ্টার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "প্রভো, আপনি যাহাকে বড় করেন সেই বড় হয়। আমি হারু চাষাকে মহাকর্ম্মী দেখিলাম। সে একদণ্ডও বসিয়া থাকে না কিন্তু আমি তাহাকে একবারও আপনার নাম করিতে দেখি নাই। রাত্রিতে সে আমার নিকটে শয়ন করিবামাত্র নাসিকাগর্জ্জনকরতঃ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া গেল।" তখন ভগবান বলিলেন "আচ্ছা নারদ, ও কথার মীমাংসা পরে হইবে; উপস্থিত তুমি আমার নিমিত্ত মুকুন্দ ঘোষের নিকট হইতে এক সের দুগ্ধ লইয়া আইস।" এই বলিয়া ভগবান নারদকে কাষ্ঠনির্ম্মিত একটী 'পাই' দিলেন যাহাতে এক সের মাত্র দুগ্ধ ধরে। নারদ বাম হস্তে বীণা এবং দক্ষিণ হস্তে দুগ্ধপাত্রটী লইয়া অতি কষ্টে ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইলে, ভগবান বলিলেন "নারদ, মুকুন্দ ঘোষের বাড়ী হইতে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত তুমি আমার নাম করিয়াছিলে কিনা?" নারদ উত্তর করিলেন "না প্রভো, আমার উচ্চ মগজ পাছে দুধ পড়িয়া যায় এই চিন্তায় ব্যস্ত ছিল।" তখন ভগবান বলিলেন "তুমি দুগ্ধআনয়নকরারূপ" সামান্য কাজের জন্য আমাকে ভুলিয়া গেলে, আর হারু ঘোষ নিম্ন মগজের সাহায্যে যাবতীয় দৈনন্দিন কার্য্য করিয়া থাকে এবং উচ্চ মগজের সাহায্যে সর্ব্বদা আমার নাম লয়। আমি একদণ্ডও তাহার হৃদয় ছাড়া নহি।" নারদ নিরুত্তর রহিলেন।

উচ্চ মগজে বহুসংখ্যক মৌচাকের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোপ (cell) আছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যে ভাব অনুভূত হয়, সেই ভাবজ্ঞাপক একটী রেখা বা চিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন খোপে অঙ্কিত হয়। আমি একটী মন্দির দেখিলাম; দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা এই মন্দিরের প্রতিমূর্ত্তি একটী খোপে অঙ্কিত হইল। যেমন

সংক্ষেপ লিপি (short hand) প্রথায় একটী চিহ্ন দ্বারা মন্দির বুঝায় সেইরূপ একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র চিহ্ন বা রেখা দ্বারা উচ্চ মগজে সর্ব্বদাই মন্দিরটী বুঝাইবে। থিয়েটারে একটী দৃশ্য দেখিলাম, একটী রেখা দ্বারা সমস্ত দৃশ্যটী বুঝাইবে। পরদিন বা অন্য একদিন ঐ রেখাটী দ্বারা সমস্ত দৃশ্যটী মনে আসিবে। যে শব্দের অর্থ বা ভাব থাকে না, তাহার চিহ্ন অতি অস্পষ্টভাবে উঠে, সুতরাং তাহা সহজে মনে আসে না। যে ভাব একটী ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্জ্জিত হয়, তাহার রেখা অগভীর হয়। দুই বা ততোধিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে ভাবের অর্জ্জন হয়, তাহার রেখা অপেক্ষাকৃত গভীর হয়। গভীর রেখা সহজে মনে আসে; এইজন্য মানচিত্রের সাহায্যে ভূগোল শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। শুধু বক্তৃতায় শিক্ষা দিলে কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা ভাব অনুভূত হয় বলিয়া রেখাগুলি তত গভীর হয় না, কালবোর্ডের (black board) সাহায্যে শিক্ষা দিলে দর্শন ও শ্রবণ এই দুইটী ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে রেখা অঙ্কিত হয়, সুতরাং রেখাগুলি গভীরতর হয় এবং পরে সহজেই মনে আসে। বিনা অর্থবোধে শুধু শব্দের সমষ্টির রেখা পড়ে না বা যদিও পড়ে অতি অস্পষ্টভাবে পড়ে; এইজন্য না বুঝিয়া শুধু মুখস্থ করিতে যাওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, খেই হারাইয়া যায়। কোনও উচ্চ ইংরাজী স্কুলের সংলগ্ন ছাত্রাবাসে প্রধান শিক্ষকের সহিত কথা কহিতেছিলাম এবং তৃতীয় শ্রেণীর একটী ছাত্র ভূগোল পড়িতেছিল "A river is that, a river, a river, a river, river, river, river, a river is that, a river is that, a river is that etc." "যে জলরাশি বহুজনপদ……তাহাকে নদী বলে; যে জলরাশি, যে জলরাশি, যে জলরাশি, জলরাশি, জলরাশি, রাশি, রাশি, যে জলরাশি……তাহাকে নদী বলে, নদী বলে, নদী বলে, নদী, নদী, নদী, তাহাকে নদী বলে …।" ছাত্রটী প্রত্যেক শব্দের রেখা উচ্চ মগজে উঠাইতে চেষ্টা করিতেছিল; ক্লাসে গিয়া শিক্ষক মহাশয় নদী কাহাকে বলে প্রশ্ন করায়

সমস্ত সংজ্ঞাটী বলিতে পারিল না, আট্‌কাইয়া গেল বা খেই হারাইয়া গেল। ভাবটী বুঝিয়া লইয়া দুই তিনবার পড়িয়া গেলেই সমস্তই স্মরণপথে আপনিই আসিয়া পড়ে; অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না।

উচ্চ মগজ পঞ্চভূতের বলিয়া উহার ধারণাশক্তি সসীম। বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত অসংখ্য রেখার সমাবেশ হইতে হইবে, সুতরাং স্থান কুলায় না বলিয়া বাল্যকালের রেখাগুলি মুছিয়া যায়। জীবের মৃত্যু হওয়া বাঞ্ছনীয়, নচেৎ ধরণীতে জীবের স্থান কুলাইত না। সেইরূপ বাল্যকালের রেখাগুলি মুছিয়া না গেলে, পরবর্ত্তী কালের রেখার স্থান হইবে না। বাল্যকালের রেখা যদি মধ্যে মধ্যে স্মরণ করা হয়, তবে অগভীর রেখাগুলি গভীর হইয়া যায়। এক পথের উপর মানুষ বহুকাল হইতে হাঁটিলে পথটী সুস্পষ্ট ও প্রশস্ত হইতে থাকে। বাল্যকালের কোনও কোনও ঘটনা সেইজন্য মনে থাকে।

উচ্চ মগজ পঞ্চদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত খুবই নরম থাকে, ষোল হইতে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত একটু একটু কঠিন হইতে থাকে এবং তৎপরে ইহা কঠিন হইয়া যায়। কুম্ভকার যেমন কাঁচা মাটীর দ্বারা ঘট প্রভৃতি ইচ্ছামত নির্ম্মাণ করিতে পারে, মাটী শুকাইয়া গেলে আর পারে না, সেইরূপ ষোড়শ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মানুষের অনুকরণবৃত্তি বা স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রবল থাকে, পরে স্মৃতিশক্তির প্রাখর্য্য কমিয়া যায়, বিচারশক্তি বাড়ে। এই সময়ের মধ্যে বালকের চরিত্র যেরূপ গঠিত হইবে, তাহাই থাকিয়া যায়; সেইজন্য ঐ সময় পর্য্যন্ত বালকের দিকে তাহার পিতামাতা বা অভিভাবকের তীব্র লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তেতু ষোড়শেবর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥"

জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বালককে আদরে প্রতিপালন করিবে, কারণ ঐ সময়ের মধ্যে বালককে তাড়না করিলে উচ্চ মগজের প্রকৃত গঠন

হইবে না। ছয় হইতে পনর এই দশ বৎসর ধরিয়া বালককে তাড়না করিবে অর্থাৎ তীব্র দৃষ্টিতে রাখিবে। বালক যোল বৎসরের হইলে তাহাকে বন্ধুর ন্যায় মনে করিবে। দশ হইতে যোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালকের চরিত্র যেরূপ গঠিত হইবে, তাহাই থাকিয়া যাইবে।

ছাত্র পড়া বলিতে না পারিলে তাহাকে বেত্রাঘাত করা নিষিদ্ধ। যে কাগজে বা পত্রে লিখিতে যাইতেছি, তাহা যদি কাঁপিতে থাকে, তবে লেখা আঁকা বাঁকা হইয়া অস্পষ্ট হইবে। বালক উচ্চ মগজে ধারণা করিবে; বেত উত্তোলন করিয়া যদি শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে ভয়ে তাহার উচ্চ মগজ কাঁপিতে থাকে; ঐ অবস্থায় যাহা শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। বালক আনন্দের সহিত যাহা শিখিবে, তাহাই স্থায়ী হয়। ছাত্র মুখস্থ করিতে বা পড়া বলিতে না পারিলে, দোষ ছাত্রের নহে, শিক্ষকের। শিক্ষক মহাশয় ছাত্রকে প্রথামত বুঝাইতে পারেন নাই। ছাত্রের স্বভাবের দোষ পরিলক্ষিত হইলে তাহাকে রীতিমত প্রহার করিতে হইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে আছে—

"নিত্য যাহা পড়িবে, নিত্য তাহা অভ্যাস করিবে," ইহার তাৎপর্য্য রেখাগুলিকে গভীর করিয়া লওয়া, যাহাতে শীঘ্র ও সহজে মনে আসে।

নারদ বলিয়াছিলেন উচ্চ মগজ দুধের চিন্তায় ব্যস্ত ছিল এবং নিম্ন মগজ রাস্তা হাঁটায় ব্যস্ত ছিল সুতরাং তিনি হরিনাম করিবেন কি করিয়া। ইহা হইতে বুঝা যায় হাতে নাম জপা অপেক্ষা মালার সাহায্যে জপা প্রশস্ত; কারণ হাতে জপিতে গণনার প্রয়োজন হয়, মালায় হয় না; ১০৮ বার জপা হইয়া গেলে চিহ্ন দ্বারা বুঝিতে পারা যায় জপা শেষ হইল। আঙ্গুল দানার পর দানায় আপনিই চলিয়া যাইবে। উচ্চ মগজে উপাস্য দেবতাকে রাখা যায়; হাতে জপিতে গেলে দশবার জপার পরে মূর্ত্তি সরিয়া যায়। অবশ্য প্রাণায়ামে ১৬, ৬৪ ও ৩২ জপিবার সময়ে দক্ষিণ হস্ত নাসিকায় আবদ্ধ থাকে, সুতরাং

মালায় সুবিধা হয় না, বাম হস্তে গণনা করিতেই হইবে কিন্তু কর ফিরাইবার সময়ে মূর্ত্তি সরিয়া যায়, আবার তাহাকে জোর করিয়া আনিতে হয়। যদি বলা যায় হাতে অনির্দ্দিষ্টবার জপ করিব; ইহা কাজের কথা নহে। সমস্ত কাজেরই একটা নিয়ম থাকা ভাল। মনঃসংযোগ হইয়া গেলে অনির্দ্দিষ্টবার নাম জপা চলিতে পারে। প্রথম প্রথম জপিবার সময়ে একবার কি দুইবার বা দশবার ১০৮ বার করিয়া নাম জপা ভাল। মোট কথা একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা থাকা চাই। শিক্ষানবিশগণ মালায় উচ্চৈঃস্বরে নাম জপিবে, তাহাতে উচ্চ মগজ ও নিম্ন মগজ এক হইতে পারে এবং পার্শ্বস্থ লোকদিগেরও কিঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে; কিন্তু অস্ফুটস্বরে বা গুন্ গুন্ রবে জপা একেবারে নিষিদ্ধ। কেহ গুন্ গুন্ স্বরে জপিলে বুঝিতে হইবে তাহার নিম্ন মগজ জপক্রিয়া করিতেছে এবং উচ্চ মগজ অন্য চিন্তা করিতেছে।

শাস্ত্র বলিতেছেন এই ঘোর কলিকালে তারকব্রহ্ম নামই মোক্ষের একমাত্র উপায়। এই নাম হইতেছে—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

এখন দেখা যাউক এই নাম জপিলে কিরূপে মোক্ষলাভ করা যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কামাদি ষড়রিপু মোক্ষের অন্তরায় এবং বিনা অর্থে শব্দের কোনও মূল্য নাই।

"ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশামগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥" গীতা—৩।৩৪

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে অনুরাগ ও বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। ঐ রাগ দ্বেষের বা কামাদি ষড়রিপুর বশবর্ত্তী হইবে না কারণ উহারা মুমুক্ষুর অর্থাৎ মোক্ষলাভেচ্ছু ব্যক্তির একান্ত বিরোধী।

নামে তিনটী মাত্র শব্দ আছে—হরি, কৃষ্ণ ও রাম। এই তিনটী শব্দের ঘুরণে ও ফিরণে শ্লোকটী হইয়াছে। হরি শব্দের অর্থ হরণ করা বা চুরি করা ও স্থানান্তরিত করা। চোর আমার একটী বাটী চুরি করিয়াছে ইহার অর্থ সে বাটীটী আমার বাড়ী হইতে তাহার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছে বা বাটীটী স্থানান্তরিত করিয়াছে। বাটীটী ছিল আমার বাড়ীতে এখন গেল বা রহিল তাহার বাড়ীতে। কৃষ্ণ শব্দে কর্ষণ করা বা লাঙ্গলচালান বুঝায় এবং রাম শব্দের অর্থ আনন্দ।

এক্ষণে মনে করুন আমি কলিকাতা হইতে একটী বোম্বাই আমের কলম আনিয়াছি। প্রত্যেক কর্ম্মের উদ্দেশ্য থাকিবেই থাকিবে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য আম ফলিবে। উপযুক্ত সার দিয়া গাছটী মাটীতে পুতিলাম এবং প্রত্যহ জল সেচন করায় গাছটী বেশ সতেজ হইতে লাগিল। ঐ গাছের পাঁচ হাত দূরে মাটীর নীচে একস্থানে মাধবীলতার বীজ নিহিত আছে; ইহা অবশ্য ভগবানের বীজ। ভগবানের বীজ সর্ব্বত্র ছড়ান থাকে। আমরা ক্ষেত্রে ধানের বীজ বপন করি, ঘলঘসী বা শিয়ালকাঁটার বীজ বপন করি না, কিন্তু সেগুলি জন্মে।

"Wheats and tares must grow together".

গম ও আগাছা একত্র জন্মিবে।

আমগাছের জল পাইয়া বীজটীর আবরণ ফাটিয়া গিয়া উহা অঙ্কুরিত হইল এবং লতায় পরিণত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং পরে উহার 'শুঙ্গা' হইল। আমরা চক্ষুর সাহায্যে দর্শন করি, লতা শুঙ্গার সাহায্যে দর্শন করে। যেমন রমণীর কার্য্য পুরুষকে আশ্রয় করা সেইরূপ লতার কার্য্য হইতেছে বৃক্ষকে আশ্রয় করা। লতাটী শুঙ্গার সাহায্যে দেখিয়া লইল বৃক্ষ কোথায় আছে এবং সেই দিকে শুঙ্গা বাড়াইয়া শেষে সহকার বৃক্ষের গোড়ায় পৌছিল এবং পরে বৃক্ষটীকে বেষ্টন করিতে আরম্ভ করিল। মাটী হইতে এবং বৃক্ষ হইতে রস টানিয়া লতাটী বেশ সতেজ হইতে লাগিল, অপরদিকে আমগাছটী নিস্তেজ

হইয়া আসিতে লাগিল এবং ক্রমে মরিয়া যাইবার উপক্রম হইল। ফলে আমফলারূপ আমার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। যদি আমি পাকা মালী হই, তবে যখনই দেখিব লতাটী গাছকে পাঁচ সাত পাক 'বেজাইয়াছে', তখনই গাছ হইতে 'বেজ' গুলি খুলিয়া লইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিব। লতার 'বেজগুলি' ছিল আমগাছে এখন রহিল ভূমিতে। ইহারই নাম স্থানান্তরিত করা বা হরি করা। দুই তিন দিন পরে দেখিব লতাটী পুনরায় গাছের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং ক্রমশঃ আবার বৃক্ষকে 'বেজাইতে' আরম্ভ করিবে, কারণ লতার কার্য্যই হইতেছে বৃক্ষকে আশ্রয় করা। (লতায় ডালা দিলে উহার কার্য্য ভাল হয় অর্থাৎ লতা বেশ সতেজ থাকে এবং সুফল প্রদান করে।) তখন বুঝিতে হইবে শুধু হরি বা স্থানান্তরিত করিলেই আমার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, যাহাতে ভবিষ্যতে লতাটী কখনও বৃক্ষের অনিষ্ট করিতে না পারে, তজ্জন্য লতাটীর মূল দেশ লাঙ্গলের সাহায্যে উৎপাটিত করিয়া উহাকে নির্ম্মূল করিতে হইবে অর্থাৎ আমাকে কৃষ্ণ করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই আম ফলিবে বা আমার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে অর্থাৎ আমার আনন্দ বা রাম আসিবে। কাজেই প্রথমে হরি করিয়া, পরে কৃষ্ণ করিলে রাম আপনিই আসিবে, রামকে আর ডাকিতে হইবে না। এই আমগাছ আমার আত্মা এবং মাধবীলতা ষড়রিপু। এই রিপুগণ আমার আত্মাকে বেষ্টন করিয়া আত্মাকে পাশ ফিরিতে দিতেছে না অর্থাৎ ধূম যেমন অগ্নিকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়া অগ্নিকে প্রকটিত হইতে দেয় না, সেইরূপ ষড়রিপু বা অজ্ঞান আত্মাকে বা আত্মজ্ঞানকে সর্ব্বতো-ভাবে আবৃত করিয়া রাখায় আত্মার প্রকাশ হয় না। আত্মার প্রকাশ না হইলে আনন্দ বা রাম আসে না।

"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।" গীতা—৫।১৫

অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া জীবগণ মোহগ্রস্ত হয় বা দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

"ধূমেনা ব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শোমলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥" গীতা—৩।৩৮

অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, দর্পণ যেমন ধূলা দ্বারা আবৃত থাকে এবং গর্ভস্থ শিশু যেমন জরায়ু দ্বারা আবৃত থাকে, জ্ঞান সেইরূপ অজ্ঞান দ্বারা আবৃত থাকে।

আত্মাই একমাত্র চেতন।

"যে আছ চেতন ঘুমাইও না আর,
দারুণ ঘোর নিবিড় আঁধার।
কর তমোনাশ হওহে প্রকাশ,
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়,
তব পদে তাই শরণ চাই॥"

এখানে আত্মাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে। আত্মার প্রকাশ না হইলে মানবের কিছুতেই নিস্তার নাই।

নিজ উদ্দেশ্য সাধিত করিতে গেলে প্রথমে রিপুগণকে আত্মা হইতে স্থানান্তরিত (হরি) করিতে হইবে, এমন কি যাহাতে ভবিষ্যতে উহারা আত্মার কোনও অনিষ্টসাধন করিতে না পারে তজ্জন্য উহাদিগকে উৎপাটিত (কৃষ্ণ) করিতে হইবে, তবেই তমের নাশ হইবে, আত্মার জ্যোতিঃ প্রকটিত হইবে বা আনন্দ (রাম) আসিয়া উপস্থিত হইবে। অতএব তারকব্রহ্ম নামের অর্থ যাহা শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গারের শ্লোকের অর্থও তাহা—

"কামং ক্রোধং লোভং মোহং
ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যসি কোঽহম্।
আত্মজ্ঞান বিমূঢ়া
স্তেপচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ॥"

কাম ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপুগণকে পরিত্যাগ করিয়া 'আমি' কে দেখ। আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ গভীর নরকে পচিতে থাকে।

যিনি এইভাবে হরিনাম জপ করেন, তাঁহার জপই সার্থক, নচেৎ অর্থ না বুঝিয়া আজীবন নিম্ন মগজের সাহায্যে হরে কৃষ্ণ ইত্যাদিরূপ করতঃ উচ্চ মগজে লাউ চিংড়ির চিন্তা করিলে কোনও ফল হইবে না।

"অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে তারে সুজন কসাই।
শুগা পড়াইগে গণিকা তারে তারে মীরাবাই॥"

জগাই মাধাইএর ন্যায় অঙ্কা ও বঙ্কা দুই ভাই হরিনাম করিয়া উদ্ধার হইয়াছে, সুজন নামক কসাই মৃত্যুকালে 'হারাম' বলিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল; 'হারাম' এই কথায় রাম থাকায় সে উদ্ধার হইয়াছিল, এক বেশ্যা টিয়াপাখীকে হরিনাম পড়াইয়া উদ্ধার হইয়াছিল এবং ভক্তশ্রেষ্ঠা মীরাবাই উদ্ধার হইয়াছিলেন।

ইহার কোনও ভিত্তি নাই। ইহা কেবল নামের মাহাত্ম্য বাড়ান। কামাদি ষড়রিপু জয় করিয়া যাঁহার অন্তর বিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনিই উদ্ধার হইবেন। অর্থ না বুঝিলে নামের কোনও মূল্য নাই। উপসংহারে ইহা বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে।

হরে কৃষ্ণ নাম জপা গৃহীর পক্ষে ব্যবস্থা, কারণ মানুষ গৃহস্থাশ্রমে থাকিলে অল্পবিস্তর ষড়রিপু থাকিবেই থাকিবে, কিন্তু যাঁহারা কামিনী কাঞ্চনের ভয়ে সংসার ত্যাগ করিয়া সাধু বা সন্ন্যাসী হন, তাঁহারা 'বেজ্ঞান'র হাত হইতে এড়াইয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও লতার বীজ বা ষড়রিপু হৃদয়ে নিহিত থাকে; উহারা কোন্ দিন কোন্ মুহূর্ত্তে সুপ্ত অবস্থা হইতে জাগ্রত হইয়া তাঁহাদের কী অনিষ্ট সাধন করিতে পারে।

কোনও গ্রামের প্রান্তভাগে পর্ণকুটীরে এক সাধু বাস করিতেন। কেহ বলিতেন সাধুর বয়স দুই শত বৎসর, কেহ বলিতেন তিন শত বৎসর ইত্যাদি। মোট কথা আকৃতি দেখিয়া মনে হইত সাধুর বয়স এক শত বৎসরের কম নহে। সাধু প্রতিদিন একাহারে থাকিয়া ভগবানের উপাসনা করিতেন এবং সমাগত ব্যক্তিদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি দেশীয় গাছ গাছড়া দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ ও প্রক্রিয়া দ্বারা দুরারোগ্য পীড়া উপশম করিতে পারিতেন। ইহাতে সাধুর সুনামে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়াছিল।

এমন লোক অনেক আছে যাহারা অপরের প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না। সাধুর সুনাম শ্রবণে সেই গ্রামের এক চণ্ডালের গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইয়াছিল। সে সর্ব্বদাই সাধুর নিন্দাবাদ করিয়া বেড়াইত। সাধুর তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করা কাহারও কাহারও স্বভাব থাকে; চণ্ডাল ঐ প্রকৃতির লোক ছিল। সে মরিয়াও সাধুর অনিষ্ট করিবার মনস্থ করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপ দারুণ হিংসাবৃত্তি মনে পোষণ করিয়া দেহত্যাগ করায় চণ্ডাল ভূতযোনি প্রাপ্ত হইল। ভূত হইয়া সে অলক্ষ্যে সর্ব্বদাই সাধুর আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং সাধুকে পদস্খলিত করিবার সুবর্ণ সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

সেই দেশের রাজার বয়স্থা ও অনূঢ়া কন্যা বহুদিন হইতে অজীর্ণ পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিল। বহু প্রকার চিকিৎসা করাইয়াও যখন কোন সুফল হইল না তখন মন্ত্রী বলিলেন "মহারাজ, অমুক গ্রামের এক সাধু অসাধ্য পীড়ার উপশম করিতে সমর্থ; একবার রাজকন্যাকে সাধুর নিকটে লইয়া গেলে হয় না?" রাজা সম্মত হইয়া রাজকন্যাকে নরবাহনে সাধুর আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। সাধু বলিলেন "রাজকন্যার পীড়া সারিয়া যাইবে, তবে কিছু সময় লাগিবে।" সাধুকে অবিশ্বাস নাই সুতরাং রাজকন্যা সাধুর আশ্রমে থাকিয়া গেল।

চণ্ডালভূত ভাবিল "সাধু এইবার তোমাকে দেখিয়া লইব।" সে সর্ব্বদা অলক্ষ্যে বলিত "সাধু, রাজকন্যা আরোগ্যলাভ করিয়াছে, এখন উহার উপর পাপাচরণ করিতে দোষ কি? তোমার কিছুই অনিষ্ট হইবে না; কেহই জানিতে পারিবে না; অধিকন্তু তোমার উপরে সকলের অগাধ বিশ্বাস আছে। কেহই রাজকন্যার কথা বিশ্বাস করিবে না।" কে কথা কহিতেছে দেখিতে না পাইয়া সাধু মনে করিলেন উহা দৈববাণী। আগুনের কাছে ঘি কঠিন অবস্থায় কতক্ষণ থাকিতে পারে? এইজন্যই শাস্ত্রে আছে "যে গৃহে তোমার উপযুক্তা কন্যা, ভগ্নী এমন কি মাতা থাকিবে, সে গৃহে থাকিয়া তুমি অবাধে তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেনা।" ব্রহ্মারও কন্যাগমন অপবাদ আছে। সাধু পদস্খলিত হইলেন। তিনি রাজকন্যার উপর পাপাচরণ করিয়া ফেলিলেন। পাপ কর্ম্ম করিবার অব্যবহিত পরে অনুতাপ ও ভয় আসিবেই আসিবে। সাধুর ভয় হইল। তখন ভূত বলিল "সাধু, যদি প্রাণের মায়া রাখ, তবে আমি যাহা বলি শুন। রাজকন্যাকে হত্যা করিয়া প্রাঙ্গনে পুতিয়া ফেল। রাজা অনুসন্ধান করিলে বলিবে রাজকন্যা আরোগ্যলাভ করিয়া একা চলিয়া গিয়াছে; তোমার কথা রাজা বিশ্বাস করিবেন এবং মনে করিবেন পথিমধ্যে কোনও বিপদ ঘটিয়াছে।" প্রাণের মায়া বড় মায়া। পাপীর বিবেচনাশক্তি লোপ পাইয়া যায়। যে যাহা বলে সে তাহাই শুনে। সাধু ভূতের উপদেশমত তাহাই করিল এবং রাজা রাজকন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইলে লোকদিগকে বলিলেন "রাজকন্যা আরোগ্যলাভ করিয়া এখান হইতে একা চলিয়া গিয়াছে।" অনেক অনুসন্ধান করিয়াও রাজকন্যার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

এদিকে ভূত রাজার নিকটে গিয়া অলক্ষ্যে বলিল "মহারাজ আপনার কন্যাকে কোথায় পাইবেন? সাধু আপনার কন্যার উপর পাপাচরণ করিয়া ভয়ে তাহাকে হত্যা করিয়া প্রাঙ্গনের অমুক স্থানে প্রোথিত করিয়াছে।" রাজা

তৎক্ষণাৎ সাধুর আশ্রমে গিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করাইয়া কন্যার মৃতদেহ প্রাপ্ত হইলেন। রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া গেলেন এবং কন্যার মৃতদেহ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সাধুকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন। পরে তিনি সাধুকে শূলে দিবার আদেশ করিলেন।

শূলে চড়াইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজা বলিলেন "ওহে ভণ্ড সাধু! মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার কি অভিলাষ আছে বল।" সাধু বলিলেন "আমাকে পনর মিনিট সময় দিন, আমি একবার ভগবানকে ডাকিয়া লই।" রাজা অনুমতি দিলেন। সাধু আসন করিয়া ভগবানের স্তব করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে ভূত বলিল "সাধু, এখন একমাত্র আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারি। আমাকে তুমি চিনিতে পারিবে, আমি অমুক নামের চণ্ডালভূত। যদি তুমি আমার স্তবস্তুতি করিতে পার, তবে আমি তোমাকে শূন্যে লইয়া অন্য রাজার দেশে রাখিয়া আসিতে পারি।" প্রাণের মায়ায় সাধু ভূতের স্তবস্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা বলিলেন "এই ভণ্ড সাধু ভূতের স্তব করিতেছে, সুতরাং ইহাকে সময় দেওয়া হইবে না। কে আছিস্‌রে, সাধুকে শূলে চড়া।" ঠিক এমন সময়ে এক জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে বলিলেন "রাজন্ কিজন্য ব্রাহ্মণ ও সাধু হত্যা করিয়া পাপে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন?" রাজা প্রণত হইয়া বলিলেন "কামাসক্ত ও নরঘাতককে শাস্তি দিবার রাজার অধিকার আছে; অতএব আপনি নিরস্ত হউন।" সন্ন্যাসী বলিলেন "রাজন্, আপনি আমার কথা শুনুন, ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিন; আমি আপনার কন্যাকে বাঁচাইয়া দিতেছি"। এই বলিয়া তিনি মন্ত্রবলে রাজকন্যাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিলেন এবং বলিলেন "রাজন্, এই সাধুর সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিন, তাহা হইলে সবদিক বজায় থাকিবে।" তৎপরে তিনি সাধুকে বলিলেন "বাবা, ইন্দ্রিয় জয় না করিয়া সাধু হওয়া যায় না। ভাল করিয়া শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিবে। এক্ষণে তুমি রাজকন্যাকে

বিবাহ করিয়া গৃহী হও। পরে ভোগ শেষ হইলে যোগী হইবার চেষ্টা করিও। আর কখনও পদস্খলিত হইও না। তবে বাবা, তুমি অনেক উচ্চে উঠিয়া ছিলে, নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই॥ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায়।"

কোনও মহকুমায় এক মৌনী সাধু বাস করিতেন। তিনি গুহার ভিতরে থাকিয়া জপতপ করিতেন। প্রায় পনর ষোল বৎসর তথায় থাকায় সাধুর অনেক শিষ্য হইয়াছে এবং তাঁহার অনেক সম্পত্তিও আছে। কত কত লোক মৌনী বাবাকে দর্শন করিয়া যাইতেন ও তাঁহার সেবা করিতেন। অল্প দিন হইল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এক রমণী তাঁহার পদসেবা করিতেছিল, হঠাৎ সাধু ঐ রমণীর উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। রমণী চীৎকার করায় ঘটনা প্রকাশ হইতে বাকি রহিল না। এই সাধুর ভোগবিলাস যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হইত। কোনও সাধুর ভোগবিলাস থাকা বাঞ্ছনীয় নহে।

ইহা হইতেই বুঝা যায় এবম্ভূত সন্ন্যাসীদিগের অন্তরে ষড়রিপুর বীজ নিহিত থাকে। সুবিধা পাইলেই ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া পূর্ণলতায় পরিণত হইয়া যায়। সন্ন্যাসী বা সাধুদিগের হরিনামের প্রয়োজন না হইতে পারে; শুধু ষড়রিপুকে তাড়াইতে পারিলেই হইল অর্থাৎ রিপুগণকে লাঙ্গল দিয়া উৎপাটিত করিতে পারিলেই হইবে। তাঁহাদিগের 'সীতারাম' নাম জপের প্রয়োজন। লাঙ্গল চালাইলে মাটীতে যে গর্ত্ত বা খাদ হয় তাহাকে সীতা বলে। সুতরাং 'সীতা' করিলেই 'রাম' আসিবে। পশ্চিমের সাধুদিগের মুখে 'সীতারাম' নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

উচ্চ মগজ ও নিম্ন মগজ এক না করিয়া কোনও কাজ করিলে সে কাজের কোনও ফল হয় না। মনে করুন কোনও পূজক শিবপূজা করিবার সময়ে শিবের ধ্যানমন্ত্র আওড়াইলেন—

"ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং পদ্মাসীনং সমন্তাৎস্তুতমমরগণৈঃ ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং" এবং বিল্বপত্র লইয়া 'ওঁ নমঃ শিবায়' বলিয়া শিবের মস্তকে বিল্বপত্রটী প্রদান করিলেন। তিনি নিম্ন মগজের সাহায্যে মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিয়া গেলেন মাত্র। পূজাত হইল না। প্রকৃত পূজা হইতে গেলে নিম্ন মগজের সাহায্যে মন্ত্রগুলি উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত প্রতিবিম্বগুলি গঠিত হওয়া উচিত ঃ—'ওঁ'— প্রত্যেক মন্ত্রের পূর্ব্বে 'ওঁ' শব্দ উচ্চারিত হওয়া উচিত। ইহা প্রণব।

"আসীন্মহীক্ষিতামাদ্যঃ প্রণবশ্ছন্দসামিব।" রঘুবংশ।

রাজা দিলীপ ছন্দদিগের মধ্যে প্রণবের ন্যায় নরপতিগণের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন।

ধ্যায়েৎ অর্থাৎ চিন্তা করিতে হইবে (শিবের মূর্ত্তি)।
মহেশং অর্থে পরমেশ্বর বুঝিতে হইবে।
রজতগিরিনিভং অর্থাৎ শ্বেতবর্ণের পর্ব্বতের ন্যায়।

সুতরাং রজতগিরিনিভং শব্দ উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শুভ্রবর্ণের শিবের প্রতিমূর্ত্তি উচ্চ মগজে অঙ্কিত করিতে হইবে।

চারুচন্দ্রাবতংসং শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শিবের ললাটে মনোহর অর্দ্ধচন্দ্রমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে হইবে।

রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং শব্দ উচ্চারিত হইবার সঙ্গে ধারণা করিতে হইবে শিবের গায়ের রং ফ্যাক্‌ফেকে সাদা নহে, শিব উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ অর্থাৎ তাঁহার দেহ হইতে ভয়ঙ্কর জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং শব্দের সঙ্গে এরূপ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে হইবে যে শিবের চারিটী হস্ত ; এক হাতে

কুঠার ও এক হাতে মৃগ বর্ত্তমান এবং অপর দুইটী হাতের মধ্যে একটী বরহস্ত ও অপরটী অভয়হস্ত। প্রসন্নং শব্দের সঙ্গে শিবের শান্তমূর্ত্তি বা হাস্যবদন বুঝিতে হইবে। পদ্মাসীনং শব্দে বুঝিতে হইবে তিনি পদ্মের উপরে বসিয়া আছেন। সমন্তাৎস্তুতমমরগণৈঃ শব্দ উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মনে করিতে হইবে তাঁহার চতুর্দ্দিকে দেবগণ তাঁহাকে স্তব করিতেছেন। ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং শব্দে বুঝিতে হইবে তিনি বাঘছাল পরিধান করিয়া আছেন। বিশ্বাদ্যং শব্দে বুঝিতে হইবে তিনি স্বয়ম্ভু। বিশ্ববীজং শব্দ উচ্চারিত হইবার সঙ্গে ধারণা করিতে হইবে তিনি বিশ্বচরাচর সৃজন করিয়াছেন। নিখিল-ভয়হরং শব্দে বুঝিতে হইবে তিনি ভবভয়হারী অর্থাৎ যিনি তাঁহার শরণ লন, তাঁহার কোনও ভয়ই থাকে না। পঞ্চবক্ত্রং শব্দ উচ্চারণ করিবার সময়ে পাঁচটী মুখবিশিষ্ট শিবের মূর্ত্তি চিন্তা করিতে হইবে। ত্রিনেত্রং শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই ধারণা করিতে হইবে শিবের মোট পনরটী চক্ষু আছে, প্রত্যেক মস্তকে তিনটী করিয়া চক্ষু।

ত্রিনেত্রং শুধু বহুব্রীহি সমাস করিলে মোট তিনটী চক্ষুবিশিষ্ট শিব বুঝায় কিন্তু তাহা হইতেই পারে না, কারণ প্রত্যেক মস্তকে একটী করিয়া চক্ষু থাকিলেও দুইটী মস্তক চক্ষুহীন হইয়া পড়ে। 'ত্রিনেত্রং' একশেষ দ্বন্দ্ব ও বহুব্রীহি সমাস করিলে কোনও গোলমাল হয় না। যেমন মাতা চ পিতা চ পিতরৌ, বৃক্ষশ্চ বৃক্ষশ্চ বৃক্ষশ্চ বৃক্ষাঃ একশেষ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, নেত্রঞ্চ, নেত্রঞ্চ, নেত্রঞ্চ, নেত্রঞ্চ, নেত্রঞ্চ নেত্রাণি শব্দ নিষ্পন্ন হইল, পরে ত্রীণি নেত্রাণি যস্য তৎ ত্রিনেত্রং অর্থ কিন্তু পঞ্চদশ বা পনর। একশেষ দ্বন্দ্ব প্রথমে করিয়া লইয়া পরে বহুব্রীহি সমাস করিলে ত্রিনেত্রং শব্দে পঞ্চদশ নেত্রবিশিষ্ট শিব বুঝাইল।

যিনি এইভাবে উচ্চ মগজে মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া নিম্ন মগজে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূজা করিবেন, তাঁহার পূজাই প্রকৃত সাত্ত্বিক পূজা। নৈবেদ্য উৎসর্গ

করিবার সময়ে কুশীর জলে শুধু অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা, প্রাণায় স্বাহা, অপাণায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা বলিলে কোনও ফল হইবে না। বায়ুগুলি কোন্ কোন্ স্থানের তাহা জানিতে হইবে এবং পূর্ব্বচিন্তিত মূর্ত্তিমান্ শিব নৈবেদ্য ভোজন করিতেছেন এরূপ চিন্তা করিতে হইবে। নিজমনে সন্তোষ আসিলেই কার্য্যসিদ্ধি। "The mind is its own place……" Milton.

নিজের জিনিষ অপরকে দেওয়ার নাম দান এবং যাঁহার জিনিষ তাঁহাকে দেওয়ার নাম নিবেদন। জগতের যাবতীয় দ্রব্যই ভগবানের, সুতরাং তাঁহার উদ্দেশে দত্তদ্রব্যের নাম নৈবেদ্য। যে ব্যক্তি ভগবানকে মন্ত্রযুক্ত বা মন্ত্রহীন হইয়া খাদ্যদ্রব্য নিবেদন না করিয়া ভোজন করে, তাহাকে স্তেন বা চৌর বলা হয়।

'তদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে'। "সত্যনারায়ণের স্তব"।

হে প্রভো গোবিন্দ, তোমার জিনিষ তোমাকে দিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন।

ইহা অপেক্ষা গভীর কৃতজ্ঞতা কি থাকিতে পারে? ভগবানের ক্ষুধা নাই, তাঁহার খাইবার প্রয়োজন হয় না। তাঁহাকে ভোজ্য নিবেদন করিয়া এবং তাঁহাকে স্তব করিয়া আত্মসন্তোষ আসে। আত্মসন্তোষের তুল্য আনন্দ আর কি আছে?

"প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।" গীতা।

আত্মপ্রসাদ আসিলে সর্ব্বদুঃখের শেষ অর্থাৎ সুখ উপস্থিত হয়।

"ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।" গীতা ৩।১২

যেহেতু দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে বাঞ্ছিত ভোগ্য পদার্থ প্রদান করিবেন। তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্যাদি তাঁহাদিগকে প্রদান বা নিবেদন না করিয়া যে ব্যক্তি স্বয়ং ভোগ করে, সে চোরই।

যে ব্যক্তি নিম্ন মগজ ও উচ্চ মগজ একত্রীভূত করিয়া যাবতীয় কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তাহার অপ্রাপ্তব্য কিছুই থাকে না। পাঁচ টাকা ও তিন টাকা একত্র রাখিয়া গণনা করিলে মোট আট টাকা হয়। দুই বা ততোধিক একই প্রকার দ্রব্য একত্রীভূত করার নাম যোগ। নিম্ন মগজ ও উচ্চ মগজ একত্রীভূত করিয়া কার্য্য করাকে যোগক্রিয়া বলে। মন সর্ব্বদাই অস্থির, ইহা বায়ুর ন্যায় চঞ্চল। ইহাকে স্থির বা নিশ্চল করার নাম যোগ। ইহা করিতে হইলে একমাত্র সহিষ্ণুতা বা অভ্যাসের প্রয়োজন। এই সহিষ্ণুতা বা অভ্যাসের নাম তপস্যা। ছিপে মাছধরা ও অঙ্কন কার্য্য সহিষ্ণুতার সাহায্য করে। চণ্ডীদাস বাল্যকালে ছিপে মাছ ধরিতেন। মাছ টোপ না ধরিলেও তিনি প্রত্যহ ছিপ লইয়া পুকুরের ধারে বসিয়া থাকিতেন ও একদৃষ্টিতে ফাত্নার দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। ভীষণ রৌদ্র বা বৃষ্টিকে তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। ইহাই উত্তরকালে তাঁহার সাধক হইবার সাহায্য করিয়াছিল।

এক ভদ্রলোক কোনও ষ্টেশনের সংলগ্ন পুকুরে ছিপে মাছ ধরিতেছিলেন। তাঁহার জামার পকেটে ৭৫ টাকার নোট ছিল। প্রখর রৌদ্রে তিনি জামাটী দেহ হইতে খুলিয়া পাশে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এক চোর ইহা লক্ষ্য করিয়া একটী দেবদারু বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়াছিল। একখানি ট্রেন ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেছে এমন সময়ে চোর জামাটী লইয়া ট্রেনে উঠিল। যিনি মাছ ধরিতেছিলেন তিনি ইহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার দৃষ্টি বা মন ফাত্নায় ছিল। একজন পথিক ইহা লক্ষ্য করিয়া ভদ্রলোককে সাবধান করিয়া দিলেন। ভদ্রলোকটী তখন ট্রেনে উঠিয়া চোরকে ধরিয়া ফেলিলেন।

কোনও লোক ছিপে মাছ ধরিতেছিল; পার্শ্বস্থিত সর্পকে সে দেখিতে পায় নাই। সর্পদংশনে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ক্রীতদাস সিবাষ্টিয়ান রাত্রিতে তাঁহার প্রভুর গৃহে গোপনে চিত্র অঙ্কিত করিতে করিতে এমনই তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে রাত্রি যে প্রভাত হইয়া গিয়াছে তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই।

মন কোনও পদার্থে তন্ময় হইয়া গেলে নিজের দেহকে ভুলিয়া যায়। দেহই 'আমির' খাঁচা। দেহকে ভুলিতে পারিলেই বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারা যায়। যে মহাপুরুষগণ জীবন্ত অবস্থায় দেহকে ভুলিতে পারেন, তাঁহারা জীবন্মুক্ত।

এক কথায় বলিতে গেলে আত্মা ব্রহ্মের অংশ। ব্রহ্ম শক্তি, আত্মাও শক্তি; ব্রহ্ম নির্গুণ, আত্মাও নির্গুণ। ব্রহ্ম প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করিলে প্রকৃতি কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, আত্মা ও বুদ্ধিতে শক্তি সঞ্চার করিলে বুদ্ধি কার্য্য করে, বুদ্ধি মনকে এবং মন ইন্দ্রিয়দিগকে শক্তি সঞ্চার করিলে উহারা স্ব স্ব কার্য্য করে; আবার ইন্দ্রিয়গণ দেহে শক্তি সঞ্চার করিলে দেহ নড়ে বা কার্য্য করে। অতএব

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহু রিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥" গীতা ৩।৪২

দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা। ব্রহ্মাণ্ডের সহিত দেহের তুলনা করিলে যাহা হয়, ব্রহ্মের সহিত আত্মার তুলনা করিলে তাহা হয়।

আত্মার স্বরূপ জানিতে হইলে, ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতেই হইবে, কারণ অংশকে জানিতে গেলে পূর্ণকে জানিতে হয় অর্থাৎ পূর্ণকে জানা হইলে অংশকে

জানা হইল। যদিও ব্রহ্ম প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন, তাঁহাকে না জানিলে আমাদিগের চলিবে না; আমাদিগের উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইবে না।

কোনও ছাত্রকে শুভ্রতা শিখান অসম্ভব যদি না তাহাকে বহুবিধ শুভ্রবর্ণের বস্তু যথা বক, বস্ত্র, শঙ্খ, টগর, চূণ ইত্যাদি দেখান হয়। ছাত্র এবম্ভূত বহুবিধ শুভ্র বস্তু দর্শন করিয়া ক্রমে এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িবে, যখন শুভ্রতা ধারণা করিবার জন্য তাহাকে ঐ সকল বস্তু আর মনে আনিতে হইবে না। সেইরূপ প্রথম অবস্থায় ভগবানের স্বরূপ চিন্তা করিতেই হইবে, সুতরাং নিগুর্ণ ব্রহ্মের গুণত্রয় সমন্বিত সাকার (ভগবান) রূপের ধ্যানের আবশ্যক। তাই নিরাকার ভগবানকে উপাসনার নিমিত্ত সাকার বা দৃশ্য করিয়া লইতে হইবে।

জগতে সাধারণতঃ তিন প্রকার উপাসক বা ভক্ত আছেন। প্রথম শ্রেণীর ভক্ত তিনি যিনি নিজ আত্মা সর্ব্বভূতে দেখেন এবং সর্ব্বভূতের আত্মা নিজ আত্মায় দেখেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তগণ গীতার

"সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"

এই নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক জগতের যাবতীয় পদার্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া বা তাহাতে আকৃষ্ট না হইয়া বা ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া তাঁহার শরণ লইয়া কার্য্য করেন এবং সমস্তই শ্রীভগবানে সমর্পন করেন এমন কি নিজকেও ভুলিয়া যান। তাঁহারা তৃতীয় ও অধম শ্রেণীর ভক্ত নামে অভিহিত হন যাঁহারা নিরাকার ভগবানের মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ফুল জল ইত্যাদি দ্বারা পূজা করেন।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥" গীতা ৯।২৬

যিনি ভক্তিসহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন আমি সেইরূপ শুদ্ধচিত্ত ও নিষ্কাম ভক্তগণের প্রদত্ত তৎসমুদায় প্রীত হইয়া গ্রহণ করি।

আমাদিগকে প্রথমে তৃতীয় শ্রেণীর ভক্ত হইতে হইবে।

প্রকৃতপক্ষে আমরা মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিকে পূজা করি না, মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতে পূজা করিয়া থাকি। কুমারবাড়ী হইতে মূর্ত্তি আনয়ন করিয়া উহাকে প্রণাম করি না। এই মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্জীব, ইহাকে সজীব করিবার জন্য পুরোহিত মহাশয় একটী শালগ্রাম শিলামূর্ত্তি আনয়ন করিয়া মন্ত্র দ্বারা তাঁহা হইতে শক্তি বা প্রাণ মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতে প্রেরণ বা সঞ্চারিত করেন। এই শিলামূর্ত্তিতে সর্ব্বসাধারণের চিরব্রহ্মবুদ্ধি বর্ত্তমান থাকে এবং শাস্ত্রেও তাহার নির্দ্দেশ আছে

"শালগ্রামশিলায়াস্তু প্রতিষ্ঠা নো বিদ্যতে।"

ব্রহ্ম বা শালগ্রাম শিলা সজীব, সুতরাং যদি পুরোহিত মহাশয় নিজকে বিষ্ণু ভাবনা করিয়া থাকেন এবং মন্ত্রসকল ছন্দের সহিত উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তবে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি সজীব না হইয়া যায় না। তবেই দেখা যাইতেছে আমরা মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির আভ্যন্তরিক শক্তিরই পূজা করিয়া থাকি। মন্ত্র সকল নিয়মমত উচ্চারিত না হইলে মূর্ত্তিগুলি মৃণ্ময়ীই থাকিয়া যাইবে।

এ, স, না এই তিনটীর সংযোগে এসনা শব্দটী উৎপন্ন হয়। যদি এক ব্যক্তিকে সাধারণ ভাবে এসনা বলা হয়, তবে বুঝিতে হইবে তাহাকে আসিতে নিষেধ করা হইতেছে, কিন্তু গলা কিছু কম্পন করিয়া বলিলে বুঝিতে হইবে আসিবার জন্য তাহাকে আদেশ করা হইতেছে। একই শব্দের স্বরের তারতম্যে উল্টা অর্থ হইয়া গেল। ছন্দ অর্থে প্রাণের স্পন্দন বুঝিতে হইবে।

আচমনের সময়ে পুরোহিত মহাশয়কে তিনবার 'ওঁ বিষ্ণুঃ' বলিতে হয়, ইহার অর্থ পুরোহিত মহাশয় নিজকে ব্যষ্টি, সমষ্টি ও কারণ রূপে বিষ্ণু ভাবনা করিবেন। পরে আচমন মন্ত্র যথা—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় পণ্ডিতগণ বিষ্ণুর বা ভগবানের শ্রেষ্ঠপদ বা স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন বা জ্ঞান করেন।

তৎপরে পুনরায় 'ওঁ বিষ্ণুঃ' তিনবার বলিতে হয় ও তৎসঙ্গে তিনবার জল পান করিতে হয়, তাহার অর্থ পুরোহিত মহাশয় ব্যষ্টি, সমষ্টি ও কারণরূপ জড়তা পরিত্যাগ করিলেন, যেহেতু জল ও জড় এই দুই শব্দই এক বলা যায়।

আসন শুদ্ধির মন্ত্র যথা—

ওঁ পৃথ্বি, ত্বয়া ধৃতাঃ লোকাঃ দেবি ত্বং বিষ্ণুণা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥"

হে পৃথিবি যাবতীয় লোক তোমার দ্বারা ধৃত হইয়াছে তুমি বিষ্ণু কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছ। এ হেন তুমি আমাকে ধারণ কর ও আমার আসনকে পবিত্র কর।

এখানে বিষ্ণু অর্থে সূর্য্য বুঝিতে হইবে, কারণ সূর্য্য ভগবান বিষ্ণুর তেজে তেজঃপ্রাপ্ত হইয়া জল সৃজন করিয়াছিলেন এবং পরে জল হইতে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎ সবিত্রে সুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥" সূর্য্যার্ঘের মন্ত্র।

সূর্য্যের প্রণাম মন্ত্র ঃ—

"নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশ হেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিঞ্চিনারায়ণ শঙ্করাত্মনে॥"

ইহাতেও সূর্য্যকে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ বলা হইয়াছে।

পৃথিবী সূর্য্যের আকর্ষণে নিজ কক্ষে ঘুরিতেছে এবং সূর্য্যের অকর্ষিণী শক্তিবলে কক্ষচ্যুত হয় না। অতএব সূর্য্যই পৃথিবীকে ধরিয়া রাখিয়াছে।

সূর্য্য অর্থে বিষ্ণু ধরিলে, বিষ্ণু পৃথিবীকে ধরিয়া রাখিয়াছে অর্থাৎ পৃথিবীর নীচে বিষ্ণু এবং উপরে পুরোহিতরূপ বিষ্ণু। এক্ষণে পুরোহিত মহাশয় জগৎব্রহ্মাণ্ডে সকল পদার্থই বিষ্ণুময় দেখিবেন। এরূপ সাত্ত্বিক পুরোহিত মহাশয় বিশুদ্ধভাবে উচ্চ মগজ ও নিম্ন মগজ একত্র করিয়া ছন্দের সহিত মন্ত্র উচ্চরণ করিলে, মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি সজীব হইবেই হইবে এবং মূর্ত্তির নিকটে যে বর প্রার্থিত হইবে তাহাই পাওয়া যাইবে।

কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্রের কঠিন পীড়া হইয়াছিল। বৈদ্যেরা হতাশ হইয়া গেলেন। পুত্রের প্রাণের আর কোনও আশা নাই দেখিয়া পিতা অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছিলেন। দৈবযোগে এক সন্ন্যাসী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রোগীকে একবার দেখিতে চাহিলেন। সন্ন্যাসী রোগীর নিকটে নীত হইলে, তিনি বলিলেন "ন চ দৈবাৎ পরং বলম্" অর্থাৎ দৈববল অপেক্ষা অধিক বল নাই এবং একটী বিষ্ণু ঠাকুর (শালগ্রাম) চাহিলেন। গৃহস্থের বাটীতেই বিষ্ণুঠাকুর ছিল। সেই শিলামূর্ত্তি সন্ন্যাসীর নিকটে আনীত হইলে, সন্ন্যাসী আসন করিয়া বসিলেন। পরে—

ইদং সচন্দনতুলসী পত্রং নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা বলিয়া তুলসী পত্রটী যেমন শিলামূর্ত্তির মস্তকে স্থাপন করিলেন শিলামূর্ত্তি চড়াৎ করিয়া ফাটিয়া গেল। তাহাতে সন্ন্যাসী বলিলেন "ইহা ভেঁটা অন্য ঠাকুর আন।" যত ঠাকুর আনীত হইল, সবই সন্ন্যাসীর মন্ত্র সহ্য করিতে না পারিয়া ফাটিয়া গেল। সর্ব্বনাশ! আর কেহ ঠাকুর দিতে চায় না। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঠাকুর ছিল। তিনি নিজে পূজা করিতেন। তিনি ঠাকুর দিতে না চাহিলে, সন্ন্যাসী তাঁহাকে নিজসমীপে ডাকাইয়া বুঝাইয়া দিলেন "যদি তোমার ঠাকুরও ফাটিয়া যায়, তবে সেও ভেঁটা—এরূপ ভেঁটাকে পূজা করিয়া লাভ কি? সুতরাং তোমার ঠাকুর ভেঁটা কিনা ইহা পরীক্ষা করা আবশ্যক।" ব্রাহ্মণ ভাবিলেন "যে ঠাকুরগুলি ফাটিয়া গেল, অন্য পূজকের

পূজার সময়ে ত সেগুলি ফাটে নাই। অতএব সন্ন্যাসী সাধারণ লোক নহেন; ইঁহাতে বিষ্ণু আছে।" ব্রাহ্মণ তাঁহার ঠাকুর আনিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী পূর্ব্ববৎ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সচন্দন তুলসীপত্র ব্রাহ্মণের ঠাকুরের মস্তেক প্রদান করিলেন। এ ঠাকুর ফাটিল না। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন "এই ঠাকুর, অপরগুলি ভেঁটা।" রোগী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিল। দ্বিতীয় তুলসীপত্র ঠাকুরের মস্তকে দিবামাত্র রোগী চলিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং তৃতীয় পত্র দিবামাত্র রোগী ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইল। পিতা যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং সন্ন্যাসীর পাদপদ্ম পূজা করিলেন।

সাধারণতঃ পুরোহিতদিগের লক্ষ্য থাকে দক্ষিণা ও নৈবেদ্যের দিকে। যদি বিষ্ণুর কাপড়খানি ছোট হয়, তবে পুরোহিত মহাশয় নিম্ন মগজে মন্ত্র পড়েন কিন্তু উচ্চ মগজে গজ্ গজ্ করিতে থাকেন। ভগবানকে পরাইবার মত কাপড় মনুষ্যে প্রস্তুত করিতে পারেনা। ভক্তি ও শক্তি অনুযায়ী যে যাহা দিবে ভগবান তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন।

কথিত আছে বিষ্ণুপুরের রাজার কুলপুরোহিত প্রত্যহ পান্তাভাত (বাসীভাত) খাইয়া মদনমোহন ঠাকুরের পূজা করিতেন। কোনও ধূর্ত্ত ও লোভী ব্রাহ্মণ অনেক পাওনা দেখিয়া হিংসাপরবশ হইয়া রাজার কর্ণে পান্তাভাত খাওয়ার কথা তুলিলেন। রাজা এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে পুরোহিতের বাটী গিয়া দেখিলেন বাস্তবিকই পুরোহিত বাড়া ভাত খাইতেছিলেন। তিনি পুরোহিতকে মদনমোহনের পূজা করিতে নিষেধ করিলেন। যথাসময়ে নূতন ব্রাহ্মণ উপবাসে থাকিয়া মদনমোহনের পূজা করিলেন এবং সন্ধ্যার সময়ে ভোগ দিয়া আরত্রিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে মদনমোহন রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন "রাজা, তুইত বেশ সুখে আহার করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিস্, আমার সমস্ত দিন খাওয়া হয় নাই। পুরাতন ব্রাহ্মণের পূজাই সাত্ত্বিক পূজা। সে পেট ঠাণ্ডা রাখিয়া পূজায় বসে, আমার উদ্দেশে

দত্ত উপাদেয় খাদ্যে তাহার লোভ হয় না। নূতন ব্রাহ্মণ ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির ছিল। নৈবেদ্যে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহার লোভ হইয়াছিল। সুতরাং তাহার উচ্ছিষ্ট দ্রব্য আমি খাই কি করিয়া? যদি ভাল চাস্, তবে এই রাত্রিতেই পুরাতন ব্রাহ্মণ দ্বারা আমার পূজা কর্।"

সামান্য পরিমাণে খাইয়া পূজা করিলে তত ক্ষতি হয় না, অধিক পরিমাণে খাইয়া পূজায় বসিলে শরীরে অবসাদ আসে। তাহাতে পূজার ব্যাঘাত ঘটে। নবদ্বার হইতে গ্লানি নির্গত হওয়া অশুভ লক্ষণ। এইজন্যই সংযমের আবশ্যক। অত্যন্ত ক্ষুধার সময়ে খাদ্যদ্রব্য দেখিলেই তাহাতে লোভ হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

কলিকাতা হইতে দিল্লীতে সংবাদ যায় তড়িতের সাহায্যে। এই তড়িৎ শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ধাতুনির্ম্মিত পদার্থের উপর দিয়া এই শক্তি অনায়াসে চলাচল করিতে পারে, কাচ বা ঐরূপ পদার্থের উপর দিয়া চলাচল করিতে পারেনা। অতএব তড়িৎ শক্তির আবির্ভাবের নিমিত্ত ধাতুনির্ম্মিত তারের প্রয়োজন আছে, সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্মের (শক্তির) আবির্ভাবের জন্য মূর্ত্তির আবশ্যকতা আছে। মৃত্তিকা, পাথর ও ধাতুনির্ম্মিত পদার্থের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ শক্তি যেমন চলাচল করিতে পারে, ব্রহ্মও সেইরূপ ঐ প্রকার পদার্থের ভিতর দিয়া অনায়াসে আবির্ভূত হইতে পারেন; এইজন্য ঐগুলির দ্বারা মূর্ত্তি গঠিত হয়, কাচে মূর্ত্তি গঠিত হয়না। বিনা তারে তড়িৎ চলাচলের ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু তাহাতে বড় একটা সুবিধা হয় না। যদি সুবিধা হইত, তবে তার উঠিয়া যাইত, কারণ তারের খরচ বড় কম নহে। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাও আছে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত ক্লেশকর ও প্রায় অসাধ্য।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥" গীতা ১২।৫

নিগুর্ণ ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হয়, যেহেতু ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠায় দেহিগণ নিরতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এইজন্য প্রথম অবস্থায় মূর্ত্তি পূজার আবশ্যকতা আছে। এক্ষণে কোন্ মূর্ত্তিতে ভগবানের উপাসনা হইবে? যাহার যাহা ইচ্ছা সেইভাবে মূর্ত্তি গড়িয়া উপাসনা করা কাজের কথা নহে। যে মূর্ত্তিতে ভগবানকে উপাসনা করা হইবে, তাহার একটা ভিত্তি থাকা আবশ্যক। মূর্ত্তি সর্ব্ববাদী-সম্মত হওয়া প্রয়োজন।

ব্রহ্মের সংজ্ঞা যথা—

"ওঁ সঃ পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যাদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুঃ জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্যধারিণী। ভয়াদস্যাগ্নি-স্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ॥"

এই ব্রহ্ম শুক্রহীন, ইহাঁর অবয়ব নাই, ইহাতে কোন ব্রণ নাই। ইনি অতি পবিত্র, পাপ বা ময়লা বলিয়া কোন জিনিষ ইহাতে নাই। ইনি মহাজ্ঞানী ও পণ্ডিত। ইনি সর্ব্বব্যাপী। ইনিই যাবতীয় পদার্থ সৃজন করিয়াছেন, ইহাকে কেহ সৃজন করে নাই। যাহার যতটুকু দরকার ইনি তাহাকে ঠিক ততটুকুই প্রদান করেন। ইহা হইতে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, মন, প্রাণ ও সর্ব্ব ইন্দ্রিয় উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার প্রতাপে বা শাসনে, অগ্নি তাপ প্রদান করে, সূর্য্য কিরণ দেয়; ইন্দ্র, পবন ও যম ইহারা স্ব স্ব কার্য্য করিয়া থাকে। ইনি সাধারণের প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন। জ্ঞানিগণ মনশ্চক্ষু দ্বারাই ইহার শ্রেষ্ঠ পদের বিষয় অবগত হন।

ইহা হইতেই আমাদিগকে নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার ভগবান করিয়া লইতে হইবে। যেহেতু তিনি স্বয়ম্ভূ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তাঁহা অপেক্ষা বৃহৎ

আর কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব অনন্ত ভগবানকে সান্ত বা দৃশ্য করিতে হইলে এমন একটী পদার্থকে ধরিতে হইবে যাহা অপেক্ষা বৃহৎ আর কিছুই নাই অর্থাৎ যাহা অনন্ত বা যাহার শেষ নাই অর্থাৎ যাহাই শেষ। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম্ এই পাঁচটী লইয়াই সব। ইহাদের বিভিন্ন প্রকারের সংমিশ্রণে যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই পাঁচটীর মধ্যে প্রথম চারিটীর শেষ আছে, কেননা পৃথিবীর শেষে বারি দেখা যায়, আবার জলের শেষে স্থল পাওয়া যায়, সূর্য্যের চারিদিকেই অন্ত আছে, কারণ ইহা গোলাকার। ভূপৃষ্ঠ হইতে পঞ্চাশ মাইল ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত বায়ু আছে, আর নাই, তাহাও ক্রমশঃ পাতলা (rarefied) হইয়া গিয়াছে। যেখানে কিছুই নাই মনে হয় সেখানেও আকাশ বা ব্যোম আছে। এই অনন্ত ব্যোমই ভগবানের রূপ হইবে।

"শ্রীগুরুচরণ শরণ করিয়ে ভবপারে যাই চলিয়ে।
সূর্য্য তাঁহার গতি, ব্যোম তাঁহারি মূরতি ;
আদ্যরহিত সে পদ কভু রহিওনা ভুলিয়ে॥"

এই অনন্তকে পাইবার জন্যই মহাদেব ব্যোম্ ব্যোম্ করেন অর্থাৎ বি+ওম্ বা বিশিষ্ট ওঁ বলেন। এইজন্য অনন্ত (নাগ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী আকাশ প্রতিরূপ) পৃথিবীকে ধরিয়া রাখিয়াছে বলা হয়। সর্পের মাথায় পৃথিবীর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

আকাশের বর্ণ নীল সুতরাং সাকার (কাল্পনিক) ভগবানের গায়ের রং নীল। আকাশ অনন্ত বা বিরাট সুতরাং বিরাটপুরুষ ভগবানের মধ্যস্থলে সূর্য্যমণ্ডল বর্ত্তমান। আকাশে দুইটী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দৃষ্ট হয় যথা সূর্য্য ও চন্দ্র, সুতরাং ভগবানের চক্ষু দুইটী। এইজন্য ভগবানকে 'শশিসূর্য্য নেত্রং' বলা হয়।

মহাশূন্যে দুইটী মাত্র দিক যথা উৰ্দ্ধ ও অধঃ থাকে, সুতরাং ভগবানের দুইটী হাত। নিগুর্ণ ব্রহ্ম হইতে সত্ত্বগুণে বিষ্ণু, রজোগুণে ব্রহ্মা ও তমোগুণে মহেশ্বর এই তিনগুণে স্বগুণ ব্রহ্ম স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং ভগবানের মস্তকে তিনটী পুচ্ছবিশিষ্ট চুড়া। আকাশে বহুসংখ্যক নক্ষত্র দেখা যায় সুতরাং ভগবানের বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি। নির্ম্মল আকাশে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত ছায়াপথ বা যমপথ বা জাঙ্গাল দৃষ্ট হয়, সুতরাং ভগবানের গলদেশে বনমালা। পূর্ব্বে (ওঁ) নাদের কথা বলা হইয়াছে, যখন শব্দ আছে, তখন শব্দের যন্ত্র বাঁশী নিশ্চয়ই আছে। ইহাই ভগবানের মোহনমুরলী।

এই বাঁশী কেবল বৃন্দাবনে বাজে নাই, ইহা সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র বাজিয়াছে, বাজিতেছে ও বাজিতে থাকিবে। শ্রীরাধার ন্যার (রাধা অর্থে যাঁহার আরাধনা শক্তি হৃদয়ে জাগরিত হইয়াছে তিনিই প্রকৃত রাধা এবং তাঁহার প্রকৃত কর্ণ আছে, তিনিই এই বাঁশীর স্বর শুনিয়া আকুল হইয়া যান) যাঁহার প্রকৃত কর্ণ আছে, তিনিই এই বাঁশীর মৃদু ও মনমোহনকারী স্বর শুনিতে পান।

চৈতন্য মহাপ্রভু নাকি এই বাঁশীর গান শুনিতে পাইয়া পাগল হইয়া গিয়াছিলেন। শুধু জ্ঞানে এই বাঁশীর গান শুনিতে পাওয়া যায় না। জ্ঞানের সহিত ভক্তি মিশ্রিত হইলেই

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" রূপ কর্ম্ম করা যায়। নিমাই পণ্ডিতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম সমভাবে বিদ্যমান ছিল।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি আসে। ইহাই উপাস্য মূর্ত্তি। অন্য মূর্ত্তিতে উপাসনা করিতে গেলে তাহার ভিত্তি আবশ্যক। এইজন্যই কৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বা ভগবান বলা হইয়াছে এবং কৃষ্ণ নাম এত মধুর। এই কল্পিত মূর্ত্তির কৃষ্ণ নামকরণ করিবার তাৎপর্য্য আছে। যেহেতু নিরাকার ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, এই মূর্ত্তির এমন নাম দিতে হইবে, যাহার অর্থ সচ্চিদানন্দ।

কৃষ্‌+ণ=কৃষ্ণ। ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ

কৃষ্‌=ভূ অস্তি বা সৎ, ণ=নির্বৃতি বা মোক্ষ।

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দঃ নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।

তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।"

যেহেতু জ্ঞান ভিন্ন আনন্দ বা মোক্ষ আসে না, ণ শব্দে জ্ঞান বা চিৎ ও আনন্দ বুঝায়। অতএব কৃষ্ণ শব্দে সৎ, চিৎ ও আনন্দ বুঝাইল।

মুল মহাভারতে লেখা আছে ভগবান ভক্তশ্রেষ্ঠা দৈবকীর হৃদয় হইতে কৃষ্ণমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। তিনি দৈবকীর জঠর হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন, একথা লেখা নাই। সুতরাং বলা যাইতে পারে "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্‌"।

ভগবানের রূপের কিঞ্চিৎ আভাস :—

ভক্ত— অনামিক হরি তুমি এ নাম তোমার কে রেখেছে।
হরিনামের সুধা পান করিয়ে জগৎ মেতে উঠিয়াছে॥
ভগবান—ভক্ত আমার পিতামাতা ভক্ত আমার আশ্রয়দাতা।
ভক্তহৃদে জন্মে থাকি ভক্ত আমার নাম রেখেছে॥
ভক্ত— ভক্তনামে নামী তুমি একথা মানিলাম আমি।
বিশ্বরূপ বিশ্বস্বামী এরূপ তোমার কে দিয়েছে॥
ভগবান—শোন্‌রে আমার রূপের তত্ত্ব আমি অসৎ আমি সত্য।
যেজনার যেরূপ চিত্ত সেরূপ সে রূপ দেখিছে॥
হরিনামের সুধা পান করিয়ে জগৎ মেতে উঠিয়াছে॥

প্রকৃত পক্ষে ভগবানের রূপ নাই। ভক্ত নিজ সুবিধার (উপাসনার) নিমিত্ত কৃষ্ণরূপ করিয়া লইয়াছেন। ভগবানের চরিত্রের কিঞ্চিৎ আভাস :—

"এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর, তের চরণ পর শির নমে।
সেবক জনাকে সেব সেব পর, প্রেমিক জনাকে প্রেম প্রেম পর,
দুঃখী জনাকে বেদন বেদন, সুখী জনাকে আনন্দ এ।
বঁনাও বঁনাও মে শ্যামল শ্যামল, গিরি গিরি মে উন্নীত উন্নীত,
সলিতা সলিতা চঞ্চল চঞ্চল, সাগর সাগর গম্ভীর এ।
চৌন্দসুরয বরে নিরমল দীপা তের জগমন্দির উজার এ।
এ হরি সুন্দর এ হরি সুন্দর, তের চরণ পর শির নমে॥"

ধন্য প্রভু ধন্য।

(এ) ভবজলধিতারণ তুমি ব্রহ্ম
হৃদিরঞ্জন দুঃখভঞ্জন ভবখণ্ডন
পুরুষোত্তম তুমি অন্তরতম
জীবের জীবন তাপিতচিত বিশ্রাম।
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি ত্রাতা,
তুমি সখা তুমি গুরু তুমি শুভদাতা,
ভাষা আকুল বর্ণিবারে নাহি পায় কথা,
যুগযুগান্তর ধরি কত মুনি কত ঋষি কত যোগী
বাখানি তব নাম,
রচিল কত ছন্দ কত মন্ত্র কত গান,
তবুত নারিল বর্ণিবারে স্বরূপ তোমারি,
তুমি বাক্য মনেরি অগম্য॥
ধন্য প্রভু ধন্য॥"

যে মুহূর্ত্তে মূর্ত্তি বা আধার স্বীকৃত হইল, শক্তি স্বীকার করিতেই হইবে, কারণ শক্তি ভিন্ন কোন আধারই টিকিতে পারে না, গুঁড়া হইয়া যাইবে।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমতী আসিবেই আসিবে। যেহেতু আধার ও শক্তি ওতপ্রেতভাবে থাকে দুইটী মূর্ত্তিও ওতপ্রেতভাবে বা জড়াইয়া থাকিবে। এই যুগলমূর্ত্তিই উপাসনার একমাত্র মূর্ত্তি। ব্রহ্ম গুণাতীত, কিন্তু যুগলমূর্ত্তি গুণত্রয় সমন্বিত। সাধারণতঃ ভক্ত ভগবান বলিলে এই যুগলমূর্ত্তিই বুঝিবেন। কালী বা দুর্গামূর্ত্তির উপরে যুগলমূর্ত্তি দেখা যায়। অব্যক্ত ও অচিন্ত্য শক্তি, শক্তিমান্ ব্রহ্ম, সত্য ও শ্রীমতী একই জিনিষ। কারণ শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন। সগুণ ব্রহ্ম কখনও শক্তিরূপে প্রকাশিত আবার কখনও শক্তিমানরূপে প্রকাশিত হয়েন। ব্রহ্ম ও সত্য বলিলে সাধারণতঃ পুরুষ বুঝায় এবং শক্তি ও শ্রীমতী স্ত্রী বুঝায়। অতএব ভগবান কখনও পুরুষ কখনও স্ত্রী। তাই

"তারা পরমেশ্বরী,
তুমি কখনও পুরুষ হও মা কখনও ষোড়শী নারী।
অজ্ঞানজ্ঞানদায়িনী ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী,
এভব সংসারে মাগো ভরসা তব চরণতরী॥"

এক সাধক চণ্ডীপাঠ করিতে করিতে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমোনমঃ॥"

তাহাতে নিকটস্থ অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলিয়া উঠিলেন

"চণ্ডী ভুল হইল, চণ্ডী অশুদ্ধ হইল"।

কারণ চণ্ডীতে লেখা আছে

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

তস্মৈ শব্দ পুংলিঙ্গ এবং তস্যৈ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। তৎক্ষণাৎ শূন্য বাণী হইল "অরে, মূর্খ পণ্ডিতগণ! তোমরা কি প্রকারে জানিলে আমি স্ত্রী।

ব্যাকরণে তোমরা তি ও তা প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ইচ্ছামত করিয়া লইয়াছ। স্ত্রী বা পুরুষ জানিতে হইলে প্রাণীর অবয়ব দেখা আবশ্যক। আমার অবয়ব নাই, সুতরাং তোমরা কস্মিন্ কালে আমার অবয়ব দেখ নাই এবং দেখিবার সম্ভাবনাও নাই। আমি স্ত্রীও বটি এবং পুরুষও বটি। সুতরাং চণ্ডী অশুদ্ধ হয় নাই, বৃথা গোলমাল করিও না।" ভক্ত সাধনাবলে কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিলেও দেখিতে পারেন কিন্তু শ্রীমূর্ত্তি দেখিবার কোনও উপায় নাই। শ্রীমূর্ত্তিকে চিনিবার কোনও উপায় নাই, কারণ শক্তি (force) সর্ব্বদাই অদৃশ্য (invisible)। বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তের জোবানবন্দীতে কমলাকান্ত প্রসন্ন গোয়ালিনীকে বলিয়াছেন "মেয়ে মানুষকে কে কবে চিনেছে দিদি?" ইহার তাৎপর্য্য মেয়ে মানুষ শ্রীমতীর জাতি।

কথিত আছে আদ্যাশক্তির নাভিমণ্ডল হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উৎপন্ন হইয়াছেন। নিগুর্ণ শক্তি হইতে তিনটী সগুণের আবির্ভাব। প্রকৃত পক্ষে আদ্যাশক্তিও যাহা ব্রহ্ম বা শ্রীমতীও তাহা। ভগবতীর প্রণামমন্ত্র—

"সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাম্ শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

ইহাই অব্যক্ত ও অচিন্ত্য শক্তি ব্রহ্মকেই বুঝায়। এইজন্য ভগবতীকে নারায়ণী বলা হইয়াছে। সুতরাং বৈষ্ণবে ও শাক্ততে দ্বন্দ্ব (কলহ) না হইয়া বরং দ্বন্দ্ব (মিলন) হওয়াই উচিত। বুঝিলে জিনিষ একই।

জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। আত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য নিম্নলিখিত উপমা দ্বারা সরল হইতে পারে :—

দুইটী লোহার বল আছে; দুইটীরই ওজন এক সের করিয়া। দুইটী বলের ক্রিয়া এক প্রকারের, কেননা দুইটীকেই ঢিল মারিলে দুইটীই গড়াইয়া

যায় এবং দুইটাই মানুষের মাথায় নিক্ষেপ করিলে, মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া যায়। একটী বলকে উগা দ্বারা ঘষিয়া কণায় পরিণত করা হইল। মনে করুন তর্কের খাতিরে এক সহস্র কণা হইল। যেহেতু কণাকে ঘষিয়া আর ক্ষুদ্র করা যায় না প্রত্যেক কণার ওজন ১০০০ সের এবং কণাগুলি একত্র করিয়া ওজন করিলে এক সের হইবে। এক্ষণে কণাসমষ্টি ও অপর বল এই দুইটী জিনিষ ঠিক এক নহে, কারণ কণাসমষ্টিতে ঢিল মারিলে উহা গড়াইয়া যায় না, থেপ্ করিয়া উঠে এবং কণাসমষ্টি দ্বারা মানুষের মাথায় প্রহার করিলে, খুলি ভাঙ্গিয় যায় না। বলটীতে এমন একটী শক্তি আছে যাহা কণাসমষ্টিতে নাই। কণাসমষ্টি পুনরায় হাপরে ফেলিয়া মুগুর দিয়া পিটাইলে, কণাসমষ্টি পুনরায় বলের আকার ধারণ করিবে এবং তখন উহা আবার বলের ক্রিয়া করিবে। তাহা হইলে বুঝা যায় কণাসমষ্টিতে অগ্নি (তাপ) ও পিটন নামক শক্তি নাই, বলে আছে। জীবাত্মা কণা, কৃষ্ণ কণাসমষ্টি এবং শ্রীমতী অগ্নি ও পিটন নামক শক্তি। জীব সাধনাবলে আত্মাকে জানিতে পারে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীবের সংখ্যা নির্ণয় করা নিতান্ত অসম্ভব নহে। সুতরাং জীবাত্মার সংখ্যাকে জীবাত্মার পরিমাণ দিয়া গুণন করিলে কৃষ্ণমূর্ত্তি বাহির হইবে; কিন্তু তাহা হইলেও পূর্ণ ভগবানকে জানা হইল না, কারণ শ্রীমতীকে জানা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে। এই শক্তি (শ্রীমতী) সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান। ইহা বিষ্ঠাতে আছে এবং চন্দনে আছে, লোষ্ট্রে আছে এবং কাঞ্চনে আছে।

"ওঁ যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্‌সু যো বিশ্বভুবনমাবিবেশ।
যঃ ওষধিষু যো বনস্পতিষু দেবায় তস্মৈ নমোনমঃ॥"

যিনি অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্ব চরাচরে, যিনি ওষধি এবং যিনি বনস্পতিতে প্রবেশ করিয়া আছেন সেই দেবকে প্রণাম।

ইংরাজীতে এই শক্তিকে আকর্ষিণী শক্তি (gravitation) বলে। প্রত্যেক পদার্থে এমন একটী বিন্দু আছে যাহা এই শক্তির স্থান। এই বিন্দুকে আকর্ষিণী বিন্দু (centre of gravity) বলে। এইজন্যই ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছিলেন "আমি সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্ব পদার্থেই হরিকে দেখিতেছি। অতএব আপনি যে স্ফটিক স্তম্ভের কথা বলিতেছেন, আমি তাহাতেও হরিকে দেখিতেছি।"

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥" গীতা ১৫।১৭

ক্ষর ও অক্ষর ব্যতীত আর একটী শ্রেষ্ঠ পুরুষ আছেন যিনি পরমাত্মা নামে অভিহিত হন এবং যিনি ত্রিভুবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে ধারণ করিয়া আছেন।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সমায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বর্ত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচকাশীতি॥"

দুইটী পক্ষী পরস্পর সখা, উভয়ে সর্ব্বদা মিলিত হইয়া একই বৃক্ষে অবস্থান করে। উহাদের মধ্যে একটী সেই বৃক্ষের সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে এবং অপরটী অনশনে থাকিয়া অধিকতর প্রকাশ পায়।

এখানে প্রথম পক্ষীটী জীবাত্মা এবং দ্বিতীয় পক্ষীটী পরমাত্মা।
"একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধাবিশ্বতোমুখম্।" গীতা ৯।১৫

কেহ কেহ বলেন জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ নহে। জীবাত্মাই ঈশ্বর অর্থাৎ 'সোহং' কারণ ঈশ্বর অবিভক্ত, সুতরাং তাঁহাকে ভাগ করা যায় না। এ ধারণা ভ্রমাত্মক নহে। প্রত্যেক জীবই বলিতে পারে "আমিই ঈশ্বর"।

সুতরাং "যত জীব তত শিব।" এই সমস্ত জীবকে বা জীবরূপী ঈশ্বরকে একত্র করা যাইতে পারে এবং তাহাদের সমষ্টিত কিছু হইবে; ইহাই শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার সহিত শ্রীরাধিকা শক্তি যোগ করিলেই পরমাত্মা হইল। যাহা যোগ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে তাহার অংশত করাই আছে; নূতন করিয়া ভাগত করিতে হইবে না। ফলে একত্ব ও পৃথকত্ব একই দাঁড়াইতেছে। একত্ব অপেক্ষা পৃথকত্ব সুবিধাজনক কারণ একত্বে অহংজ্ঞান আসিতে পারে, কিন্তু পৃথকত্ব ধারণায় জীবের ক্ষুদ্রত্ব বুঝায়। 'তৃণাদপি সুনীচেন' ভাবই ভাল। জীবাত্মার উদ্দেশ্য পরমাত্মার সহিত সাযুজ্য হওয়া অর্থাৎ যে পরমাত্মার সহিত আত্মা একত্র ছিল সেই পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়া।

কেহ কেহ ইন্দ্রাদি দেবতারূপে ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন।

"ওঁ য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তি যোগাৎ।
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি॥
ধীশ্চেতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ।
নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥"

যিনি এক বা অদ্বিতীয় এবং বর্ণ বা রূপ বিবর্জ্জিত, যিনি ইন্দ্রাদি দেবতারূপে বহুবর্ণ বিশিষ্ট চরাচরকে পালন করিয়া থাকেন এবং যিনি বিশ্বের সৃষ্টির পূর্ব্বে, সৃষ্টির সময়ে এবং বিশ্বের ধ্বংসে বিরাজমান, সেই দেব আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

বজ্র হইতে মানুষের ভয় আছে; সুতরাং মানুষ বজ্রধারী ইন্দ্রকে দেবতারূপে মানিতে আরম্ভ করিল। ভীষণ ঝড় মানুষের নানারূপ বিপদ ঘটাইতে পারে, সুতরাং বায়ু বা পবন দেবতা হইল। বন্যা বা জল হইতে মানুষের অশেষ অনিষ্ট হওয়া সম্ভব; সুতরাং বরুণ দেবতা নামে অভিহিত হইল। এইরূপে

তেত্রিশ কোটি দেবতার আবির্ভাব হইল। প্রত্যেক দেবতাই মানুষের অন্তর্নিহিত কামনা।

বায়ু দ্বারা মেঘ সঞ্চারিত হওয়ায় বারিপতন হয়, সুতরাং বারির কারণ বায়ু। অতএব বরুণ অপেক্ষা বায়ু বড়। ভূপৃষ্ঠ সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত হয় এবং বায়ুস্তর উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে আসিয়া উত্তপ্ত হইয়া লঘু হইয়া পড়ে। লঘু বায়ু উপরে উঠিতে থাকে। চতুস্পার্শ্বস্থ গুরু ও শীতল বায়ু তাহার স্থান অধিকার করিতে আসে। সেই স্তরও উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠিতে থাকে এবং পার্শ্বস্থ শীতল বায়ু তাহার স্থান অধিকার করে। এইরূপে বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তি। অতএব সূর্য্যই বায়ুর কারণ; সূর্য্য পবন অপেক্ষা বড়। সূর্য্যও জড় পদার্থ। ভগবৎশক্তির প্রভাবেই সূর্য্য তেজঃ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং সমস্ত দেবতার মূলে ভগবান বা ব্রহ্ম (শক্তি) রহিয়াছেন।

"যেঽপ্যন্য দেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥" গীতা ৯।২৩

শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এবং ভক্তিপূর্ব্বক যাহারা ভগবান ব্যতীত অন্য দেবতার অর্চ্চনা করে, তাহাদের অবিধিপূর্ব্বক ভগবানেরই আরাধনা করা হয়।

দেবতা আরাধনাকারিগণ বিনশ্বর দেবলোক প্রাপ্ত হন এবং ভগবানের ভক্তগণ অবিনশ্বর ভগবানকেই প্রাপ্ত হন।

"দেবান্ দেবযজোযান্তি মদ্ভক্তা যান্তিমামপি।" গীতা

দেবতা আরাধনাকারিগণ কথনও কথনও কর্ম্মজনিত ফল শীঘ্র শীঘ্র পাইয়া থাকেন।

"কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতা।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥" গীতা ৪।১২

আমার পাঁচ পোয়া বাতাসা সাগরে দিবার 'মানসিক' আছে। সাগরে যাওয়া আমার মত লোকের পক্ষে অসম্ভব। আমি বাতাসাগুলি কদলীপত্রে উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া গঙ্গানদীতে নিক্ষেপ করিলাম। আমার উদ্দেশ্য সঙ্গে সঙ্গে সাধিত হইল। বাতাসাগুলি গঙ্গাবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে অবশেষে সাগরে পতিত হইল।

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভগবানের তত্ত্ব বা মহিমা সম্যক্ অবগত না হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণের পূজা করিয়া থাকে কিন্তু জ্ঞানিগণ কদাচ তাহা করেন না; তাঁহারা একেবারে মূলকেই ধরিয়া থাকেন। ইঁহারা ফল কিছু বিলম্বে পান কিন্তু ফল পাইলে তাহা স্থায়ী হইয়া যায়। যাঁহারা কামাদি ষড়্রিপু জয় করিয়া তদ্গতচিত্তে ভগবানের শরণাপন্ন হন, তাঁহারা মনশ্চক্ষু দ্বারা তাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া সত্যে প্রতিষ্ঠিত হন এবং তাঁহাতে চিরদখলকারী হইয়া পরমসুখে বা চির আনন্দে থাকিয়া নিজ আনন্দে ঢলঢল করিতে থাকেন। তখন তাঁহারা বাক্‌সিদ্ধ হন এবং তখন তাঁহাদিগের অভাব বলিয়া কোনও জিনিষ থাকে না। শরীর ধারণের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক হয় ভগবান নিজে তাহা সরবরাহ করেন।

"যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।" গীতা

কেহ কেহ বলেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। ইহা অশ্বডিম্ব বা খপুষ্পের ন্যায়। অশ্বের অস্তিত্ব আছে এবং ডিম্বেরও অস্তিত্ব আছে কিন্তু দুইটী শব্দের যোগে যে শব্দটী উৎপন্ন হইল, সেই অশ্বডিম্বের অস্তিত্ব নাই। প্রকৃতি দ্বারাই সমস্ত কার্য্য হইতেছে।

জলকে পানি বলুন, বারি বলুন, একোয়া (acqua) বলুন আর যাই বলুন একই জিনিষ বটে। একই জিনিষের ভিন্ন ভিন্ন নাম এই পর্য্যন্ত। প্রকৃতিই বলুন আর যাই বলুন এক শক্তি দ্বারা ত কার্য্য হইতেছে। প্রকৃতিই তবে ঐশ্বরিক শক্তি। এবম্ভূত আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ বলেন "এই জগৎ অসত্য অর্থাৎ বেদাদি প্রমাণহীন, অপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মব্যবস্থাহীন ঈশ্বরশূন্য, ইহা কেবল কামমিথুন হইতে জাত। ইহার অন্য কোন কারণ নাই কেবল স্ত্রীপুরুষের কামপ্রবাহসম্ভূত।

"অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥" গীতা ১৬।৮

স্থূলবুদ্ধি দ্বারা ভগবানকে উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়া তথা-কথিত পণ্ডিতগণ ঈশ্বর নাই বলিয়া ফেলিলেন। যেহেতু

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং'

প্রকৃত বা সূক্ষ্মজ্ঞান অসীম এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণ জ্ঞানসমুদ্রে হাবুড়বু খাইয়া ঈশ্বর নাই বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। শৃগাল আঙ্গুর ফল তাহার আয়ত্তে পাইল না বলিয়া বলিয়াছিল "আঙ্গুর ফল টক"। কিন্তু তা বলিয়া আঙ্গুর ফল কি বাস্তবিকই টক ?

প্রমাণ তিন প্রকার প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা গোচরীভূত হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। যাহা পুস্তক পড়িয়া বা গুরুর উপদেশ দ্বারা জানা যায় তাহাকে পরোক্ষ এবং যাহা ধ্যানের দ্বারা অনুমান বা সিদ্ধ করিয়া লইতে হয় তাহাকে অপরোক্ষ প্রমাণ বলে। এই তিনটীর কোনটীই অযৌক্তিক নহে। প্রথম দুইটী ইচ্ছা করিলে সত্যাসত্য নির্ণয় করা সম্ভব কারণ ঐ দুইটী প্রকৃতির অন্তর্গত। দেহ ও মন সম্বন্ধে যাহা বলা

হইয়াছে তাহা সত্যাসত্য প্রমাণ করা সম্ভব কিন্তু ভগবান সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা সত্য নহে ইহা প্রমাণ করা যাইবে কি প্রকারে? প্রমাণ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রমাণ করিতে হইবে কিন্তু যাহা অতীন্দ্রিয়ের বিষয় তাহা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রমাণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাং স্তর্কেন যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

প্রকৃতির বাহিরে যাহা তাহা লইয়া বৃথা তর্ক করিও না। এ বিষয়ে আপ্তোপদেষ্টৃগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা মানিয়া লও। আপ্তোপদেষ্টা যথা মহামুনি ব্যাস ইত্যাদি। যদি কেহ বলেন "আমারত স্বতন্ত্র বুদ্ধি আছে, ব্যাস যাহা বলিয়াছেন তাহাই অন্ধের ন্যায় মানিয়া লইব কেন?" ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে "আপনার জ্ঞান যথেষ্ট আছে স্বীকার করি কিন্তু যদি আপনি মহামুনি ব্যাসের গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া বুঝেন, আপনি জ্ঞানে ব্যাসের সমকক্ষ বা তাঁহা অপেক্ষা উচ্চ তবে আপনাকে আপ্তোপদেষ্টৃগণের কথা মানিয়া লইতে অনুরোধ করি না; কিন্তু ইহা কি সত্য নহে যে মহামুনি ব্যাসের জ্ঞানের তুলনায় আপনার জ্ঞান মহাসমুদ্রের সহিত গোষ্পদের তুলনা করিলে যাহা হয় তাহা? নীচকে উচ্চের নিকটে মাথা নোয়াইতেই হইবে। কেবল মহামুনি ব্যাস নহেন সকল মুনি ও ঋষিরা একবাক্যে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। নাস্তিকগণ একটীও প্রমাণ পাইলেন না, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা কেন বহু প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি দ্বারা যে প্রমাণ দেওয়া যায় তাহা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। (১) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অতীন্দ্রিয় বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রমাণীকৃত হয় না এবং ভগবান যে অতীন্দ্রিয় বিষয় ইহাতে

বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। (২) মনে করুন এখান হইতে দুই ক্রোশ দূরে এক অগম্য পর্ব্বতের শিখরদেশে ধূম দেখা গেল, অগ্নি দৃষ্ট হয় নাই। আমি বলিলাম "ঐ পর্ব্বতে অগ্নি আছে।" প্রত্যক্ষবাদী বলিলেন "অগ্নি নাই।" এখন কাহার উক্তি সত্য ইহা জানিতে হইলে উভয়কে পর্ব্বতশিখরে যাইতে হয়, কিন্তু পর্ব্বতটী অগম্য বলিয়া তথায় গিয়া সত্যাসত্য নির্ণয় করা অসম্ভব। ধূম উত্থিত হইতেছে এমন বিশ, পঞ্চাশ, শত, সহস্র স্থানে গিয়া উভয়ে দেখিলাম এমত স্থান পাওয়া গেল না যেখানে ধূম ছিল কিন্তু অগ্নি ছিল না। এক্ষণে পূর্ব্বকথিত পর্ব্বতের শিখরদেশে অগ্নি আছে ইহা প্রত্যক্ষবাদীকে মানিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ আমি প্রত্যক্ষবাদীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়, আপনার পিতা আছেন?" তিনি বলিলেন "হাঁ"। আমি বলিলাম "প্রমাণ?" তিনি বলিলেন "আমি আমার পিতাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি।" আমি তাঁহাকে পুনরায় বলিলাম "আপনার পিতার পিতা ছিলেন?" তিনি কি বলিবেন? যদি তিনি বলেন "না", তাহা হইলে তাঁহার সহিত আর কোনও কথা চলে না, ভগবানের অস্তিত্ব মানিতে অনুরোধ করাত দূরের কথা। যদি তিনি বলেন "হাঁ", আমি তাঁহাকে বলিলাম "প্রমাণ?" এক্ষণে তাঁহাকে বলিতেই হইবে "আমার পিতা তাঁহার পিতাকে চক্ষে দেখিয়াছেন এবং আমার পিতা আমাকে বলিয়াছেন তাঁহার পিতা ছিলেন, অতএব আমি মানিয়া লইয়াছি আমার পিতার পিতা ছিলেন।" ইহারই নাম আপ্তোপদেশ অর্থাৎ তাঁহার পিতার উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল বলিয়া তাঁহার পিতা যে বলিয়াছিলেন তাঁহার পিতা ছিলেন ইহা তিনি মানিয়া লইয়াছেন।

এক ছাত্র গুরুমহাশয়ের নিকট তাহার পরিবর্ত্তনপত্র (transfer certificate) চাহিলে গুরুমহাশয় উহার আবেদন প্রত্যাখ্যান করিলেন। ছাত্র

পরিদর্শক মহাশয়ের নিকটে নালিশ করিলে, পরিদর্শক মহাশয় তথায় উপস্থিত হইয়া গুরুমহাশয়কে পরিবর্ত্তনপত্র না দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরু মহাশয় বলিলেন "ছাত্রের পরিবর্ত্তনপত্র লইবার কারণ যথেষ্ট মনে করি না।" পরিদর্শক মহাশয় ছাত্রকে বলিলেন "কিহে বালক, তোমার পরিবর্ত্তনপত্র লইবার কারণ কি?" ছাত্র বলিল "গুরুমহাশয় কিছু জানেন না এবং করেন না; তাহার প্রমাণ আপনি আমাকে চার কড়ায় ক'গণ্ডা হয় জিজ্ঞাসা করুন, আমি বলিতে পারিব না।" 'মানিব না' বলিলে আর উপায় নাই।

(৩) প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশ্বাস করেন প্রত্যেক জিনিষের একজন নির্ম্মাণকারী আছেন। কোনও জিনিষই আপনা হইতে কোন স্থানে আসে না। অতএব এই প্রকাণ্ড বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি আপনা হইতে সৃষ্ট হয় নাই। ইহার নির্ম্মাণকারী বা সৃষ্টিকর্ত্তা একজন আছেন ইহাই যুক্তি।

সেই সৃষ্টিকর্ত্তা প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন বলিয়া কেহ তাঁহাকে দেখে নাই বা দেখিতে পাইবে না। পৃথিবী গোল ও সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে ইহা প্রত্যক্ষ না করিলেও সকলেই ইহা বিশ্বাস করেন বা মানিয়া লন। জার্ম্মাণিতে যে মহাসমর হইয়া গেল ইহা আমরা দেখি নাই; কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি। ভগবদ্ধারণা সম্বন্ধেও ঐরূপ। তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥"

যাঁহার কৃপা হইলে বোবার মুখে খই ফুটে এবং খঞ্জ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় আমি পরমানন্দ মাধব সেই কৃষ্ণকে বন্দনা করি।

"অপাণিপাদঃ যবনো গ্রহীতা।
পশ্যত্য চক্ষুঃ শৃণোত্যকর্ণঃ॥"

তাঁহার হাত নাই কিন্তু তিনি গ্রহণ করেন। তাঁহার পা না থাকিলেও তিনি সর্ব্বত্রই গমন করিতে পারেন। তাঁহার চক্ষু নাই তথাপি তিনি দর্শন করেন এবং কর্ণহীন হইয়াও তিনি শ্রবণ করেন।

"সর্ব্বতঃ পাণি পাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" গীতা ১৩।১৩

সেই ব্রহ্ম সর্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র চক্ষু, মস্তক ও মুখবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া আছেন।

ভগবানের পক্ষে সকলই সম্ভব; কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি কথনও গ্রীষ্মের পরে একেবারে শীত আনয়ন করেন নাই; কারণ তিনি যে নিয়ম প্রচার করিয়াছেন তাহা যদি নিজেই ভঙ্গ করেন, তবে অপরে তাঁহার নিয়ম পালন করিবে না।

"The framer of the law must not be its breaker."

যিনি আইন প্রস্তুত করেন, অগ্রে তাঁহাকেই সেই আইন মানিতে হইবে। আমরা মানুষ, যতই আকাশে উড়ি না কেন, জ্ঞান ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাঁহার সম্বন্ধে ধারণা আমাদের ধারণাতেই আসে না। আত্মদর্শী, ত্রিকালজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী ঋষিরা বা আপ্তোপদেষ্টারা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা মানিয়া লইতে দোষ ত নাই, অধিকন্তু গুণ আছে; কারণ অকার্য্য বা বিকর্ম্মই অশান্তির কারণ এবং যাঁহারা ভগবান মানেন না, তাঁহারাই অকার্য্য করিয়া থাকেন। অতএব নাস্তিকতাই অশান্তির কারণ। যাহারা অশিক্ষিত তাহারা অনেক সময়ে অকার্য্য করে এবং মিথ্যাও বলে, কিন্তু ঐরূপ কর্ম্ম করিবার সময়ে তাহারা একটু ইতস্ততঃ করে; আর উচ্চশ্রেণীর নিরীশ্বরবাদীরা নিজ স্ত্রী পুত্র পরিজন

প্রতিপালনরূপ স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত অপকর্ম্ম করিতে এবং সত্যের অপলাপ করিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেন না। জগতে বর্ত্তমান অশান্তির ইহাই একমাত্র কারণ। জগতে পূরা আস্তিক নাই আবার পূরা নাস্তিকও নাই। অনেকে তর্কের সময়ে ভগবানে বিশ্বাস দেখান না কিন্তু পুত্রের কঠিন পীড়ার সময়ে ভগবানকে অন্তরে ডাকেন। যাঁহারা অন্তরের সহিত ভগবানকে বিশ্বাস করেন অর্থাৎ মনে করেন অনন্ত মুখ, চোখ ও কাণ বিশিষ্ট ভগবান সর্ব্বত্র রহিয়াছেন তাঁহারা কখনও অকার্য্য করিতে পারেন না। নাস্তিকতা অপেক্ষা আস্তিকতার ভাণও ভাল। ঐরূপ ভাণ করিতে করিতে প্রকৃত জ্ঞানের ইচ্ছার উন্মেষ হইলেও হইতে পারে। Burke বলিয়াছেন—

"Superstition is the religion of feeble minds."

কুসংস্কার দুর্ব্বলচিত্তদিগের ধর্ম্ম।

ঈশ্বরে অবিশ্বাস সাধারণের পক্ষে বিচিত্র নহে। অনেক সময়ে জ্ঞানিগণও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়েন।

এক সন্ন্যাসী পর্ব্বতগহ্বরে ছয় দিবস তপজপ করিতেন এবং রবিবারে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে গমন করতঃ সাত দিবসের উপযোগী ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য লইয়া আসিতেন। ধার্ম্মিকদিগের দুর্গতি এবং অধার্ম্মিকগণের অভ্যুত্থান অবলোকন করিয়া তিনি ঈশ্বরের বিচারে এবং পরে তাঁহার অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া পড়িলেন। ঈশ্বর নাই ইহা স্থিরীকৃত হইলে তিনি পর্ব্বতগহ্বর ত্যাগ করতঃ যথেচ্ছগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে সুন্দর পরিচ্ছদধারী এক নবীন যুবকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং উভয়ে পরস্পর অভিবাদন করিলেন। অভিবাদনের নিয়ম যথা :—

"ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ম্।
বৈশ্যং ক্ষেমং তথা পৃচ্ছেৎ শূদ্রমারোগ্যমেব চ।"

পরিব্রাজক ও সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য এক হওয়ায় উভয়ে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং একত্র পথপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ধ্যাকালে উভয়ে এক ধনীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ধনী অত্যন্ত ভোগবিলাসী হইলেও তাঁহার গৃহে অতিথিসেবার সুবন্দোবস্ত ছিল, এমন কি অতিথিদিগকে সুবর্ণ-নির্ম্মিত পাত্রে ভোজ্য দিবার ব্যবস্থা ছিল। রাত্রি একপ্রহরের সময়ে প্রধান কর্ম্মচারী ঐ প্রকার পাত্রে খাদ্য প্রদান করিয়া অতিথিদ্বয়কে বলিলেন "আপনারা ইচ্ছামত ভোজন করিয়া পার্শ্বস্থিত শয্যায় শয়ন করিবেন, অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে, কল্য প্রাতে দাসী উচ্ছিষ্ট পাত্র লইয়া যাইবে।" প্রভাতে শয্যাগৃহ ত্যাগ করিবার সময়ে নবীন যুবক উচ্ছিষ্ট দুগ্ধের পাত্রটী নিজ পকেটে রাখিলেন। সন্ন্যাসী তাহা দেখিতে পাইয়া যুবকের উপর বিরক্ত হইলেন।

পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রবল ঝড় উপস্থিত হওয়ায় উভয়ে প্রাণভয়ে নিকটবর্ত্তী গ্রামের প্রথম গৃহে গমন করতঃ গৃহস্বামীকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। গৃহস্থ আহ্বান শুনিতে পাইয়াও দরজা খুলিয়া দেন নাই। অবশেষে শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইলে নবীন যুবক সজোরে দরজায় পদাঘাত করিলে অর্গল ছুটিয়া গেল এবং উভয়ে গৃহাভ্যন্তরে উপস্থিত হইলেন। গৃহস্থ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন "মহাশয়দ্বয় বেশ লোক! জোর করিয়া খিল ভাঙ্গিয়া অনধিকার প্রবেশ মহাশয়দ্বয়ের উচিত হইয়াছে কি?" নবীন যুবক উত্তর করিলেন "আমরা বেশ লোক না মহাশয় বেশ লোক; ঝড়ে ও শিলা-বৃষ্টিতে আমাদিগের প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইতেছিল আর মহাশয় দেখিতে পাইয়াও এবং শুনিতে পাইয়াও দরজা খুলিয়া দিতেছিলেন না।" যাহাহউক উপায়ান্তর না দেখিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে কৃপণ গৃহস্থ অতিথিদ্বয়ের আহারের নিমিত্ত চোঁয়ামুড়ি ও শয়নের জন্য ছিন্ন মাদুরের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রত্যূষে গৃহ ত্যাগ করিবার সময়ে নবীন যুবক পকেট হইতে সুবর্ণ বাটীটী বাহির করিয়া ছিন্ন মাদুরের উপর রাখিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী তাহাও

দেখিলেন এবং যুবকের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া অধিকতর বিস্মিত হইলেন কারণ যুবকের চুরির অভিপ্রায় থাকিলে কৃপণের গৃহে সে বাটীটী রাখিয়া যাইবে কেন? যাহাহউক কিছু না বলিয়া সন্ন্যাসী যুবকের সহিত পুনরায় পথপর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নবীন যুবক সন্ন্যাসীকে বলিলেন "কল্য রাত্রিতে আহার ও শয়নের বড় কষ্ট হইয়াছে; সুতরাং অদ্য দেখিয়া শুনিয়া কোন ধনীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে।" অবশেষে তাঁহারা এক সদাচারী ও অতিথিপরায়ণ সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের গৃহে পাচক থাকা সত্ত্বেও অতিথিদ্বয়কে গৃহিণীদ্বারা প্রস্তুত উত্তম ভোজ্য ও পেয় প্রদত্ত হইল। আহারান্তে উভয়কে দুইটী পরিপাটী শয্যা প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কল্য প্রাতে কোন্ দিকে অগ্রসর হইবেন?" তাঁহারা দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইবেন জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন "দক্ষিণদিকে দুই ক্রোশ দূরে একটী গভীর খাল আছে। তাহাতে একটীমাত্র বাঁশের সাঁকো আছে। আপনারা তাহা অবগত নহেন। আমি আমার ভৃত্যকে আপনাদিগের সঙ্গে দিব, সে আপনাদিগকে সাঁকোটী পার করিয়া দিলে আপনাদিগের কোনও অসুবিধা হইবে না; সুতরাং আপনারা প্রাতেই চলিয়া যাইবেন না।" প্রত্যূষে ব্রাহ্মণ শয্যা ত্যাগ করিয়া উভয়ের মুখপ্রক্ষালনের নিমিত্ত জলপূর্ণ দুইটী ভৃঙ্গার আনয়ন করিয়া বলিলেন "আপনারা ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি ভৃত্যকে ডাকিয়া আনি।" ব্রাহ্মণ ভৃত্যকে ডাকিতে গেলে ব্রাহ্মণের দাসী ব্রাহ্মণের একমাত্র ছয়মাসের শিশুপুত্রকে ঘুম পাড়াইয়া বৈঠকখানাস্থিত দোলার উপর স্থাপন করিয়া দোলাটী কিঞ্চিৎ নড়াইয়া দিয়া গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেল। ইত্যবসরে নবীন যুবক স্বস্থান হইতে উঠিয়া গিয়া দোলাস্থিত শিশুর গলা এমন জোরে টিপিলেন যে শিশু তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। পরে তিনি নিরীহ ভদ্রলোকের ন্যায় স্বস্থানে বসিয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসী তাহাও দেখিলেন এবং বুঝিলেন যুবক কেবল তস্কর নহেন, নরঘাতকও বটেন এবং অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেও নবীন যুবককে তখন কিছু বলিলেন না, কারণ ঘটনা তখনি প্রকাশ পাইলে তাঁহারও বিপদের সম্ভাবনা ছিল। অব্যবহিত পরে ব্রাহ্মণ ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন এবং তাহাকে বলিলেন "বামাচরণ, ইঁহাদিগকে দক্ষিণদিকের সাঁকোটী পার করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিবে।" যথাসময়ে তিনজনে সাঁকোর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে ছিল পথপ্রদর্শক ভৃত্য, মধ্যে ছিলেন নবীন যুবক এবং পশ্চাতে সন্ন্যাসী। সাঁকোর মধ্যস্থলে আসিবামাত্র নবীন যুবক ভৃত্যকে এমন জোরে ধাক্কা মারিলেন যে সে মাথা নীচু করিয়া গভীর জলে পড়িয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ আবর্ত্তের সহিত মিশিয়া গেল। তাহাকে আর উঠিতে দেখা গেল না। সন্ন্যাসীর ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং উভয়ে নির্ব্বিঘ্নে সাঁকোটী অতিক্রম করিলে সন্ন্যাসী ক্রোধে জটা ফুলাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তখন তিনি নবীন যুবককে তিরস্কার করিতে করিতে বলিলেন "অরে পামর, তস্কর ও নরঘাতক, তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ'। তোর মুখ দেখিলেও পাপ হয়।" অবিলম্বে সন্ন্যাসী সভয়ে ও সবিস্ময়ে দেখিলেন তাঁহার সঙ্গী আর কেহই নহেন, স্বয়ং ইন্দ্র, কারণ তখন তাঁহার সহস্র লোচন ছিল। সন্ন্যাসী তখনই দেবরাজের পদতলে পড়িয়া ক্ষমাভিক্ষা করিলেন।

ইন্দ্র প্রসন্নবদনে ও সস্নেহে বলিলেন "বৎস, তোমার মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া ভগবান তোমার সংশয় অপনোদনের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন; তাই আমি তোমার সঙ্গ লইয়াছি।" সন্ন্যাসী বলিলেন "প্রভো, সংশয় অপনোদনের চিহ্ন ত দেখিলাম না, বরং আপনাকে সবই অকার্য্য বা গর্হিত কার্য্য করিতে দেখিয়া সংশয় আরও বৃদ্ধি পাইল।" তদুত্তরে ইন্দ্র বলিলেন "বৎস, তুমি স্থূল দৃষ্টিতে দেখিয়াছ

বলিয়া কর্ম্মগুলিকে গর্হিত কর্ম্ম বোধ করিয়াছ কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারিতে কার্য্যগুলি সাধারণের মঙ্গলের জন্যই করা হইয়াছে; প্রথমে যাহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম সেই ধনী অত্যন্ত ভোগবিলাসী। সে ত্রিতল হইতে নামে না। তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য দেশদেশান্তরে নিজ নাম জাহির করা; সেইজন্য সে সোণার থালা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছে। অজ্ঞাতকুলশীল অতিথিদিগকে পত্রে খাদ্য দিবার ব্যবস্থা আছে; তদভাবে কাংসময় পাত্র দেওয়া যাইতে পারে। সুবর্ণ পাত্রে খাদ্য দিবার উদ্দেশ্য আড়ম্বর ব্যতীত আর কিছুই নহে। শিক্ষা দিবার জন্য বাটীটী লইলাম। অনুসন্ধান করিয়াও যখন পাত্রটী পাওয়া যাইবে না, গৃহী আর সুবর্ণ পাত্র বাহির করিবে না। দ্বিতীয় ব্যক্তি অত্যন্ত কৃপণ, সে কাহাকে কখনও দরজা খুলিয়া দেয় না। আমি বাটীটী রাখিয়া আসিলাম; ইহাতে তাহার লোভ জন্মিবে। ভবিষ্যতে আর কিছু পাইবার আশায় কেহ ডাকিবামাত্র তাহাকে দ্বার খুলিয়া দিবে; সুতরাং অতিথিদিগকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইবে না। তৃতীয় ব্যক্তি অত্যন্ত ভগবৎপরায়ণ। ইনি দৈনন্দিন সাংসারিক কার্য্য করিয়া থাকেন কিন্তু অন্তরে সর্ব্বদাই ভগবানকে স্মরণ করিয়া থাকেন। ভগবান ইঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহার নিমিত্ত বৈকুণ্ঠে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে পুত্রটী হওয়ায় রাজা ভরতের ন্যায় এই ব্রাহ্মণের চিন্তা পুত্রের দিকে কিয়ৎ পরিমাণে ধাবিত হইতেছিল। পাছে মায়ার কুহকে পড়িয়া ব্রাহ্মণ ভগবানকে ভুলিয়া যান, এই আশঙ্কায় মায়ার দ্রব্য পুত্রকে একেবারে সরাইয়া দিলাম; সুতরাং ব্রাহ্মণকে বৈকুণ্ঠে স্থান হারাইতে হইবে না।" এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "ভাল বুঝিলাম না প্রভো, ভগবান ত ব্রাহ্মণকে পুত্র না দিয়াও বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহাকে অযথা পুত্রশোক দিবার কারণ কি?" ইন্দ্র পুনরায় বলিতে লাগিলেন "পুত্র না জন্মিলে ব্রাহ্মণকে

দেহান্তে পুন্নাম নরক দর্শন করিয়া তবে বৈকুণ্ঠে যাইতে হইত। যে মুহূর্ত্তে পুত্র জন্মিয়াছে, ব্রাহ্মণ সেই মুহূর্ত্তেই ঐ নরক দর্শন হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ যেরূপ জ্ঞানী, তাহাতে তাঁহার এ শোক অধিক দিন থাকিবে না, সুতরাং বৈকুণ্ঠে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান নষ্ট হইল না।” সন্ন্যাসী পুনরায় বলিলেন, “বুঝিলাম, কিন্তু চাকরটী কি করিল যে তাহাকে জলে ফেলিয়া দিয়া প্রাণে মারিলেন।” ইন্দ্র বলিয়া গেলেন “অদ্য প্রাতে ব্রাহ্মণ ভৃত্যকে ডাকিয়া আনিয়া রুমালে পাঁচশত টাকার তোড়া বাঁধিয়া আলমারীর উপর রাখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন অদ্য সন্ধ্যার সময়ে ঐ টাকায় এক সহস্র দরিদ্র ভোজন করাইবেন। ভৃত্য ইহা লক্ষ্য করিয়া এখান হইতে ফিরিয়া গিয়া টাকাটী আত্মসাৎ করিয়া দেশে পলায়ন করিবার মনস্থ করিয়াছিল। যদি সে ফিরিতে পাইত, তবে এক সহস্র দরিদ্র আহারে বঞ্চিত হইত। বহু লোকের মঙ্গলের জন্য অনিষ্টকারী এক ব্যক্তিকে সরাইয়া দিলাম। মানুষ অজ্ঞানবশতঃ স্থূল দৃষ্টিতে ভগবানের বিচারে দোষ দেখে। জ্ঞানিগণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখেন; সুতরাং তাঁহারা দেখিতে পান ভগবানের বিচার ঠিকই। তুমি দেখিয়াছ, অধার্ম্মিক ব্যক্তিরা বেশ সুখে আছে, কিন্তু তাহা কখনও হইতে পারে না।

মনে কর একজন লোক তপজপ দ্বারা তাহার মনিবকে ভুলাইল। ধনী তাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিল। এই লোকটী নিজ স্ত্রীর নামে খরচ লিখিয়া আঠার হাজার টাকা ভাঙ্গিল। পুণ্য দ্বারা পাপের ক্ষয় হয় এইরূপ মিথ্যা ধারণায় সে কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি সৎকার্য্য এবং বহুবিধ অসৎ কার্য্য ধূমধামের সহিত করিতে লাগিল। বিশ্বাসঘাতকতার সহিত টাকা ভাঙ্গা যে গুরুতর পাপ ইহা সে জানে।

ভোজরাজ বত্রিশ সিংহাসনে বসিতে যাইবেন এমন সময়ে ষষ্ঠ পুত্তলী বলিয়া উঠিল “হাঁ হাঁ, মহারাজ, এ সিংহাসনে বসিবেন না। এই সিংহাসনে

মহাত্মা বিক্রমাদিত্য বসিতেন। আপনি অগ্রে তাঁহার মত হউন, তবে এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হইবেন।" তাহা শুনিয়া ভোজরাজ বলিলেন "সে কি রকম?" পুত্তলী বলিতে লাগিল—

রাজা বিক্রমাদিত্য এক প্রসিদ্ধ চিত্রকর দ্বারা মহিষী ভানুমতীর উৎকৃষ্ট তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া সকলকে দেখাইলেন। চিত্রকর তখনও তুলি হস্তে তথায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই চিত্রকর ও চিত্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন, কেবল বররুচি বলিয়াছিলেন "চিত্র সঠিক হয় নাই।" এই কথা শুনিয়া চিত্রকর রাগান্বিত হইয়া হস্তস্থিত তুলি সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে তুলির কালি ছিটকাইয়া ভানুমতির চিত্রের উরুদেশে লাগিয়া গেল। তখন বররুচি বলিলেন "এইবার ঠিক হইয়াছে।" রাজা বলিলেন "তখন ঠিক হয় নাই, এখন ঠিক হইল, ইহার তাৎপর্য্য?" বররুচি বলিলেন "ভানুমতীর উরুদেশে একটী তিল আছে, প্রথমে চিত্রকর তাহা অঙ্কিত করেন নাই, এক্ষণে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া তুলিটী মাটীতে সজোরে ফেলায় তুলির কালি চিত্রের উরুদেশে লাগায়, তিলটী প্রকাশিত হইয়াছে।" এরূপ অপ্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বলিলেন "কী, ভানুমতীর উরুদেশে তিলের সংবাদ আমি অবগত নহি, আর তুমি জানিলে কি প্রকারে? তোমার স্পর্দ্ধা কম নহে। জহ্লাদ! ইহাকে মশানে লইয়া গিয়া ইহার মুণ্ডপাত করিয়া আমাকে রক্ত দেখা।" জহ্লাদ কি ভাবিয়া বররুচিকে ছাড়িয়া দিয়া শৃগাল কুকুরের রক্ত আনিয়া রাজাকে দেখাইল। রাজা সন্তুষ্ট হইলেন। বররুচি ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণী হইয়া মালিনী মাসীর গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে রাজকুমার বিক্রমসেন মৃগয়ার নিমিত্ত সৈন্য-সামন্ত সমভি-ব্যাহারে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজকুমার এক সুন্দরী হরিণীর পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। কিন্তু হরিণী এত দ্রুতবেগে ছুটিতেছিল যে রাজকুমার সৈন্য

সামন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গভীর অরণ্যে গিয়া পড়িলেন এবং অন্ধকারে পথ হারাইয়া ফেলিলেন। অগত্যা বন্যজন্তু হইতে রক্ষা পাইবার মানসে রাজপুত্র ঘোটকটীকে বটবৃক্ষের মূলদেশে বন্ধন করিয়া নিজে বৃক্ষের উপরে আশ্রয় লইলেন। অল্পক্ষণ পরে এক ভল্লুক সেই বৃক্ষে উঠিতেছিল দেখিয়া রাজকুমার ভীত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য শর ধনুতে যোজনা করিলেন। তখন ভল্লুক রাজপুত্রকে মনুষ্যভাষায় বলিল "রাজকুমার আমি সাধারণ ভল্লুক নহি; তুমি যে ভয়ে গাছে উঠিয়াছ, আমিও সেই ভয়ে গাছে উঠিতেছি; আমাকে মারিও না। যখন উভয়েরই এক বিপদ এস আমরা উভয়ে মিতা হই।" সেই বৃক্ষের উপরে উভয়ে ভগবানকে সাক্ষ্য করিয়া মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। স্থির হইল প্রথম দুই প্রহর রাজপুত্র ঘুমাইবে এবং ভল্লুক জাগিয়া থাকিবে আর শেষ দুই প্রহর ভল্লুক ঘুমাইবে এবং রাজপুত্র জাগিয়া থাকিবে। রাত্রি দেড় প্রহরের সময় ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু বৃক্ষতলে আসিয়া ভল্লুককে বলিল "রাজপুত্রকে ফেলিয়া দেনা, আমরা উহাকে খাই।" ভল্লুক বলিল "বাপ্‌রে আমি মিতেকে ফেলিয়া দিতে পারিব না, বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপ।" রাত্রি তিন প্রহর অতীত হইলে, জন্তুগণ রাজপুত্রকে বলিল "ভালুকটাকে ফেলিয়া দাও না, আমরা উহাকে খাই।" রাজপুত্র বলিলেন "মিতে যে, কি করিয়া ফেলিয়া দিব" তাহাতে জন্তুগণ বলিল "মানুষে আর ভালুকে আবার মিত্রতা! সকাল হইলেই ভালুক তোমাকে মারিয়া ফেলিবে।" রাজপুত্র কি ভাবিয়া ভালুককে ঠেলিয়া ফেলিতে গেলেন। ভালুক নখের সাহায্যে বৃক্ষে আটকাইয়া গেল, নীচে পড়িয়া গেল না। ভালুকের বুঝিতে বাকি রহিল না। সে আর ঘুমায় নাই কারণ ভালুক জানিত যাহার মাথায় কাল চুল, তাহাকে বিশ্বাস নাই।

প্রত্যুষে উভয়ে গাছ হইতে নামিলেন। রাজপুত্র বিদায় লইবার সময়ে ভালুক বলিল "ভাই মিতে, কিছু স্মরণ চিহ্ন লইয়া যাও।" এই বলিয়া ভালুক

রাজপুত্রের গণ্ডদেশে চারিটী চড় মারিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে এই কয়টী কথা বলিল "স সে মি রা।"

রাজপুত্র 'সসেমিরা'র অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কেবলই বলিতে লাগিলেন "সসেমিরা" এবং অনবরত ঐ কথা বলেন ও আত্মবিস্মৃত হইয়া পাগল হইয়া গেলেন। রাজপুত্র অতিকষ্টে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন কিন্তু পাগলের ন্যায় কেবল "সসেমিরা" বলিতে থাকেন। রাজা অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু রাজপুত্র কিছুতেই প্রকৃতস্থ হইলেন না। অবশেষে রাজা ঘোষণা করিলেন যে রাজপুত্রকে প্রকৃতস্থ করিতে পারিবে, সে এক লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক পাইবে। ব্রাহ্মণীবেশে বররুচি 'ডঙ্কা' ধরিলেন অর্থাৎ তিনি জানাইলেন তিনি রাজপুত্রকে প্রকৃতিস্থ করিবেন কিন্তু তিনি স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহার বাড়ী হইতে রাজবাড়ী পর্য্যন্ত কাপড়ের 'কাণ্ডার' করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতে হইবে।

রাজসভার প্রান্তে কাপড়ের ভিতর হইতে ব্রাহ্মণী বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"সদ্ভাবপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা ;
অঙ্কমারুহ্য সুপ্তানাং হন্তুঃ কিন্নু পৌরুষম্॥"

"সদ্ভাবেতে প্রতিপন্ন ভল্লুকের সঙ্গে।
মিত্রতা হইল বনে কৌতুকাদি রঙ্গে॥
পুনর্ব্বার বঞ্চনা করিলে কি লাগিয়া।
নিদ্রিত হইল মিত্র ফেলিলে ঠেলিয়া॥
নখ লাগে ডালে ঠেলা দিতে অঙ্গ তার।
কি কৃতার্থ হইলে তাহে নৃপের কুমার॥
বুঝহ ভূপতিপুত্র বররুচি ভাষ।
শুনে 'সসেমিরা' বুলি কৈল অট্টহাস॥"

এই শ্লোক শুনিয়া রাজপুত্র 'স' অক্ষরটী ছাড়িয়া দিয়া 'সেমিরা' বুলি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণী আবার বলিলেন—

"সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে।
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈঃ মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে॥"

"সেতুবন্ধ সঙ্গমাদি যদি কেহ যায়।
ব্রহ্মহত্যা জনের পাপ হয় ক্ষয় তায়॥
বড়ই কুকর্ম্ম কৈলে নৃপতি কুমার।
এই ঘোর পাপে তব নাহিক নিস্তার॥
বুঝিলেন রাজপুত্র কুলবধু কথা।
অধোমুখে লজ্জিত হইয়া থাকে তথা॥
ত্যজি—'সসে' 'মিরা' বাক্য কহেন নন্দন।
পুনঃ এক শ্লোক পাঠ কৈল আরম্ভন॥"

"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।
তে নরাঃ নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ॥"

"মিত্রদ্রোহী পাপেতেই নাহি পারাপার।
করিয়াছ সেই পাপ রাজার কুমার॥
নরক গমন ইথে নাহিক সংশয়।
পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্য্য যতদিন রয়।
এই শ্লোক শ্রবণেতে 'মি' ত্যাগ হইল।
পরে রাজা পাত্রমুখে কহিতে লাগিল॥
পুনঃ এক শ্লোক বররুচি পাঠ করে।
শ্রবণ করেন সে ভূপতিকুমারে॥"

ভগবানকে সাক্ষ্য করিয়া যাহার সহিত মিত্রতা করা হইয়াছে তাহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করার নাম মিত্রদ্রোহিতা।

যে ব্যক্তি উপকারীর উপকার স্বীকার করে না তাহাকে কৃতঘ্ন বলা হয়।

রাম শ্যামের কুটুম্ব বা আত্মীয়, সুতরাং শ্যাম রামের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। শ্যাম কোন ফারমে ১২১ টাকা জমা দিবার জন্য রামকে ঐ টাকা দিল। রাম ১০০ টাকা জমা দিয়া ২১ টাকা আত্মসাৎ করিল ও কিছুতেই ঐ টাকা দিল না। শ্যামকে ঐ ফার্মে ২১ টাকা দিতে হইল। দুইবার ২১ টাকা দিতে শ্যামের বিশেষ কষ্ট হইবার কথা। এখানে রাম বিশ্বাসঘাতক হইল। রাম শ্যামের নিকটে ১২১ টাকা ধার লইয়া ১০০ টাকা শোধ করিল, বক্রী ২১ টাকা দিলনা বা দিতে পারিল না তাহাতে রামের তত পাপ হইবে না, যত পাপ হইবে বিশ্বাসঘাতকতা করায়। মিত্রদ্রোহিতা, কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ঐপ্রকার পাপকারী কল্পক্ষয় পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

রাজপুত্র এক্ষণে কেবল 'রা' 'রা' বুলি বলিতে লাগিলেন।
পরে আর একটী শ্লোক :—

"রাজাসি রাজপুত্রোঽসি যদি কল্যাণমিচ্ছসি।
দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু॥"

"রাজার নন্দন শুন আমার বচন।
আপনি কল্যাণ চিন্তা করহ এখন।
শান্তি করি দান দেহ আজি দ্বিজগণে।
ভক্তিযোগ দিয়া কর দেবতারাধনে॥

বাটীতে করাও যজ্ঞ বিদ্বান আনিয়া।
সুখে থাক নিরন্তর গৃহেতে বসিয়া॥
সুস্থ হইল সেই বররুচির কৃপায়।
প্রণমিল রাজপুত্র বররুচি পায়॥"

তখন রাজপুত্র বররুচিকে বলিলেন "দয়াল প্রভো, আপনার প্রসাদে ব্যাধি দূর হইল। এক্ষণে বনের বৃত্তান্ত আমার স্মরণপথে আসিয়াছে। আমি আজ হইতে আপনার দাস হইলাম।" তিনি তৎপরে প্রকৃতস্থ হইয়া বনে ভল্লুকের সহিত তাঁহার আচরণের কথা পিতার নিকটে অকপটে বর্ণনা করিলেন।

বিক্রমাদিত্য চমৎকৃত হইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন—

"গৃহে বসসি কৌমারি অটব্যাং নৈব গচ্ছসি।
ঋক্ষব্যাঘ্রমনুষ্যাণাং কথং জানাসি সুন্দরি॥"

"গৃহে বাস কর তুমি শুনহ কামিনী।
বনমধ্যে কখনত না যাও আপনি॥
ব্যাঘ্র আর ভল্লুকে দেখা হইল বনে।
তুমিহ জানিলে এই বারতা কেমনে॥
শুনি বররুচি কন শুনহ রাজন্।
শ্রবণ করেন রাজা সহ সভাগণ॥"

"দেবগুরু প্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী।
তেনাহং নৃপ জানামি ভানুমত্যা স্তিলং যথা॥"

"দেবতার প্রসাদেতে গুরুর কৃপায়।
জিহ্বাগ্রে শারদা মোর রহে মহাশয়॥"

নতুবা এরূপ কথা কোন্‌জন জানে।
ভানুমতীর উরুদেশে তিলের সন্ধানে॥
পরিচয় পেয়ে রাজা আনন্দে ভাসিল।
নিজবেশ ধরি বররুচি প্রকাশিল॥
পুত্র কোলে করিলেন উজ্জলের রায়।
বররুচি প্রাণ পায় রাজার সভায়॥"

বররুচি একলক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক পাইলেন এবং বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় থাকিয়া গেলেন। বিক্রমাদিত্য এইপ্রকার মহানুভব রাজা ছিলেন। হে ভোজরাজ আপনি অগ্রে তাঁহার মত হউন, তবে এই সিংহাসনে বসিবেন।

এই বলিয়া পুত্তলী খসিয়া পড়িল ও নিজমূর্ত্তি ধরিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। ভোজরাজ সেদিন আর সিংহাসনে বসিলেন না।

ইন্দ্র বলিয়া গেলেন "বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপ" এই চিন্তা সততই তাহার মনে উদিত হয় এবং সে অন্তরে দারুণ অশান্তি ভোগ করে, কিন্তু সে চতুর লোক বলিয়া বাহিরে এই অশান্তির চিহ্নও দেখায় না। বাহিরের লোক দেখিতে পায় লোকটী অধর্ম্ম করিয়াও বেশ সুখে আছে। এই পৃথিবীতে ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক সকলেরই দুর্ঘটনা ঘটিবে ইহা প্রকৃতির নিয়ম। ধার্ম্মিক হইলে দুর্ঘটনা ঘটিবে না তাহা নহে। এক্ষণে মনে কর এই লোকটীর একটী পুত্র মারা গেল। তখন সে যে আঠার হাজার টাকা ভাঙ্গিয়া গুরুতর পাপ করিয়াছে এই চিন্তা তাহার মনে উদিত হইবে এবং সেই পাপের ফলেই তাহার পুত্রটী মারা গেল এরূপ চিন্তা তাহার হৃদয়ে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিবে এবং সে গুরুতর অশান্তি ভোগ করিবে। ছয় সাত মাস পরে হয়ত তাহার গৃহদাহ হইল। তখন আবার সেই চিন্তায় সে হৃদয়ে দারুণ ব্যথা অনুভব করিবে। দুই বৎসর পরে হয়ত তাহার আর একটী পুত্র মারা গেল।

টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া তাহার পুত্র দুইটী মারা গেল এবং তাহার গৃহদাহ হইল তাহা নহে, টাকা আত্মসাৎ না করিলেও তাহার পূর্ব্বোক্ত প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিত, কিন্তু সেই লোকটীর ধারণা হইবে ঐ পাপ করায় তাহার দুর্ঘটনা ঘটিল। সে চতুর লোক বলিয়া তাহার হৃদয়ের ব্যথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করে না।

এইজন্য পাপীরা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মরে কিন্তু ধার্ম্মিকেরা একবার মাত্র মরেন। যাঁহারা প্রকৃত ধার্ম্মিক তাঁহাদের কষ্ট হইতেই পারে না। ধনিগণ যে দাদফেনি চাউল খান, সেই চাউলের ভাত খাইতে না পাইয়া যিনি মনে কষ্ট অনুভব করেন, তাঁহাকে ধার্ম্মিক না বলিয়া পেটুক বলিতে হইবে। শরীর পোষণের জন্য যাহা একান্ত আবশ্যক তাহা না পাওয়ার নাম দুঃখ। ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ শ্রীভগবানে মতি রাখিয়া শোক করেন না, ভিতরে না এবং বাহিরেও না। যাহাহউক বৎস, তুমি কখনও ঈশ্বরের বিচারে সংশয় রাখিও না। তুমি পুর্ব্ববৎ শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে থাক। তিনি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তোমার জন্যও বৈকুণ্ঠে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। তুমি তাহা হারাইও না।” এই বলিয়া ইন্দ্র অদৃশ্য হইলেন।

আত্মা ব্রহ্মের অংশ এবং ইহাঁর স্থান হৃদয়ে।

“ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥” গীতা

ব্রহ্মার স্থান নাভিদেশে, বিষ্ণুর স্থান হৃদয়ে এবং শিবের স্থান ললাটে। আত্মার কার্য্য হইতেছে কর্ম্ম আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পুর্ব্বে মন রাজাকে ঐ কর্ম্ম সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া। যেহেতু ব্রহ্ম সৎ, অংশ আত্মাও সৎ। এইজন্য আত্মা সৎপরামর্শ দিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। যেমন রাজা মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন আবার নাও পারেন, সেইরূপ মন আত্মার পরামর্শ গ্রহণ করিতে

বাধ্য নয়। যদি ইচ্ছা হয় তবে মন আত্মার পরামর্শ লইতে পারে এবং যদি ইচ্ছা না হয়, তবে উহা নাও লইতে পারে; কিন্তু মনের বুদ্ধি বা জ্ঞানের উপর যথেষ্ট আস্থা আছে; সুতরাং বুদ্ধি যাহা বলিয়া দিবে মন অন্ধের ন্যায় তাহাই মানিয়া লয়।

একটী মশা আমার পায়ে বসিল। ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা তৎক্ষণাৎ উচ্চ মগজে জ্ঞান হইল একটী মশা বসিয়া আছে। পরক্ষণে মশাটী হুল্ ফুটাইলে হৃদয়ে অনুভূতি হইল যন্ত্রণা হইতেছে। এক্ষণে মনরাজাকে মশা সম্বন্ধে এমন কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ইহা দুই উপায়ে হইতে পারে, মশাটীকে উড়াইয়া দিলে এবং মশাটীকে মারিয়া ফেলিলে। তৎক্ষণাৎ আত্মা মনকে বলিল "মশাটীকে উড়াইয়া দাও, মারিও না; তাহাতে যন্ত্রণার নিবারণ হইবে এবং জীবহিংসাও হইবে না।" ষড়রিপু বলিল "মশাকে মারিতেই হইবে, কেননা উহা আবার আসিয়া দংশন করিবে।" ষড়রিপু আত্মার প্রতিদ্বন্দ্বী; সুতরাং আত্মা যে পরামর্শ দিবে, ষড়রিপু ঠিক তাহার উল্টা পরামর্শ দিবে। মন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বুদ্ধির পরামর্শ চাহিল। বুদ্ধি তিন ভাগে বিভক্ত হইল। অজ্ঞান ষড়রিপুর মতে মত দিল; বিজ্ঞান কিছুই করিল না। জ্ঞান কখনও আত্মার দিকে এবং কখনও ষড়রিপুর দিকে ঢলে। প্রকৃত শিক্ষা (গুরূপদেশ) দ্বারা যাহাদিগের জ্ঞান মার্জ্জিত হয় নাই, তাহাদিগের বুদ্ধি (জ্ঞান) ষড়রিপুর মতে মত দেয়। এই তর্ক মুহূর্ত্তের মধ্যে হইয়া যায় এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে মীমাংসাও হইয়া যায়। যদি জ্ঞান আত্মার পরামর্শ গ্রহণ করে তবে মন তাহাই মানিয়া লয় এবং মশাটীকে উড়াইয়া দিবার জন্য হাতকে আদেশ করিল। হাত আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় তাহাই করিল। মশা উড়ান একটী কর্ম্ম হইল। যে মুহূর্ত্তে কর্ম্মটী শেষ হইয়া গেল অর্থাৎ মশাকে উড়াইয়া দেওয়া হইল, ঐ কর্ম্মের ফল আসিয়া জুটিল। এই ফল দুই প্রকারের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। দৃষ্ট ফল হইল এই যে যাহারা কর্ম্মটী

দেখিল তাহারা ঘোষণা করিল 'লোকটী জীবহিংসা করে না।' অদৃষ্ট ফল হইল এই যে আত্মাতে একটী শুক্ল বা সাদা দাগ পড়িয়া গেল। পক্ষান্তরে যদি জ্ঞান ষড়রিপুর পরামর্শ গ্রহণ করে, তবে মন তাহাই মানিয়া লইয়া মশাটীকে মারিয়া ফেলিবার জন্ম হাতকে আদেশ করিল। হাত আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় তাহাই করিল। মশা মারাও একটী কর্ম্ম হইল, ইহার দৃষ্ট ফল হইল এই, যাহারা কর্ম্মটী দেখিল তাহারা ঘোষণা করিল "লোকটী ভয়ানক জীব হিংসা করে" এবং অদৃষ্ট ফল হইল এই আত্মাতে একটী কৃষ্ণ বা কাল দাগ পড়িয়া গেল। মশা উড়ান একটী কর্ম্ম এবং মশা মারাও একটী কর্ম্ম এবং এই উভয় কর্ম্মেই নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলি হইয়া গেল :—

প্রথমে জ্ঞান (thinking), পরে অনুভূতি (feeling), পরে তর্ক (debate), পরে বুদ্ধিকে মধ্যস্থ (referee) মানা, পরে বুদ্ধি বা জ্ঞানের মীমাংসা এবং তৎপরে প্রকৃত কর্ম্ম (willing) এবং কর্ম্মান্তে ফল (result) যাহা সাদা বা কাল দাগ। কর্ম্মে আমার অধিকার (control) থাকিবে ততক্ষণ যতক্ষণ উহা তর্কের মধ্যে আছে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে জ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়া লইবে আত্মা বা যড়রিপু ইহাদের মধ্যে কাহার প্রস্তাব (suggestion) গৃহীত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই কর্ম্মটী হইয়া গেল, সুতরাং ফল সাদা হউক আর কাল হউক আসিয়া জুটিবে এবং শেষে কর্ম্মটী সম্পাদিত হইল জ্ঞানের প্ররোচনায়। অতএব

"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" গীতা—৪।৩৪

এবং "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" গীতা—২।৪৭

রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম এক খোঁড়া বসিয়া আছে। দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান হইল খোঁড়া বসিয়া আছে; পরে যখন খোঁড়া একটী পয়সার জন্য চীৎকার করিল, অনুভূতি দ্বারা হৃদয়ে দয়া জন্মিল। আত্মা

প্রস্তাব দিল "আহা খোঁড়াকে একটী পয়সা দাও, কারণ ওব্যক্তি অসমর্থ।" ষড়্‌রিপু বলিয়া উঠিল "পয়সা দেওয়া হইবে না, ওব্যক্তি যেমন কর্ম্ম করিয়াছে সেইরূপ ফলভোগ করুক; অধিকন্তু ওরূপ পয়সা দিতে গেলে, এত পয়সা কোথায় পাওয়া যাইবে?" মন বুদ্ধির পরামর্শ চাহিল। যদি বুদ্ধি বা জ্ঞান আত্মার প্রস্তাব গ্রহণ করে, তবে মন তাহাই মানিয়া লইয়া খোঁড়াকে একটী পয়সা দিবার জন্য হাতকে আদেশ করিল। হাত আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় তাহাই করিল। এক্ষণে খোঁড়াকে পয়সা দেওয়া একটী কর্ম্ম হইল। তৎক্ষণাৎ অদৃষ্ট ফল হইল এই যে আত্মাতে একটী সাদা দাগ পড়িয়া গেল এবং দৃষ্ট ফল হইল যাহারা কর্ম্মটী দেখিল তাহারা ঘোষণা করিল "লোকটী দানশীল।" যদি জ্ঞান ষড়্‌রিপুর প্রস্তাব গ্রহণ করে, তবে অদৃষ্ট ফল হইল আত্মাতে একটী কাল দাগ পড়িয়া গেল এবং দৃষ্ট ফল হইল যাহারা কর্ম্মটী দেখিল তাহারা ঘোষণা করিল "লোকটী কৃপণ।" খোঁড়াকে পয়সা দেওয়া বা না দেওয়া এই উভয় কর্ম্মেই জ্ঞান, অনুভূতি, তর্ক, বুদ্ধির মধ্যস্থতায় মীমাংসা এবং পরে প্রকৃত কর্ম্ম এবং অবশেষে ফল দৃষ্ট বা অদৃষ্ট।

পথিমধ্যে দেখিলাম আমগাছে সুন্দর আম পাকিয়া আছে। প্রথমে দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান হইল আম পাকিয়া রহিয়াছে, পরে আম খাইবার ইচ্ছা বা লোভ (অনুভূতি) জন্মিল। আত্মা প্রস্তাব করিল "আম পাড়িও না, উহা তোমার অধিকারভুক্ত নহে।" পরে ষড়্‌রিপুর প্রস্তাব "ওরূপ সদ্ বিচার করিতে গেলে ত খাওয়াই হয় না।" পরে জ্ঞানকে মধ্যস্থ মানা "কিহে ভায়া, তুমি কি বল?" পরে জ্ঞানের মীমাংসা, পরে প্রকৃত কর্ম্ম। যদি জ্ঞান আত্মার প্রস্তাব গ্রহণ করে, তবে আম পাড়া হইল না, তৎক্ষণাৎ ফল আসিয়া জুটিল; দৃষ্ট ফল যথা যাহারা কর্ম্মটী দেখিল তাহারা ঘোষণা করিল "লোকটী নির্লোভ" এবং অদৃষ্ট ফল যথা আত্মাতে একটী সাদা দাগ পড়িয়া গেল। যদি জ্ঞান ষড়্‌রিপুর প্রস্তাব গ্রহণ করে, তবে আম পাড়িয়া খাইলাম।

দৃষ্ট ফল যথা পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা ঘোষণা করিল “লোকটী লোভী ও পরদ্রব্য অপহরণ করে”; এবং অদৃষ্ট ফল যথা আত্মাতে একটী কাল দাগ পড়িয়া গেল। আম পাড়া একটী কর্ম্ম এবং আম না পাড়াও একটী কর্ম্ম। এই উভয় কর্ম্মেই পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াগুলি যথা জ্ঞান, অনুভূতি, তর্ক, মীমাংসা ও প্রকৃত কর্ম্ম হইয়া গেল।

যেমন টাইপ্ রাইটিং যন্ত্রে একটী পরদা টিপিলে, সেইমত অক্ষরটী মুহূর্ত্ত মধ্যে কাগজে উঠে, সেইরূপ যে কোনও কর্ম্ম হইবামাত্র আত্মাতে সাদা বা কাল দাগ পড়িয়া যাইবে।

আম পাড়া ক্রিয়া হইয়া গেলে হয়ত মালী আসিয়া আমাকে গালি দিল বা প্রহার করিল। তখন মন ও জ্ঞান বলিতে থাকে আত্মার প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া এইরূপ দুর্গতি হইল। ইহারই নাম অনুতাপ।

বলা বাহুল্য অনুভূতির উচ্চ অবস্থার নাম ভক্তি, এবং ভক্তির উচ্চ অবস্থার নাম প্রেম। প্রায়ই দেখা যায় অসৎ কর্ম্ম করিবার সময়ে মানুষ কখন অগ্রসর হয় আবার তখনই পশ্চাদ্‌গামী হয়। কোন্‌টী আত্মার প্রস্তাব এবং কোন্‌টী ষড়রিপুর প্রস্তাব ইহা স্থির করা বড় কঠিন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আত্মা অগ্রে পরামর্শ দেয়; কিন্তু উভয় প্রস্তাব এত ক্ষিপ্রগতিতে মনে আসিয়া উদিত হয় যে কোন্‌টী আগের প্রস্তাব এবং কোন্‌টী পরের প্রস্তাব ইহাত বুঝাই যায় না অধিকন্তু কোনরূপ প্রস্তাব আসিতেছে এরূপ ধারণা করাও দুরূহ। গভীর অন্তর্দৃষ্টি (introspection) ব্যতিরেকে আত্মদর্শন হয় না। সুতরাং আত্মার পরামর্শও বুঝিতে পারা যায় না। কাজেই ইহা গাঁজাখোরী কথা বলিয়া মনে হইতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মনুষ্যজীবন কর্ম্মের সমষ্টি, এক্ষণে দেখা গেল প্রত্যেক কর্ম্মে হয় একটী সাদা দাগ না হয় একটী কাল দাগ আত্মাতে বা আত্মার

বাহ্যিক আবরণে পড়ে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে মনুষ্য-জীবন কতকগুলি সাদা ও কাল দাগের সমষ্টি মাত্র। সাদা দাগ আত্মার প্রস্তাব মত কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত হয় এবং কাল দাগ ষড়রিপু বা শয়তানের প্রস্তাব মত কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত হয়। সাদা দাগ সৎকর্ম্মের এবং কাল দাগ অসৎকর্ম্মের চিহ্ন। সাদা দাগে পুনর্জন্ম হয় না এবং কাল দাগই বন্ধনের বা পুনর্জন্মের কারণ।

যখন রাম মরিবে রামের মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, ষড়রিপু, দেহ ইত্যাদি পড়িয়া রহিবে ও যথাসময়ে ক্ষিত্যপতেজঃমরুৎব্যোম এই পঞ্চভূতের সহিত মিশিয়া যাইবে। দৃষ্টফলও এই পৃথিবীতে থাকিয়া যাইবে। আত্মার বিনাশ নাই, ইহা কতকগুলি সাদা ও কাল দাগ লইয়া দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যাইবে।

বলা বাহুল্য মানুষের মৃত্যুর সময়ে তাহার দেহ হইতে একটী লিঙ্গশরীর (আত্মা নহে) বাহির হইয়া কর্ম্ম অনুসারে বিভিন্ন বায়ুস্তরে গিয়া বাস করে। ইহার এক বৎসর পরে ক্ষুধা হয়। 'সতিলোদকং' বা তিলযুক্ত জলই ইহার খাদ্য। ইহা মুখ দিয়া না খাইয়া তিলযুক্ত জলের ঘ্রাণ লইয়া তৃপ্তিলাভ করে। মানুষের এক বৎসরে পিতৃলোকের এক দিন হয়। বৎসরান্তে খাদ্যপ্রাপ্তির আশায় ইহা মর্ত্ত্যলোকে আত্মীয় স্বজনের নিকটে আসে। খাদ্য পাইলে অর্থাৎ পুত্র দিবসিক শ্রাদ্ধ করিলে ইহা সন্তুষ্ট হইয়া পুত্র ও আত্মীয় স্বজনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজ স্তরে ফিরিয়া যায়।

"........................শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।

পিতৃলোকং প্রয়াস্তেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ॥" গীতা মাহাত্ম্য।

খাদ্য না পাইলে অর্থাৎ পুত্র বা আত্মীয় স্বজন দিবসিক শ্রাদ্ধ না করিলে ইহা তাহাদিগকে গালি দিয়া ক্ষুধায় ছটফট্ করিতে করিতে আপন স্তরে চলিয়া

যায়। বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার সাহায্যে এই লিঙ্গশরীরের সহিত কথাবার্ত্তা চলিতে পারে। এক একটী আত্মার বহু সহস্র লিঙ্গশরীর বায়ুস্তরে বিদ্যমান থাকে। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধান্তে কৌরবরমণীরা দুর্য্যোধিনাদির লিঙ্গশরীর দর্শন করিয়াছিলেন। ব্যাসপ্রসাদে (ক্রিয়া দ্বারা) এই লিঙ্গশরীর কথাবার্ত্তা ইত্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

আমরা জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিবার সময়ে এক মুহূর্ত্তের জন্যও উলঙ্গ থাকিনা। সেইরূপ আত্মা যে মুহূর্ত্তে এক জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য দেহ ত্যাগ করে, সেই মুহূর্ত্তেই অন্য নূতন ও কর্ম্মঠ দেহ ধারণ করিয়া থাকে। ইহার এক দেহ ছাড়িয়া মুহূর্ত্তের জন্যও অন্য কোনও দেহ ধারণ না করিয়া থাকিবার উপায় নাই। তড়িৎশক্তি ধাতুনির্ম্মিত তার ভিন্ন ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় না। আত্মার কার্য্য হইতেছে ভগবানের লীলার সাহায্য করা। এক মুহূর্ত্ত নিষ্ক্রিয় থাকিলে ভগবানের সাহায্য করা হয় না। দেহত্যাগ করিয়া ইহা ভগবানের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আদেশক্রমে অন্য দেহ ধারণ করে না, কারণ কাল দাগ পাপের চিহ্ন এবং ভগবান 'অপাপবিদ্ধ'। পাপ নিষ্পাপের কাছে যাইবে কি প্রকারে ? আত্মা অমিতশক্তিমান ভগবানের অংশ বলিয়া নিজেই শক্তিমান। এক দেহ ধ্বংসে সে কোন্ প্রকার দেহ ধারণ করিবে ইহা নিজেই ঠিক করিয়া লয়। এইরূপ লীলাময়ের লীলা।

আবার একটী মাত্র কাল দাগ থাকিতে, আত্মা মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে পাইবে না। মনুষ্যদেহান্তে যতগুলি কাল দাগ থাকিবে, ততগুলি ইতর যোনি ভ্রমণ করিয়া প্রত্যেক যোনিতে একটী করিয়া কাল দাগ ক্ষয় করিয়া, শেষে সমস্ত কাল দাগ ক্ষয়িত হইয়া গেলে, আত্মা পুনরায় মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে পাইবে। কালদাগগুলি আবার কর্ম্ম অনুসারে গভীর, গভীরতর ও গভীরতম হয় এবং তদনুসারে আত্মা কৃমি, কীট, টিক্‌টিকি, শূকর, গাভী ইত্যাদি যোনি ধারণ করে।

মনে করুন রামের মৃত্যুকালে পাঁচ হাজার সাদা দাগ ও আশি লক্ষ কাল দাগ ছিল। দেহান্তে রামের আত্মা (বা রাম) ঐ দাগগুলি লইয়া কৃমি যোনিতে জন্ম লইল এবং এক ঘণ্টা পরে কৃমির মৃত্যু হইল। কৃমি যোনিতে জন্মকালীন নূতন সাদা বা কাল দাগ অর্জ্জিত হইবে না, কেবল একটী কাল দাগের ক্ষয় হইল মাত্র। ইহাকেই নরকভোগ বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মনুষ্য ব্যতিরেকে কোনও প্রাণীরই বুদ্ধি নাই, সুতরাং এই যোনিতে জন্মকালীন পাপ হইবে না এবং পুণ্যও হইবে না। কৃমিদেহত্যাগ করিয়াই রামের বা কৃমির আত্মা শূকর যোনিতে জন্ম লইল। ঐ আত্মা পাঁচ হাজার সাদা ও এক কম আশি লক্ষ কালদাগ লইয়া শূকর হইল। ছয় মাস পরে শূকরটী মরিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ ঐ আত্মা পাঁচ হাজার সাদা ও দুই কম আশি লক্ষ কাল দাগ লইয়া গাভী যোনিতে জন্ম লইল। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ইতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে মাত্র একটী কাল দাগ অবশিষ্ট আছে। রামের আত্মা এক্ষণে পাঁচ হাজার সাদা ও একটী কাল দাগ লইয়া বানর যোনিতে জন্ম লইল। এই বানরটী মরিয়া গেলে, ঐ আত্মা পাঁচ হাজার সাদা দাগ লইয়া আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করিল। হয়ত এক্ষণে মনুষ্যদেহধারী ঐ আত্মার নাম হইল যদু। এই যদু আবার নূতন কর্ম্ম করিয়া সাদা ও কাল দাগ অর্জ্জন করিতে থাকিবে। পক্ষান্তরে শ্যামের মৃত্যুকালে আশি লক্ষ সাদা দাগ ও পাঁচ হাজার কাল দাগ ছিল। এক্ষণে শ্যামের আত্মাকে কাল দাগগুলি ক্ষয় করিবার জন্য পাঁচ হাজার ইতর যোনি ভ্রমণ করিতে হইবে, কিন্তু প্রত্যেক যোনিতে জন্মকালীন আশি লক্ষ সাদা দাগ থাকিয়া যাইবে। সুতরাং ঐ আশি লক্ষ সাদা দাগ নূতন মনুষ্য জন্মে তাহার (হরির) পুঁজি হইবে। ইহাকে মনুষ্যের স্বধর্ম্ম বলে। ইহা হইতে দেখা গেল প্রথম মনুষ্যজন্মে জীব যতগুলি সাদা দাগ অর্জ্জন করিয়াছে, পর মনুষ্যজন্মে তাহার কম হইতে পারে না, বরং সাদা দাগের বৃদ্ধি হইতে পারে। অর্থাৎ জীব ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। আশি লক্ষ সাদা দাগ বিশিষ্ট হরি

জাতিস্মর হইবে। এবম্ভূত লোককে সহজে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য ও বুদ্ধ প্রভৃতি মহাত্মারা এই শ্রেণীর লোক। এই স্বধর্ম্মের উপর শিক্ষা ও দীক্ষা নির্ভর করে। যাহার যে স্বধর্ম্ম সে তাহা সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। হঠাৎ ত্যাগ করিতে গেলে তাহার অনিষ্ট হওয়ার সম্ভব। ইতিহাসে দেখা যায় সম্রাট অশোক এই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে চণ্ডাশোক ছিলেন এবং পরে ধর্ম্মাশোক হইয়াছিলেন। দস্যু রত্নাকরও কালে বাল্মিকী মুনি হইয়াছিলেন।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ"—গীতা ৩;৩৫।

পূর্ব্ব জন্মের এই সাদা দাগ বা স্বধর্ম্ম পর মনুষ্য জন্মে পিতা ও মাতার স্বধর্ম্মের কিয়দংশের সহিত মিলিত হইয়া এবং অ—আমির সংঘর্ষে আসিয়া মানুষ ভবের হাটে বেচাকেনা আরম্ভ করে। এই স্বধর্ম্মই ছয় সাত বৎসর বয়সের বালকের গণিত শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি বা সঙ্গীত শাস্ত্রে অসাধারণ নিপুণতার কারণ। এইজন্যই একই পিতার ভিন্ন ভিন্ন পুত্র বিভিন্ন চরিত্রের হইয়া থাকে। কর্ম্ম করিতে করিতে আত্মা যখন এমন মনুষ্যদেহ ধারণ করিবে যাহাতে একটীও কাল দাগ অর্জ্জিত হইবে না, জীব দেহান্তে ব্রহ্মে সাযুজ্য পাইবে; কারণ তখন তাহার জীবন বা পথ সাদা হইয়া যাইবে। ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া সৎকর্ম্ম করিলেও কাল দাগই হইবে। এখানে ফল বলিতে ঈশ্বরারাধনা ব্যতীত সাংসারিক ফল বুঝিতে হইবে।

কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে ভগবানের ইচ্ছায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে বর্ত্তমান শৃঙ্খলাবস্থায় পরিণত হইল। পরে তরু লতা ইত্যাদি সৃষ্ট হইয়াছিল। পরে জীব সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে তিনি প্রথমে কৃমি, কেঁচো ইত্যাদি জীব সৃষ্টি করিলেন। ইহারা মাত্র গড়াইয়া গড়াইয়া চলিতে পারে। বহু বৎসর পরে অধিকতর পূর্ণতার ইচ্ছায় তিনি সরীসৃপজাতীয় জীব

সৃষ্টি করিলেন। ইহাদের রক্ত ও মেরুদণ্ড আছে; কিন্তু ইহারা বুকে ভর দিয়া চলে। বহু বৎসর পরে আরও পূর্ণতার (perfection) ইচ্ছায় তিনি গরু ছাগল ইত্যাদি রোমন্থনকারী জীব সৃষ্টি করিলেন। চলিয়া যাইবার সময়ে ইহাদের মেরুদণ্ড পৃথিবীর সহিত সমান্তরাল থাকে, কিন্তু ইহারা বসিতে পারে না। বহু বৎসর পরে আরও পূর্ণতার ইচ্ছায় তিনি কুকুর জাতীয় জীব সৃষ্টি করিলেন। ইহারা বসিতে পারিলেও, চলিয়া যাইবার সময়ে ইহাদের মেরুদণ্ড পৃথিবীর সহিত সমান্তরাল থাকে। বহু বৎসর পরে আরও পূর্ণতার ইচ্ছায় তিনি বানর শ্রেণীর জীব সৃষ্টি করিলেন। ইহারা ইচ্ছামত বসিতে ও দাঁড়াইতে পারে এবং চলিয়া যাইবার সময়ে ইহাদের মেরুদণ্ড পৃথিবীর সহিত কোণ প্রস্তুত করে। বহু বৎসর পরে অধিকতর পূর্ণতার ইচ্ছায় ভগবান মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন ও ক্ষান্ত হইলেন। মানুষ পূর্ব্ব সংস্কার এখনও ভুলিতে পারে নাই; তাই সে জন্মের সময়ে কেঁচোর ন্যায় পড়িয়া থাকে, বড় জোর গড়াইতে পারে। কিছুদিন পরে সে সরীসৃপের ন্যায় হাত দুইটী মাটীতে রাখিতে পারে ও একটু একটু অগ্রসর হইতে পারে। কিছুদিন পরে সে গরু প্রভৃতির ন্যায় হাত ও পা টানিতে থাকে। আবার কিছুদিন পরে সে কুকুর শ্রেণীর জীবের ন্যায় বাঘাহামা টানিতে আরম্ভ করে। আরও কিছুদিন পরে সে বানর শ্রেণীর জীবের ন্যায় অল্প অল্প করিয়া দাঁড়ায় ও চলে কিন্তু মধ্যে মধ্যে পড়িয়া যায়। তাহার পরে সে তাহার মেরুদণ্ড পৃথিবীর সহিত লম্ব রাখিয়া দাঁড়াইতে ও চলিতে পারে, আর পড়িয়া যায় না। ইহাই 'মনুষ্য মর্কট গোত্র'।

অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ 'মনুষ্য মর্কট গোত্র' অর্থাৎ মানুষের আদি বানর ইহা বলেন না। ইঁহাদের মতে ভগবানের ইচ্ছায় অহঙ্কার (বা হঙ্কার) হইতে ব্যোমের সৃষ্টি হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। অব্যবহিত পরে জীব সৃষ্টির ইচ্ছায়

তিনি মানুষ, বানর, কুকুর ইত্যাদি যাবতীয় জীব একসঙ্গেই সৃষ্টি করিলেন। ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণতা। যেহেতু তিনি মানুষ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ষড়রিপু বা শয়তান সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষ এই শয়তানের প্রলোভনে অসৎ কর্ম্ম বা ভগবানের অনভীপ্সিত কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করায় কর্ম্ম অনুসারে অর্থাৎ কাল দাগের ক্ষয়ের জন্য ক্রমি, টিকটিকি, শূকর, কুকুর, বানর ইত্যাদি জন্মগ্রহণ করিয়া কাল দাগগুলি ক্ষয়িত হইলে আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করে; এজন্য সে পূর্ব্ব সংস্কার ভুলিতে না পারিয়া জন্মের সময় হইতে ৫।৭ মাস সময় পর্য্যন্ত বিভিন্ন অবস্থা পার হইয়া মনুষ্যের ন্যায় দাঁড়ায় ও চলে।

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কেবলই সাদা দাগ অর্জ্জন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ভোগ করা। সাদা দাগ অর্জ্জন করিতে হইলে ষড়রিপুকে এমন বশে আনিতে হইবে যে আত্মার বিরুদ্ধে সে কোনও কথা বলিতে সাহস না করে; অর্থাৎ ষড়রিপুকে সমূলে বিনাশ করিতে হইবে, নচেৎ আত্মদর্শন হইবে না; অথবা জ্ঞানকে এরূপ মার্জ্জিত করিতে হইবে যে উহা সর্ব্বদাই আত্মার প্রস্তাবে সায় দেয়। জীবনের উদ্দেশ্য আত্মদর্শন নহে, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বা মোক্ষ লাভ করিয়া জীবের ব্রহ্মে লীন হওয়া। আত্মদর্শন তাহারই উপায় মাত্র। আত্মদর্শন হইলেও মানুষকে কর্ম্ম করিতে হয়; বুদ্ধদেব তাহার প্রমাণ। দেহ জীর্ণ না হইলে উহার ধ্বংস হয় না; এবং মৃত্যু কাহারও ইচ্ছাধীন নহে। ইষ্টক নির্ম্মিত দেওয়ালের চূণ, স্বরকী ইত্যাদি মশলাই আয়ু। দেওয়ালটীর বাহিরে চূণ বালী ইত্যাদি লেপন করা থাকিলেও এবং দেওয়ালটী বাহ্যিক সুন্দর দেখাইলেও, উহার অভ্যন্তরস্থ মশলা নষ্ট হইয়া গেলে দেওয়ালটী পড়িয়া যায়, সেইরূপ মনুষ্যের শরীর বাহ্যিক সুন্দর দেখাইলেও, কর্ম্মরূপ মশলা খারাপ হইয়া গেলেই উহার পতন হয়। যে মুহূর্ত্তে আত্মদর্শন হইবে, সেই মুহূর্ত্তের পর হইতে জীবের কাল দাগ অর্জ্জন করিতে প্রবৃত্তি

আসিবে না। ব্রহ্মকে জানিলেও আত্মদর্শন হয়, কারণ পূর্ণকে জানিলে অংশকেও জানা হইল।

"শুক্লকৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ॥
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন॥"

গীতা ৮।২৬।২৭

এই শ্লোকদ্বয়ের সাধারণ অর্থ যথা—শুক্ল ও কৃষ্ণ পথ জগতে অনাদি বলিয়া প্রসিদ্ধ। একের অর্থাৎ শুক্ল পথের দ্বারা অনাবৃত্তি বা মোক্ষ পাওয়া যায় এবং অন্যের অর্থাৎ কৃষ্ণ পথের দ্বারা জীবকে সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। হে পার্থ, যে যোগী মার্গদ্বয়ের বিষয় জ্ঞাত আছেন, তিনি মোহপ্রাপ্ত হন না। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি নিয়ত যোগসম্পন্ন হও।

গতি অর্থে পক্ষ হইতে পারে। পক্ষ দুইটী শুক্ল ও কৃষ্ণ। এই দুই পক্ষ সৃষ্টির আদি হইতে চলিয়া আসিতেছে। যে ব্যক্তি শুক্ল পক্ষে দেহত্যাগ করে, তাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না এবং জীব কৃষ্ণ পক্ষে দেহত্যাগ করিলে তাহাকে পুনরায় জন্ম লইতে হয়।

গতি অর্থে অয়ন হইতে পারে। অয়নও দুইটী, যথা—উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। এই দুই অয়নও জগতের সৃষ্টি হইতে চলিয়া আসিতেছে। শুক্লগতি অর্থে উত্তরায়ণ এবং কৃষ্ণ গতি অর্থে দক্ষিণায়ন। যে ব্যক্তি উত্তরায়ণে অর্থাৎ ৯ই পৌষ হইতে ৮ই আষাঢ় পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিবে, সে আর জন্মিবে না এবং যে ব্যক্তি দক্ষিণায়নে অর্থাৎ ৯ই আষাঢ় হইতে ৮ই পৌষ পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে মরিবে, তাহাকে আবার জন্ম লইতে হইবে।

এইজন্যই বোধ হয় ভীষ্মদেব দক্ষিণায়নে অর্থাৎ ১লা মাঘের পূর্ব্বে মরিতে ইচ্ছা করেন নাই। একমাত্র ভীষ্মই ইচ্ছামৃত্যু ছিলেন। মৃত্যু কাহারো ইচ্ছায় হয় না। এখানে বলা বাহুল্য ভীষ্মের সময়ে ১লা মাঘ উত্তরায়ণ ছিল। ইহা এক্ষণে ৯ই পৌষ বা ২৩শে ডিসেম্বর হইয়াছে। বিষুবের (equinox) সামান্য পরিবর্ত্তনের জন্য এই সময়ের অর্থাৎ বাইশ দিনের পার্থক্য ঘটিয়াছে। বিষুবের পরিবর্ত্তনের পরিমাণ জানা গিয়াছে; ইহা হইতে ভীষ্মের সময় অর্থাৎ দ্বাপর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কত বৎসর হইয়াছে তাহা জানা যাইতে পারে।

উপরি উক্ত দুই প্রকার অর্থ তত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। এই দুই প্রকার অর্থগ্রহণে সাধারণের প্রবৃত্তি হইবে না; কারণ তাহা হইলে কর্ম্মফলকে উড়াইয়া দিতে হয়।

শুভ্রতা বিশুদ্ধতার চিহ্ন। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন

"নহিজ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। গীতা ৪।৩৯

অর্থাৎ ইহজগতে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছুই নাই। অতএব জ্ঞান মার্গই শুক্লগতি এবং কর্ম্মমার্গ কৃষ্ণ গতি। জ্ঞানিগণ স্বর্গে যায় এবং কর্ম্মিগণ পুনঃ পুনঃ সংসারে আসে। ইহাতে কর্ম্মমার্গ অপেক্ষা জ্ঞানমার্গের প্রাধান্য লক্ষিত হয়, অর্থাৎ কর্ম্মমার্গ জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বুঝায়। কিন্তু কর্ম্মমার্গ জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম পরস্পর নিত্যসম্বন্ধ। জ্ঞান ভিন্ন ভক্তির বা অনুভূতির উদ্রেক হয় না এবং অনুভূতিই কর্ম্মের কারণ। আবার জ্ঞান ভিন্ন কর্ম্ম করা যায় না এবং কর্ম্ম না করিলে জ্ঞানের মার্জ্জনা হয় না। চুরি করা বা মিথ্যা কথা বলা পাপ জানিলেই কি মোক্ষ হইবে? জানিয়া সেই মত কার্য্য করিলে তবে মোক্ষলাভ হইবে। জনক ঋষি প্রভৃতি মহাত্মাগণ উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করিয়া নিষ্পাপ হইয়া

পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক খ না শিখিলে বোধোদয় পড়া যায় না তাহা বলিয়া ক খ শিক্ষা কি বোধোদয় শিক্ষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট? বরং ক খ শিক্ষার প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। ক খ শিক্ষা নিম্ন স্তরের এবং বোধোদয় শিক্ষা উচ্চ স্তরের এই পর্য্যন্ত। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি।" অর্থাৎ (জ্ঞানযুক্ত) কর্ম্ম দ্বারা তুমি কর্ম্মরূপ বন্ধ বা সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের মতে কর্ম্মই মোক্ষের হেতু অথবা জীব কর্ম্ম করিয়াই মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে কর্ম্ম জ্ঞান অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে; কর্ম্ম নিম্নস্তরের এবং জ্ঞান উচ্চস্তরের এই পর্য্যন্ত, ইহাদের মধ্যে ছোটবড় নাই।

বর্ত্তমান গ্রন্থে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—

একটী সরল রেখা অসংখ্য বিন্দু দ্বারা গঠিত হইয়াছে। আবার একটী সমতল ক্ষেত্র অসংখ্য সরল রেখা দ্বারা গঠিত হইয়াছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে একটী সমতল ক্ষেত্র অসংখ্য অসংখ্য বিন্দু লইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। যাহার মাত্র দৈর্ঘ্য ও বিস্তার আছে, তাহাকে সমতল ক্ষেত্র বলে। পথেরও দৈর্ঘ্য ও বিস্তার আছে। অতএব পথও যাহা সমতল ক্ষেত্রও তাহা। সমতল ক্ষেত্রটী সম্পূর্ণ হইবে যখন সমস্ত বিন্দুই পরস্পর সংলগ্ন থাকিবে। যেহেতু পথ বা গতিকে সমতল ক্ষেত্র বলা যাইতে পারে, পথটী সম্পূর্ণ হইবে যখন উহার অভ্যন্তরস্থিত বিন্দুগুলি পরস্পর সংলগ্ন থাকিবে এবং ঐ পথটীকে শুক্ল পথ বলা হইবে যখন সকল বিন্দুই শুক্ল হইবে, একটী মাত্র কৃষ্ণ বিন্দু থাকিলে উহাকে শুক্ল পথ বলা যাইতে পারে না। মনুষ্যের পথ অর্থে তাহার জীবন বুঝিতে হইবে। তাহার পথটী শুক্ল পথ হইবে যখন তাহার জীবনে একটীও কৃষ্ণ দাগ বা বিন্দু থাকিবে না অর্থাৎ তাহার সমস্ত দাগই শুক্ল হইয়া যাইবে।

অসংখ্য শুক্ল বিন্দুর বা দাগের সমাবেশের নাম শুক্ল গতি এবং কৃষ্ণ দাগের সমাবেশের নাম কৃষ্ণ গতি। যে মুহূর্ত্তে মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সাদা ও কাল দাগ পড়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং সাদা দাগ ও কাল দাগ পড়া চিরন্তন প্রথা। শুক্লবর্ণ বিশুদ্ধতা বা ধর্ম্মের চিহ্ন এবং কৃষ্ণবর্ণ অশুদ্ধতা বা অধর্ম্মের চিহ্ন। ধর্ম্ম শুভফলদায়ক এবং অধর্ম্ম অশুভফলদায়ক। প্রত্যেক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে একটী করিয়া সাদা দাগ অর্জ্জিত হয় এবং প্রত্যেক অসৎ কর্ম্ম বা নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে একটী করিয়া কাল দাগ অর্জ্জিত হয়।

কেহ একেবারে নিষ্কাম বা ভগবৎকর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না। মানুষ সকাম কর্ম্ম করিতে করিতে নিষ্কাম করিতে শিখে। তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির আহারও নিষ্কাম বা ভগবৎকর্ম্ম, কারণ আহার না করিলে তাহার দেহ থাকিবে না এবং দেহ না থাকিলে যাবতীয় ভগবৎকর্ম্ম সম্পন্ন হইবে না। নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া সমস্ত দাগই শুক্ল হইয়া গেলে তাহার পথটী বা জীবন সম্পূর্ণ হইবে, তখনই (নিষ্কামকর্ম্মজনিত) শুক্লদাগের কার্য্য (অনাবৃত্তি) হইবে বা জীবকে আর দেহ ধারণ করিতে হইবে না অর্থাৎ তাহার যাবতীয় কর্ম্ম শুভফলদায়ক (ভগবানে সাযুজ্য) হইবে। একটী মাত্র কাল দাগ থাকিলে, জীবকে আবার দেহধারণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি এই শুক্ল ও কৃষ্ণ দাগের বা পথের বিষয় সম্যক্ অবগত হয়েন, তিনি মোক্ষলাভেচ্ছু হওয়ায় কৃষ্ণদাগ অর্জ্জনে বিরত থাকিবেন, সুতরাং তিনি মোহপ্রাপ্ত হইবেন না। তাঁহার মোক্ষ অনিবার্য্য।

প্রত্যেক কর্ম্মে জ্ঞান, অনুভূতি বা ভক্তি এবং প্রকৃত কর্ম্ম আসিতেছে। জ্ঞান ব্যতিরেকে ভক্তির উদয় হয় না এবং ভক্তি না জন্মিলে কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি আসে না। আমাকে একজন অকথ্য ভাষায় গালি দিল; যতই ঐ গালির ভাষা আমার মনে উদিত হইবে, আমি ততই মুখ বিকৃত করিয়া

এবং হাত পা নাড়িয়া সেই লোকটীকে তিরস্কার করিতে থাকিব, এমন কি ভাষার ওজন বুঝিয়া তাহাকে প্রহার করিতে কুণ্ঠিত হইব না। সেই সময়ে আমি পরিণাম ভাবিবার অবসর পাইব না। সৎকর্ম্ম করিতে করিতে জ্ঞানের মার্জ্জনা (culture) জন্মে। জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত ভক্তিও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম নিত্যসম্বন্ধ। এই তিন লইয়াই গীতা। মোক্ষলাভের উপায় জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ।

যোগ শব্দের অর্থ অভিনিবেশও হইতে পারে। জ্ঞানযোগে জ্ঞানে সম্পূর্ণ অভিনিবেশ, ভক্তিযোগে ভক্তিতে সম্পূর্ণ অভিনিবেশ এবং কর্ম্মযোগে কর্ম্মে সম্পূর্ণ অভিনিবেশ বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক মানবশরীরে বায়ু, পিত্ত ও কফ বর্ত্তমান থাকে। কাহারও পিত্তের নাড়ী বলিলে তাহার নাড়ীতে বায়ু ও কফ নাই না বুঝিয়া বুঝিতে হইবে তাহার নাড়ীতে বায়ুও আছে এবং কফও আছে, তবে তাহাতে পিত্তের প্রাধান্য জন্মিয়াছে। সেইরূপ অমুক লোক জ্ঞানী বলিলে বুঝিতে হইবে তিনি কর্ম্মও করেন এবং তাঁহার ভক্তিও আছে, তবে তিনি জ্ঞানের চর্চ্চাই অধিক করিয়া থাকেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য মহাজ্ঞানী ছিলেন; তাঁহার ভক্তিও ছিল এবং তিনি যথেষ্ট কর্ম্মও করিয়াছিলেন। নিমাই পণ্ডিতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনের প্রাচুর্য্যও ছিল এবং সামঞ্জস্য ছিল। তিনের একাধারে সমাবেশ প্রায় কম লোকের দেখা যায়। ভক্ত ও কর্ম্মী অর্থে ঐরূপ বুঝিতে হইবে। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ এই তিন যোগই প্রশস্ত, তবে কর্ম্মযোগই অধিক প্রশস্ত ও সহজ। শ্রীভগবান্ কর্ম্মযোগীকেই অধিক উচ্চে স্থান দিয়াছেন।

"তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।" গীতা ৬।৪৬

কর্ম্মই মূল। কর্ম্মের দ্বারাই উচ্ছৃঙ্খল অনুরাশি সুনিয়ন্ত্রিত বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এই কর্ম্ম বেদ হইতে উদ্ভূত। বেদ ব্রহ্ম

হইতে উদ্ভূত। সুতরাং কর্ম্মের মূলে ব্রহ্ম (অব্যক্ত ও অচিন্ত্য শক্তি) রহিয়াছে।

"কর্ম্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।" গীতা ৩।১৫

পরে দেখান হইবে পরব্রহ্ম (কৃষ্ণ) হইতে ব্রহ্ম ও ভূতের প্রকাশ হইয়াছে। বেদ শব্দে জ্ঞান বুঝিলেও ক্ষতি নাই (বিদ্ জ্ঞানে); কর্ম্মের মূলে জ্ঞান থাকে। এই কর্ম্ম সাধারণ নহে; কর্ম্মে সৃষ্টি, কর্ম্মে স্থিতি ও কর্ম্মে লয়।

কোনও পদার্থকে ক্রমাগত ভাগ করিয়া গেলে, শেষে ইহা এমত অবস্থায় আসিয়া পড়ে, যখন উহাকে আর ভাগ করা যায় না। এই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম কণাকে পরমাণু (atom) বলে। দুইটী পরমাণু আকর্ষিণী শক্তিবলে একত্রীভূত হইয়া অণুতে পরিণত হয়। এই দুইটী পরমাণুর মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ফাঁক থাকে। আবার দুই বা ততোধিক অণু আণবিক শক্তির (molecular attraction) বলে একত্রীভূত হইয়া পদার্থে পরিণত হয়। পদার্থের এই অণুগুলির মধ্যে কিছু ফাঁক থাকে। পদার্থ বিশেষে এই ফাঁক কম বেশী হয়। নূতন মাটীর কলসীতে জল রাখিলে এই ফাঁকের (pores) সাহায্যে জল গড়াইতে থাকে। কাচে বা রবারে এই ফাঁক প্রায়ই থাকে না। দুই পদার্থ একই স্থান অধিকার করিতে পারে না। (Two things cannot occupy the same space). আমে ছুরী বসান যায়, কেন না আমের শাঁসের মধ্যে যে ফাঁক থাকে তাহার মধ্য দিয়া ছুরীখানি চলিয়া যায়। ইষ্টক নির্ম্মিত দেওয়াল নিরেট হইলেও উহার অণুর মধ্যে ফাঁক থাকে বলিয়াই একস্‌রে (X-Ray) নামক যন্ত্রের সাহায্যে ঘরের মধ্যে কি আছে তাহা বলিতে পারা যায়। ফাঁক থাকে বলিয়াই পদার্থকে অস্ত্র দ্বারা ছেদন করা যায়।

ব্রহ্মের অংশ আত্মা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বলিয়া ও পার্থিবাদি পদার্থ নহে বলিয়া উহাকে কেহ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিতে পারে না, আগুনে পোড়াইতে পারে না; জলে ভিজাইতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। অতি সূক্ষ্ম ও নির্গুণ বলিয়া ইহা কিছুতেই লিপ্ত হয় না। ইহা অমিত শক্তিমান্ ও ইচ্ছামত সকল পদার্থেই অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। ইহা সৎ, চিৎ ও আনন্দ। ইহার আকার বা রূপ না থাকিলেও ইহা জ্যোতির্ম্ময়, সম্ভবতঃ ইহা নীলাভ শ্বেতবর্ণের। জ্ঞানিগণ মনশ্চক্ষু দ্বারা ইহার স্বরূপ অবগত হয়েন। ইহার স্বরূপ অবগত হইলে, মানুষের অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে না। আত্মদর্শন হইলেও মানুষকে কর্ম্ম করিতে হয়। কর্ম্ম দ্বারাই জীব শুক্লপথ অর্জ্জন করিয়া শুক্লপথের সাহায্যে সংসাররূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়।

"আমি ভক্তের তরে ঘাটে ঘাটে বেয়ে বেড়াই ভাঙ্গা তরী।
ভক্তি ভরে ডাক্‌লে পরে এই ভাঙ্গা নায়ে পার করি॥

যে নদীর কুল কিনারা নাই, এই ভাঙ্গা তরী সেই নদীতে ঘুরিয়ে নে' বেড়াই;
(আবার) বাতাস পেলে দি পাল তুলে, রাধা ব'লে পাড়ি মারি॥"

যাহার জীবনে সমস্ত দাগই সাদা হইয়া যাইবে, ভগবান তাহাকেই পার করিয়া থাকেন; সুতরাং সেই অবস্থায় জীব ভগবানের দর্শন পায়; একটী কাল দাগ থাকিতে জীব তাঁহার দর্শন পায় না।

অনুমানের সাহায্যে বুঝা যায় বিশ্বের সৃষ্টির পূর্ব্বে পবব্রহ্ম (কৃষ্ণ) ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

"কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দঃ ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"

একমেব দ্বিতীয়ং নাস্তি। এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। এই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে শক্তি ও ভূত সবই ছিল। এক হইতে দুইএর প্রকাশ—পুরুষ (ব্রহ্ম বা অব্যক্ত ও অচিন্ত্য শক্তি) এবং প্রকৃতি (বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা ক্ষিত্যপ্‌তেজঃমরুৎ ব্যোম)। এই ব্রহ্ম বা অব্যক্ত শক্তি নিশ্চল ও নির্ব্বিকার।

"ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং,
ত্বমেকং জগৎ পালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃপ্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥" মহাতন্ত্রনির্ব্বাণম্

প্রকৃতি শক্তিশূন্য পরমাণু অবস্থায় ছিল। পরস্পর পরমাণুর মধ্যে সদ্ভাব (affinity) ছিল না। সমস্তই কুয়াশার মত ছিল। সোণা, রূপা ইত্যাদি যাবতীয় পদার্থ পরমাণু অবস্থায় ছিল। তখনও যাহা ছিল, এখনও তাহা আছে এবং চিরকাল তাহাই থাকিবে। পদার্থসমূহের কেবল রূপান্তর হইতেছে মাত্র। পরব্রহ্ম বা কৃষ্ণ হইতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নূতন করিয়া সৃষ্ট হইতে পারে না। ভূমিকম্প নামক প্রাকৃতিক ঘটনায় পৃথিবীর কোন স্থান ভূগর্ভে বসিয়া যায়, আবার কোন স্থান উত্তোলিত হইয়া থাকে। বিশ্বের এই ক্ষতি-পূরণ-প্রথা (compensation policy) সর্ব্বত্রই বিরাজমান।

ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্ব্বিকার অবস্থায় ছিলেন এবং প্রকৃতি উচ্ছৃঙ্খল ও নির্জীব অবস্থায় ছিল। হঠাৎ ব্রহ্মের লীলা করিতে ইচ্ছা হইল। লীলা অর্থে খেলা বুঝায়। খেলা ত একা হয় না। সুতরাং পরব্রহ্ম যেমন ব্রহ্ম ও ভূতে বিভক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রহ্ম নিজ হইতে অসংখ্য অংশে বিভক্ত হইলেন। ইহাতে ব্রহ্মের হ্রাস হইল না, কারণ

অসীম+যাহা কিছু=অসীম

অসীম−যাহা কিছু=অসীম ।

এই অসংখ্য অংশের প্রত্যেকটী আত্মা। যেহেতু ব্রহ্ম শক্তি, অংশ আত্মাও শক্তি। ব্রহ্ম নির্গুণ, অংশ আত্মাও নির্গুণ। যেমন তার না থাকিলে বিদ্যুৎ চলাচল করিতে বা কার্য্য করিতে পারে না, সেইরূপ আবরণ বা দেহ না পাইলে শক্তির কার্য্য করিবার বা খেলা করিবার ক্ষমতা থাকে না; সুতরাং ব্রহ্ম নির্জীব পরমাণু রাশিতে দৃষ্টি দিলেন বা শক্তি সঞ্চার করিলেন। তৎক্ষণাৎ পরস্পর পরমাণুর মধ্যে সদ্ভাব আসিয়া জুটিল। পরমাণু হইতে অণু সৃষ্ট হইল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্ষিত্যপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম সমন্বিত বিশাল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইল। এই পাঞ্চ ভৌতিক পদার্থ আত্মাকে বেষ্টন করায় যাবতীয় জীবের উৎপত্তি হইল। ইহাই কর্ম্মে সৃষ্টি। তরু, লতা, বৃক্ষ, কৃমি, সরীসৃপ, পক্ষী, গবাদি পশু, ব্যাঘ্রাদি শ্বজাতীয় জীব, বানর, মানুষ একসঙ্গেই ব্রহ্মের ইচ্ছায় সৃষ্ট হইল। প্রত্যেক জীবের বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক, সুতরাং খাদ্যের ব্যবস্থা হইল, পীড়ার জন্য ঔষধের ব্যবস্থা হইল। ইহাই কর্ম্মে স্থিতি ধ্বংস না হইলে লীলাকার্য্যের সুবিধা হয় না; এইজন্য লয়ের ব্যবস্থাও হইল। ইহাই কর্ম্মে লয়। এক ব্রহ্মের তিন প্রকার ক্রিয়া (function) হইল। প্রথমটী রজোগুণে ব্রহ্মা, দ্বিতীয়টী সত্ত্বগুণে বিষ্ণু এবং তৃতীয়টী তমোগুণে মহেশ্বর।

ব্রহ্ম এই সকল জীবাত্মাকে বলিলেন "তোমাদিগকে লীলা করিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক সবই দিলাম; এমন কি আমি নিজে অংশরূপে তোমাদের মধ্যে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বদাই শুক্লপথ অর্জ্জন করিবার পরামর্শ দিতে থাকিব। শয়তান বা ষড়রিপুর প্রলোভনে না ভুলিয়া আমার লীলাকার্য্য সম্পাদন করিয়া অতি শীঘ্র আমার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া আমাতে মিলিত হইও। দেখিও আমাকে বা নিজকে ভুলিও না।"

জীবসকল রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শবিশিষ্ট পঞ্চ ভূতের বিষয়ভোগে মত্ত হইয়া মহা আনন্দে কর্ম্ম করিতে লাগিল। মদ্য পানে মানুষ যেমন আত্মহারা হইয়া যায়, সেইরূপ জীব নিজ উদ্দেশ্য ও নিজকে ভুলিয়া গিয়া দেহ ও ইন্দ্রিয়কেই 'আমি' মনে করিয়া ফেলিল এবং যাহাতে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের আরাম বোধ হয় তাহাই তাহার প্রধান লক্ষ্য হইল। চিহ্নিত বিন্দুকে আঁকড়াইতে গিয়া সে ক্রমাগত কাল দাগ অর্জ্জন করতঃ পুনঃ পুনঃ জন্ম লইতে লাগিল। ইহাতে লীলাকার্য্যের অযথা বিলম্ব হইতে লাগিল। বহু লক্ষ বৎসর পরে হয়ত একটী আত্মা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া এমন কর্ম্ম করিল যে ঐ আত্মাতে একটীও কাল দাগ পড়িল না অর্থাৎ তাহার সমস্ত জীবন বা পথটী সাদা হইয়া গেল, তখন সেই আত্মা পুনর্জন্ম হইতে অব্যাহতি পাইয়া ব্রহ্মে লীন হইল। সুতরাং বিশ্বে একটী আত্মা কমিয়া গেল। এইরূপে বহু লক্ষ বা অসীম বৎসরান্তে যখন সমস্ত আত্মাই ব্রহ্মে লীন হইবে, তখনই ব্রহ্মের লীলার অবসান হইবে। তখন আর শক্তিযুক্ত বিশ্বের প্রয়োজন হইবে না ; সুতরাং ব্রহ্ম প্রকৃতি হইতে শক্তি কাড়িয়া লইবেন। শক্তির অভাবে প্রকৃতি আবার সৃষ্টির পূর্ব্বে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল পরমাণু অবস্থায় আসিবে। মুহূর্ত্তমধ্যে পৃথিবী জলময় হইবে, সমস্ত জল তেজে পরিণত হইবে, পরে মরুৎ, পরে ব্যোমমাত্র থাকিবে এবং অবশেষে যাবতীয় পদার্থ শক্তিহীন উচ্ছৃঙ্খল পরমাণু অবস্থায় থাকিয়া কুয়াশার মত দেখাইবে। কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে ব্রহ্ম ও প্রকৃতি তাঁহাতে মিশিয়া যাইবে। আবার 'একমেব দ্বিতীয়ং নাস্তি' হইবে। এইরূপে কর্ম্ম দ্বারাই বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংস হইয়া আসিতেছে।

কর্ম্ম তিন প্রকার—কর্ম্ম, অসৎ কর্ম্ম বা বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম বা কর্ম্মশূন্যতা। যেমন গন্ধ বলিলে সদ্‌গন্ধ এবং পুত্র বলিলে সৎ পুত্র বুঝিতে হয়, সেইরূপ কর্ম্ম অর্থে সৎকর্ম্ম বুঝায়। যে কর্ম্ম করিলে দেহ, মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধন হয় তাহাকে কর্ম্ম বলে। যে কর্ম্ম করিলে দেহ, মন ও আত্মার অপকর্ষ

বা অবনতি হয় তাহাকে বিকর্ম্ম বা শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম্ম বলে; যথা সুরাপান, পরদারগমন, পরদ্রব্য অপহরণ, আত্মহত্যা, নরহত্যা ইত্যাদি। কর্ম্ম না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকার নাম অকর্ম্ম।

কর্ম্ম আবার দুই ভাগে বিভক্ত—সকাম ও নিষ্কাম। সকাম কর্ম্মে কোন না কোন স্বার্থ থাকিবে। বিষ্ণু বা জনসাধারণের প্রীতির জন্য কর্ম্মের নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। যেমন সাকার ভগবানের উপাসনা আরম্ভ না করিয়া কেহ একেবারে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সকাম কর্ম্ম করিতে আরম্ভ না করিলে কেহ নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না।

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।" গীতা ৩,৪

একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় মানুষ ভালবাসে নিজেকে এবং নিজের সুবিধাকে। কেহ স্ত্রীকে স্ত্রীর জন্য ভালবাসে না। স্ত্রীবিয়োগ হইলে সে শোক করে, কেননা সে মনে করে স্ত্রী থাকায় তাহার যে সব সুবিধা হইতেছিল স্ত্রীবিয়োগে সে-সব সুবিধা সে আর পাইবে না এবং স্ত্রীর মৃত্যুর সময়ে সে মনে করে সে শোক যাইবার নহে; কিন্তু পরে সে যখন দেখে সেই সব সুবিধা অন্য দিক দিয়া আসিতে পারে বা আসিতেছে, তখন সে স্ত্রীকে ভুলিয়া গিয়া পুনরায় দারপরিগ্রহ করে। উদ্ভ্রান্ত প্রেম লেখক ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। সেইরূপ পুত্র হইতে অনেক প্রকার সুবিধা পাইবার আশায় (বা মোহে) লোকে পুত্রকে ভালবাসে। আবার টাকাকে কেহ টাকার জন্য ভালবাসে না। আমার লৌহসিন্ধুকে দশ হাজার টাকা আছে। ডাকাত আসিয়া আমাকে বাঁধিয়া সিন্ধুকের চাবি কাড়িয়া লইয়া টাকাগুলি লইয়া প্রস্থান করিল। আমার দারুণ শোক হইল; টাকাগুলির জন্য নহে। ঐ টাকাগুলি থাকিলে আমার যে সব সুবিধা হইত বা প্রয়োজন সিদ্ধ হইত,

টাকাগুলি যাওয়াতে আমার সেই সব প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না, এই চিন্তায় বা আশঙ্কায়ই আমার শোক হইল।

এক সাধুর আশ্রমে কতকগুলি ত্যাগী এবং একজন গৃহী শিষ্য ছিল। গৃহস্থাশ্রমে অধিক সুখ কিম্বা ত্যাগে অধিক সুখ এই লইয়া তর্ক উঠিলে ত্যাগীরা যুক্তি দেখাইল তাহাদের কোনও উপদ্রব নাই, ছেলেপিলেদের ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্ নাই, সর্ব্ব বিষয়ে তাহারা নিশ্চিন্ত। গৃহী বলিল "ভাই সব, তোমরা গৃহস্থাশ্রমের সুখে বঞ্চিত তাই ওরূপ বলিতেছ। পরিজনের কী প্রাণঢালা ভালবাসা, কী আন্তরিক যত্ন ও সেবা! তাহা অনুভব করিলে প্রাণে বাস্তবিকই শান্তি আসে। সে শান্তি তোমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।" তর্কের মীমাংসা হইল না। সাধুর কর্ণে ইহা উঠিলে, তিনি গৃহীকে বলিলেন "বাপুহে, তুমি যে গৃহস্থাশ্রমের সুখের এত বড়াই করিতেছ তাহা সম্পূর্ণ অলীক, ইহা আমি তোমাকে অদ্যই বুঝাইয়া দিব। তুমি সন্ধ্যার সময়ে গৃহে যাইয়া পীড়ার ভাণ করিবে এবং বৈদ্যেরা কিছুই করিতে না পারিলে তুমি তোমার পরিজনকে বলিবে যেন আমাকে লইয়া যায়, আমি যাইয়া যাহা করিতে হয় করিব।" সেইমত কার্য্য হইলে গৃহীর পরিজন অত্যন্ত ভীত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া সাধুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "হে গুরো, বলুন কি করিতে হইবে, আমরা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নহি।" তখন সাধু গৃহীর নাড়ী অনুভব করিয়া বলিলেন "উৎকট রোগের উৎকট ঔষধের আবশ্যক; তবে প্রাণ দিতে হইবে না, প্রাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র জিনিষ চাই, অর্থাৎ মনুষ্যের এক সের রক্ত মন্ত্রপূত করিলেই গৃহী প্রাণ পাইবে।" এই বলিয়া তিনি গৃহীর পত্নীকে বলিলেন "মা, তুমি শীঘ্র রক্ত দাও, বিলম্বে প্রাণ বাহির হইয়া গেলে কোন ফল হইবে না।" গৃহীর পত্নী ভাবিল "এক সের রক্ত শরীর হইতে বাহির হইলে আমি যে মরিয়া যাইব না তাহার কোন প্রমাণ নাই; অধিকন্তু বৃদ্ধত আজ না হয় কাল মরিবেই; আমি পুত্রকন্যাদি লইয়া আমার সুখের ব্যাঘাত ঘটিতে দিব কেন?"

সুতরাং গৃহীর পত্নী নিশ্চেষ্ট রহিল। তখন সাধু পুত্রকে বলিলেন "বাবা, তুমি রক্ত দাও, নচেৎ তোমার বাবা মরিয়া যাইবে।" পুত্র ভাবিল "আমার এই নবীন বয়স, আমার সুখভোগের আরম্ভই হয় নাই; কেন প্রাণ দিতে যাইব? অধিকন্তু বাবার নিকটে বাক্সের চাবি থাকে, একটী পয়সা চাহিলে বাবা দিতে চায় না। বাবা মরিয়া গেলে আমি সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া ইচ্ছামত খরচ করিতে পাইব।" পুত্রকে নিরুত্তর দেখিয়া সাধু গৃহীর কন্যাকে বলিলেন "বাছা, তুমি রক্ত দিয়া পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাও।" কন্যা ভাবিল "বাবা আমাকে পরগোত্র করিয়া দিয়াছে, মা ও ভাই রক্ত দিল না, আমি রক্ত দিয়া প্রাণে মরিয়া স্বামীশ্বশুরের ও পুত্রকন্যার অসুবিধা করিয়া দিতে যাইব কেন?" যখন কন্যা রক্ত দিল না, তখন সাধু গৃহীর কাণে কাণে বলিলেন "দেখিলে বাপু, আন্তরিক ভালবাসা কাহারও নাই। ইহারা তোমাকে চায় না, তোমার দ্বারা উহাদিগের যে সব সুবিধা হয়, উহারা সেইটুকুই চায়।"

কোন সময়ে এক উলঙ্গ সন্ন্যাসী কোন গ্রামের প্রান্তভাগে শ্মশানক্ষেত্রে ত্রিশূল গাড়িয়াছিলেন। তিনি কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। সন্ন্যাসীকে দর্শন করিবার মানসে বহুসংখ্যক লোক কাতারে কাতারে আসিতে লাগিল এবং সন্ন্যাসীর আহারের জন্য খাদ্য সরবরাহ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী খাদ্যদ্রব্য স্পর্শও করিতেন না। যখন জানা গেল সন্ন্যাসী বাস্তবিকই আহার না করিয়া তিন চারি মাস বাঁচিয়াছিলেন তখন জনসাধারণের ভক্তি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যদিও তাহারা সন্ন্যাসীর মুখনিস্থত মধুর উপদেশ শ্রবণ করিবার নিমিত্তই আসিত এবং সন্ন্যাসী কাহারও সহিত কথা কহিতেন না, তথাপি এবম্ভূত সন্ন্যাসীকে দর্শন করিলেও মহাপুণ্য এই ধারণায় বহু লোক শ্মশানক্ষেত্রে সমাগত হইত।

সেই দেশের রাজার মন্ত্রী একদিন রাজাকে বলিলেন "মহারাজ, অমুক গ্রামে এক উলঙ্গ ও মৌনী সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, একবার তাঁহাকে দর্শন

করিলেন না।" রাজা সন্ন্যাসীকে দর্শন করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং শুভ দিন ও ক্ষণ স্থির করিলেন। রাজা যাত্রা করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "মহারাজ, ভক্তের ইচ্ছা ভগবান পূরণ করেন; আপনাকে আর আমার নিকটে যাইতে হইবে না, আমিই দর্শন দিতে আসিলাম।" রাজা যারপর নাই বিস্মিত হইলেন ও ভাবিলেন সন্ন্যাসী তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসীকে নিজ সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন ও তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসী রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসী প্রায়ই রাজাকে দর্শন দিতেন ও আশীর্ব্বাদ করিতেন।

একদিন সন্ন্যাসী বলিলেন "মহারাজ, অদ্য বৃহস্পতিবার, আগামী বৃহস্পতিবারের বেলা দুইটার সময়ে আপনার একটী পুত্র জন্মিবে।" মহারাণী সন্তানসম্ভাবিতা ছিলেন এবং সন্ন্যাসীকথিত নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটী পুত্র প্রসব করিলেন। সন্ন্যাসীর প্রতি রাজার ভক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপে সন্ন্যাসী প্রায়ই রাজার নিকটে আসিতেন এবং ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রয়োগ করিতেন, যাহা সত্যে পরিণত হইত। ক্রমে সন্ন্যাসী রাজকার্য্য সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্‌বাণী বলিতেন এবং সেগুলিও সত্যে পরিণত হইয়া যাইত। ইহাতে মন্ত্রীর ভাবনা উপস্থিত হইল। তিনি মনে করিলেন সন্ন্যাসী রাজকার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে থাকিলে তাঁহার চাকুরীর আবশ্যকতা নাও থাকিতে পারে। তিনি তখন সন্ন্যাসীকে কুপথে লইবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন যাহাতে সন্ন্যাসীর প্রতি রাজার ভক্তি কমিয়া যায়। শ্মশানক্ষেত্র হইতে রাজবাড়ী আসিবার পথে হরিদাসী নাম্নী এক বারাঙ্গনা বাস করিত। মন্ত্রী হরিদাসীকে এক সহস্র মুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিয়া বলিলেন "যেমন করিয়া হউক সন্ন্যাসীকে পদস্খলিত করিতে হইবে।" একদিন সন্ন্যাসী রাজাকে দর্শন দিতে যাইতেছেন এমন সময়ে হরিদাসী বেশভূষা করিয়া

সন্ন্যাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে প্রণত হইয়া বলিল "প্রভো, একবার দয়া করিয়া অধমার গৃহে পদধূলি দিবেন না?" সন্ন্যাসী বলিলেন "ভক্তের মনোবাঞ্ছা ভগবান পূরণ করেন, চল আমি যাইতেছি।" সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া হরিদাসীর সহিত কথা কহিয়া রাজার নিকটে গেলেন। এইরূপে সন্ন্যাসী প্রত্যহ হরিদাসীর বাড়ীতে যাইতেন। মন্ত্রী গোপনে হরিদাসীর নিকটে সন্ধান লইতে ভুলেন নাই। একদিন হরিদাসী বলিল "মন্ত্রী মহাশয়, এই লউন আপনার এক সহস্র মুদ্রা; আমি বহুপ্রকার মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিলাম, কিন্তু আমি সন্ন্যাসীকে কুপথে লইয়া যাইব কি, সন্ন্যাসীই আমাকে সুপথে লইয়া যাইতেছেন। এই সন্ন্যাসী সাধারণ সন্ন্যাসী নহেন, উঁহার দিকে তাকান ভার। আপনার অনুগ্রহে আমি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছি; সুতরাং আপনাকে বহু ধন্যবাদ।" মন্ত্রী কিন্তু ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। বিশেষ সন্ধান রাখিয়া মন্ত্রী জানিলেন অমুক দিনের অমুক সময়ে সন্ন্যাসী হরিদাসীর গৃহে থাকিবেন। তিনি রাজাকে সঙ্গে লইয়া হরিদাসীর বাড়ীর নিকটে আসিয়া অলক্ষ্যে রাজাকে সন্ন্যাসীর কার্য্যকলাপ দেখাইলেন। রাজা সন্ন্যাসীকে হরিদাসীর বাড়ীতে তাহার সহিত অবাধে কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া সন্ন্যাসীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া গোপনেই গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসীও রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন। এদিনে রাজা সন্ন্যাসীকে কোনরূপ সম্ভ্রম দেখাইলেন না। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন "রাজন্, আজ আপনাকে এত বিমনা দেখিতেছি কেন? কোন অমঙ্গল ঘটে নাই ত?" রাজা বলিলেন "না, কোন অমঙ্গল ঘটে নাই; আমি আপনার বিষয়ই ভাবিতেছিলাম। আপনার আগমনের বিলম্ব দেখিয়া আমি চিন্তিত হইয়াছিলাম। বাস্তবিকই আপনাকে দেখিলে আমার আনন্দ হয়, আপনি এখান হইতে চলিয়া যাইবেন না ত? আমি ইচ্ছা করি, আপনি চিরকালই এইখানে থাকুন।" তদুত্তরে সন্ন্যাসী বলিলেন "রাজন্, আপনার

মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে আপনি মনের ভাব গোপন করিতেছেন। আপনার প্রকৃত মনের ভাব আমি একদিন প্রকাশ করিব ; আজ নহে। যাহা হউক আমি যে জন্য আজ আপনার নিকটে আসিয়াছি তাহাই আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। অদ্য মঙ্গলবার, আগামী মঙ্গলবারের বেলা ১২টার সময়ে আপনার মৃত্যু হইবে ; আপনি সেই মত ব্যবস্থা করিবেন। আপনি বোধ হয় আমার আর দর্শন পাইবেন না ; আমি অন্য এক ভক্ত পাইয়াছি ; এখন হইতে আমি তাহার নিকটে গমনাগমন করিব।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

রাজা এইরূপ অপ্রত্যাশিত বচনে অত্যন্ত ভীত ও বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি মন্ত্রীকে সকল কথা বলিয়া তাঁহার পরামর্শ চাহিলেন। মন্ত্রী মহাশয় বলিলেন "মহারাজ এই সন্ন্যাসী যখন যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য হইয়াছে, সুতরাং বর্ত্তমান বাণীও যে সত্য হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? আমার শেষ অনুরোধ যাহাতে আমি আপনার অবর্ত্তমানে আপনার পুত্রের রাজত্বে মন্ত্রী হইয়া থাকিতে পারি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেইরূপ লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিন।" রাজা অন্দর মহলে রাণীদিগের নিকটে গমন করিয়া তাঁহার মৃত্যুর কথা বলিলেন এবং উপস্থিত তাঁহার কর্ত্তব্য কি তাহা জানিতে চাহিলেন। রাণীরাও বলিলেন "মহারাজ তাইত বড় ভাবনার কথা ; এই সন্ন্যাসী সাধারণ নহেন ; ইনি যখন যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট দিবসে আপনার মৃত্যু হইবে ইহা সুনিশ্চিত ; অতএব আপনি এ সময়ে আমাদিগের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া যান। সুবন্দোবস্ত না করিলে আপনার মৃত্যুর পরে নানারূপ গোলোযোগ উপস্থিত হইতে পারে।" এই বলিয়া তাঁহারা রাজার সমীপে আপন আপন কাগজ দাখিল করিয়া তাহাতে স্বাক্ষরিত করিতে রাজাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

রাজা ভাবিলেন "আমি নিজের যন্ত্রণায় মরিতেছি, আমি ইহাদের কাছে সান্ত্বনা পাইবার আশায় গেলাম ; ইহারা নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। ইহাতে

আমার যন্ত্রণা আরও বাড়িতেছে।” তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া নির্জ্জন গৃহে ছয় দিন ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতেছিলেন। মঙ্গলবারের প্রত্যুষে তিনি মমতাশূন্য হইয়া মন্ত্রী ও রাণীদিগের কাগজে স্বাক্ষর করিয়া কৌপীণ ধারণ করিয়া নিকটবর্ত্তী অরণ্যে বসিয়া শ্রীভগবানের চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার চক্ষু দুইটী কোটরগত হইয়াছে এবং তাঁহার দেহে লাবণ্য ছিলনা। বেলা এগারটার সময়ে রাজা হঠাৎ দেখিলেন সন্ন্যাসী তাঁহার সম্মুখে। তিনি গদগদচিত্তে তাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন “প্রভো, আমি ধন্য হইলাম; মৃত্যুর সময়ে আপনার দর্শন পাইয়া আমি নিজকে অতীব সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি। আপনি আমার গুরুর গুরু তস্য গুরু। আমি বুঝিয়াছি আপনি সাক্ষাৎ ভগবান, তিন চারি মাস আহার না করিয়া কোন মানুষই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। আমি পূর্ব্ব জন্মে নিশ্চয়ই অনেক সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছিলাম, তাই বোধ হয় আপনি আমার উদ্ধারের নিমিত্ত মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া আমাকে দর্শন দিয়াছেন; আপনি দয়া করিয়া আর আধ ঘণ্টা আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকুন; আমি আপনাকে দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ করি।”

সন্ন্যাসী বলিলেন “রাজন্, কি বুঝিলে?” রাজা বলিতে লাগিলেন “এতদিন রাজভোগে থাকিয়া আমি সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে পারি নাই; এক্ষণে বুঝিয়াছি মৃত্যুই মানুষের পরম বন্ধু। মৃত্যু না থাকিলে মানুষ যথেচ্ছাচারী হইত। মৃত্যু যাহার শিয়রে থাকে, সে কি অকার্য্য করিতে পারে? স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি সকলে নিজের স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। আমি তাহাদের নিকটে আমার কি কর্ত্তব্য তাহাই জানিতে গেলাম, তাহাদিগের সে দিকে লক্ষ্য নাই। তাহারা নিজের স্বার্থ লইয়া আমাকে এত পীড়াপীড়ি করিয়াছে যে তাহাতে আমার মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে।”

সন্ন্যাসী বলিলেন "রাজন্, আপনি নিজমুখে স্বীকার করিলেন মৃত্যু যাহার শিয়রে সে কি অকার্য্য করিতে পারে? আমি সন্ন্যাসী, আমার কোন টানই নাই; আমি মৃত্যুকে শিয়রে রাখিয়াছি বলিতে পারি। হরিদাসীর বাড়ীতে আমাকে দেখিয়া আপনি আমার চরিত্রে সন্দিহান হইয়াছিলেন। হরিদাসী আমার অতীব প্রিয়, কারণ সে প্রধানা ভক্তা। যাহা হউক রাজন্, এক্ষণে যদি বলি আপনার আরও দেড় শত বৎসর পরমায়ু হইবে, আপনি কি করেন?" রাজা বলিলেন "না প্রভো, ও অনুগ্রহ আর করিবেন না। বাঁচিয়া থাকায় যে লাভ তাহা আমি আপনার অনুগ্রহে পাইয়াছি। আপনি সাক্ষাৎ ভগবান ইহাতে আমি অনুমাত্রও সন্দেহ করি না; মানুষ লক্ষ লক্ষ বৎসরে বা জন্মে যে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় না আমি সামান্য সময়ে আপনার নিকট হইতে সেই জ্ঞান পাইয়াছি, অতএব আমার আর বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি থাকিতে পারে?" এই কথা বলিতে বলিতে এবং সন্ন্যাসীকে দর্শন করিতে করিতে রাজা প্রাণত্যাগ করিলেন।

দেখা গেল মানুষ নিজেকে ও নিজের সুবিধাকেই ভালবাসে। এই সুবিধা বা প্রয়োজন নানা উপায়ে সিদ্ধ হইয়া থাকে। মুদ্রার বিনিময়ে সমুদায় প্রয়োজনই সিদ্ধ হইতে পারে; এইজন্যই মুদ্রার নাম অর্থ। তাহা হইলেই হইল মানুষ নিজের দেহকে ও টাকাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে। দেহে প্রগাঢ় আসক্তি ও অর্থে অযথা স্পৃহা এই দুইটী ষড়রিপুর প্ররোচনায় হইয়া থাকে। যেহেতু ষড়রিপু মোক্ষের অন্তরায় দেহে আসক্তি ও অর্থে স্পৃহা এই দুইটীই মোক্ষের অন্তরায়। এই দুইটীতে অনাস্থা না জন্মিলে মোক্ষের উপায় নাই। সাধারণতঃ দেখা যায় স্ত্রীলোকদিগের দেহে আসক্তি ও অর্থে স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী। একজন স্ত্রীলোক সাবিত্রী ব্রত আরম্ভ করিল। চৌদ্দ বৎসর অন্তে ব্রত উদ্‌যাপন হইলে তাহাকে বৈধব্য যন্ত্রণা পাইতে হইবে না, ইহাই তাহার কামনা। সুতরাং আরব্ধ কর্ম্মটী সকাম। এই

কর্ম্মটী করিতে হইলে তাহাকে প্রতি বৎসরে তিন দিন উপবাস করিতে হয় এবং দক্ষিণা ও দ্রব্যাদি সংগ্রহে দেড় শত টাকার অধিক খরচ করিতে হয়। উপবাস অর্থে শরীরকে ক্লেশ দেওয়া। এইরূপে ক্রমাগত উপবাস করায় তাহার শরীরের প্রতি অনাস্থা আপনিই আসিবে এবং যে অর্থকে সে এত ভালবাসে চৌদ্দ বৎসরে দুই হাজার টাকার অধিক খরচ করায় তাহার সেই অর্থেও অনাস্থা আসিবে। সকাম কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া সে নিষ্কাম কর্ম্ম শিখিতে আরম্ভ করিবে। অনেকে স্বর্গ পাইবার ইচ্ছায় অনেক বিহিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন; তাহাতে লাভ হয় এই যদিও তাহারা স্বর্গ পায় না (কারণ স্বর্গ বলিয়া কোনও জিনিষ নাই) সকাম কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া তাহারা নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে শিখিয়া মোক্ষের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ইতর যোনিতে ভ্রমণ করার নাম নরকভোগ এবং উচ্চ মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণের নাম স্বর্গভোগ।

অগ্রে ভাষা পরে ব্যাকরণ। ভাব প্রকাশের জন্য ভাষার আবশ্যক। পরে ভাষাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ব্যাকরণের সৃষ্টি হইল। ভাষা ভিন্ন ব্যাকরণ থাকিতে পারে না, আবার ব্যাকরণ ভিন্ন ভাষা ভাবশূন্য। সেইরূপ অগ্রে কর্ম্ম পরে ধর্ম্ম। কর্ম্মকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ধর্ম্মের সৃষ্টি। ধর্ম্ম ভিন্ন কর্ম্ম কর্ম্মই নহে বিকর্ম্ম। ইহা ব্যাকরণহীন ভাষার ন্যায়। কর্ম্মহীন ধর্ম্মও প্রকৃত ধর্ম্ম নহে, লোক দেখান ধর্ম্ম। ইহা ভাষাহীন ব্যাকরণের ন্যায়।

নাস্তিক চূড়ামণি চার্ব্বাক বলিয়াছেন "ভাই সব, ভগবান বলিয়া কোনও জিনিষ নাই; পরকাল নাই। মৃত্যুর পরে আর কিছুই থাকে না; দেহ পঞ্চভূতের সহিত মিশিয়া যায়। মরা গরু ঘাস খায় না। স্বার্থপর ব্রাহ্মণগণ নিজ স্বার্থের জন্যই পরকালের ভয় দেখাইয়াছেন। দেহই আসল জিনিষ; ইহাকে সর্ব্বদাই প্রাণপণে যত্ন করিও। যতদিন বাঁচিবে সুখে বাঁচিবার চেষ্টা করিবে। অপরের জন্য ভাবিবার প্রয়োজন নাই, তুমিই সব।" ইত্যাদি।

আমরা ভগবান কখনও দেখি নাই এবং কেহ মরিয়া ফিরিয়া আসে নাই।

"That unknown country from whose bourne no traveller returns. Shakes.

যদি চার্ব্বাকের মতই মানিয়া লইতে হয়, তবে জগতের অবস্থা কি হইতে পারে, তাহা ভাবিলেও আমাদিগকে শিহরিয়া উঠিতে হয়। মানুষ অধার্ম্মিক ও উচ্ছৃঙ্খল হইলে, তাহার নিজের এবং সমাজের সমূহ ক্ষতি।

ধর্ম্মহীন কর্ম্ম এবং কর্ম্মহীন ধর্ম্ম উভয়ই পশুর সমান।

এক ব্যক্তি সমস্ত দিন তপ জপ করেন, আতপ চাউলের অন্ন খান ইত্যাদি। পথিমধ্যে একদিন তিনি দেখিলেন একখানি গোগাড়ী কর্দ্দমে পতিত আছে। চালক প্রাণপণে বলদদ্বয়কে সাহায্য করা সত্ত্বেও গাড়ীখানি কর্দ্দম হইতে উঠিতে পরিতেছে না। চালক পূর্ব্বোক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার সাহায্য চাহিল। মানের হানি হইবে ভাবিয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তি সাহায্যদানে স্বীকৃত না হইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। ভগবৎ কর্ম্মে অবহেলা করায় তাঁহার যাবতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মহীন হইয়া পণ্ডশ্রম হইল। আবার কর্ম্ম সকলেই করে; কিন্তু সাধারণ লোকে দগ্ধ উদরের জন্যই কর্ম্ম করে বলিয়া তাহাদের কর্ম্ম ধর্ম্মহীন।

মনে করুন একটী বৃত্ত অঙ্কিত করা হইল। এই বৃত্তের মধ্যে অসংখ্য বিন্দু আছে; তন্মধ্যে একটী বিন্দুকে চিহ্নিত করিলাম। এই চিহ্নিত বিন্দুটীই আমার আহার ও বিহার বা আমার নিজের সুবিধা ও সুখসাচ্ছন্দ্য। চিহ্নিত বিন্দু ব্যতীত যাবতীয় বিন্দু ভগবৎকর্ম্মজ্ঞাপক। এই কর্ম্মগুলি করিবার জন্যই আমার ভবে আসা; কিন্তু এই সকল কর্ম্ম করিতে গেলে আমার বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক। অতএব আহার প্রাণধারণের জন্য কিন্তু প্রাণধারণ আহারের জন্য নহে। প্রাণধারণ বৃত্তমধ্যস্থিত অসংখ্য বিন্দু বিযুক্ত চিহ্নিত বিন্দু। ভগবৎকর্ম্ম করিলেই সাদা দাগ অর্জ্জন করা যায় এবং

এইরূপ কর্ম্ম করিবার জন্যই আত্মা সর্ব্বদাই পরামর্শ দেয়। কেবল আহার ও বিহার এবং তজ্জন্য যে যে কর্ম্ম তৎসমুদায় সাধারণ লোকের পক্ষে ভগবৎকর্ম্ম নহে। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে জীব চিহ্নিত বিন্দুকে আঁকড়াইয়া থাকে। যতদিন সে চিহ্নিত বিন্দুকে আঁকড়াইতে থাকিবে, ততদিন তাহার অভাব যাইবে না, তাহার 'হাহা' বাড়িতেই থাকিবে। সকলেই জানে কাহাকে কিছু দান করিলে কিম্বা স্বার্থের গন্ধ নাই এমন কোনও কর্ম্ম করিলে, মন কত হাল্কা হইয়া যায় এবং মনে কত আনন্দ জন্মে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে পুকুরে মাছ ধরা হইলে, গৃহস্থ সমাগত লোকদিগকে এবং ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীদিগকে কিছু কিছু বিতরণ করিয়া বক্রী মাছ বাড়ী লইয়া যাইত বা বিক্রয় করিত। বাগানে আম বা কাঁঠাল পাকিলেও তাই। এই প্রকার বিতরণ করিয়াও তাহাদিগের অভাব হইত না। এখন আর সে প্রথা নাই। গৃহস্থ সমস্ত দ্রব্যই গৃহে লইয়া যায়; অধিকন্তু যদি কোন লোক অভ্যাসবশতঃ গাছ হইতে একটী আম পাড়িয়া খায় কিম্বা ছিপে একটী মাছ ধরে, তাহাদিগকে পুলিশে চালান দিতে গৃহস্থ কুণ্ঠিত হয় না। এখন আম প্রচুর পরিমাণে ফলে না এবং পুকুরে মাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে না। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অভাব বেশী। মানুষ যতই চিহ্নিত বিন্দুকে ধরিবার চেষ্টা করিবে, তাহার অভাব ততই বাড়িতে থাকিবে।

বিষ্ণু অর্থে জনসাধারণ। বিষ্ণুপ্রীতির জন্য কর্ম্মই ভগবৎকর্ম্ম। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পরের (বিষ্ণুর) জন্য ভাবেন, বিষ্ণু বা ভগবান তাঁহার জন্য ভাবেন।

"কাঁদেনা যাহার মন অপরের তরে, বৃথায় মনুষ্য নাম সেইজন ধরে।"

"Sympathy is the Universal Solvent." Shakes.

আমার হয়ত পাঁচটী ছেলে আছে। একজন দরিদ্র প্রতিবেশী (বাগ্দী) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার একটী ছেলেকে অতিশয় ভালবাসে ও যত্ন করিয়া

থাকে। সেই দরিদ্র প্রতিবেশীকে ভালবাসিতে আমার প্রবৃত্তি আপনি আসিবে। পূজার সময়ে দাসদাসীর ইত্যাদি সকলের জন্য কাপড় কিনিবার সময়ে সেই দরিদ্র প্রতিবেশীর জন্য একখানি কাপড় আমাকে লইতেই হইবে। বৈবাহিক গৃহ বা অপর কোথাও হইতে সুস্বাদু খাদ্য আসিলে তাহাকে কিছু দিতে ইচ্ছা হইবে। সেই দরিদ্র প্রতিবেশী আমার এক সন্তানকে ভালবাসে বা সন্তানের চিন্তা করে বলিয়া, আমি সর্ব্বদা তাহার চিন্তা করি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবই ভগবানের সন্তান। সুতরাং জীবকে ভালবাসিলে বা তাহাদের ভাবনা ভাবিলে বা জনসাধারণের প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিলে, ভগবান আমাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবেন না।

"যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।"

এক দরিদ্র ভগবৎপরায়ণ ব্রাহ্মণ গীতাপাঠ করিতেন। তিন দিবস ভিক্ষা না পাওয়ায় তাঁহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। একদিন জঠর জ্বালায় পীড়িত হইয়া তিনি তাঁহার পত্নীকে বলিলেন, "গীতায় যে লেখা আছে, 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্' ইহা কথার কথা, নচেৎ আমি সর্ব্বদাই ভগবানের চিন্তা করিয়া থাকি, অথচ ভগবান্ ত আমার অভাব পূরণ করেন না।" এই বলিয়া তিনি গীতার ঐ শব্দ কয়টী কাটিয়া দিলেন। পুরুষকারই বলবৎ ইহা ভাবিয়া তিনি ভিক্ষার জন্য বহির্গত হইলেন। ইত্যবসরে দুইটী বালক—(একজন শ্বেতকায় ও অপরজন কৃষ্ণকায়), মাথায় করিয়া দুই ঝুড়ি খাদ্য আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "এই দেশের রাজা আপনাদিগের জন্য এই সব খাদ্য পাঠাইয়া দিয়াছেন, এইগুলি গ্রহণ করুন।" ব্রাহ্মণী দেখিলেন, কৃষ্ণকায় বালকের বক্ষঃস্থলে আঁচড়ানর দাগ রহিয়াছে এবং তথা হইতে রক্ত গড়াইতেছে। তিনি তখন বালককে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বালক বলিলেন "মা, আপনার স্বামী আমার হৃদয়ে আঘাত করিয়াছেন।" ব্রাহ্মণী

সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন "আমার স্বামী নিতান্ত নিরীহ; তিনিত কখনও কাহাকে প্রহার করেন না।" বালক বলিলেন "মা, আমি মিথ্যা বলি নাই; বাস্তবিকই আপনার স্বামী আমার হৃদয়ে আঘাত করিয়াছেন; বরং আপনি আপনার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।" বালকদ্বয় প্রস্থান করিলে ব্রাহ্মণ গৃহে আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভাবিলেন, "তাইত, আমিত কাহাকেও প্রহার করি নাই; রাজাই বা এত খাদ্য দেন কেন, এতদিন ত কেহ কোনও কিছু দেয় নাই; ইহার ভিতরে কিছু রহস্য আছে।" ব্রাহ্মণ কৌতূহলবশতঃ রাজবাটীতে গিয়া সন্ধান লইলেন এবং জানিলেন, রাজা কোনওরূপ খাদ্য পাঠান নাই। চিন্তা করিতে করিতে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, কৃষ্ণকায় বালক শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্বেতকায় বালক আর কেহই নহেন স্বয়ম্ বলরাম। যেহেতু গীতা মাহাত্ম্যে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।"

গীতায় 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্' কাটায় ভগবানের বক্ষঃস্থলে আঘাত করা হইয়াছে তাই তাঁহার (কৃষ্ণকায় বালকের অথবা কৃষ্ণের) বক্ষঃস্থল হইতে রক্ত গড়াইতেছিল। তিনি অনেক অনুতাপ করিলেন এবং গীতার ঐ শব্দগুলি বাহাল রাখিলেন।

মনে করুন, এক পল্লীগ্রামে একজন মাত্র শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক এবং অবশিষ্ট নিরক্ষর ও নিঃস্ব ব্যক্তিগণ বাস করেন। হঠাৎ ঐ গ্রামের এক প্রান্তে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। শিক্ষিত ভদ্রলোকটী নিজ বসতবাটীর চতুর্দ্দিক পরিষ্কৃত রাখিবার বন্দোবস্ত করিলেন, পরিজনদিগকে একটু একটু 'কুপ্রম্' নামক ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন এবং আধ পয়সা ছিদ্র করিয়া প্রত্যেককে উহা ধারণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রোগ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বহু লোক গ্রাস করিয়া শেষে অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের

বাটীতে প্রবেশ করিল এবং তাঁহার তিন চারিজন আত্মীয়কে শমন সদন লইয়া গেল। যদি প্রথম হইতেই ভদ্রলোকটী কিছু খরচ করিয়া সমগ্র গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন এবং ইন্‌জেকৃশনের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে হয়ত পীড়ার প্রকোপ কমিয়া যাইত এবং তাঁহার তিন চারিজন আত্মীয় মারা যাইত না।

তিনি চিহ্নিত বিন্দুকে আঁকড়াইতে গিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন। বিষ্ণু প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিলে তাঁহার ইহকালের এবং পরকালের মঙ্গল হইত।

বিশ্বজনীন প্রেম থাকা চাই। আমার গ্রামকে বা আমার দেশকে বা আমার দেশের লোককে ভালবাসিব এ ধারণা আদৌ প্রশস্ত নহে। জগতের জীবই যে আমার ভ্রাতা।

"উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥"

কর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্ম আবার তিন প্রকার—কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম। ধর্ম্ম শব্দের অর্থ যাহা ধরিয়া রাখে অর্থাৎ গুণসমষ্টি (characteristic). প্রত্যেক গৃহস্থের কুলধর্ম্ম (tradition) আছে। প্রায়ই দেখা যায় ইহা ত্যাগ করিলে নানারূপ অনিষ্ট হয়। যাঁহাব পূর্ব্ব পুরুষগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন, তিনি যদি শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তবে তাঁহার দেহের ভিতরে ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইবে এবং তিনি পাগল হইয়া যাইতে পারেন। জাতি ধর্ম্মও ত্যাগ করা উচিত নহে, যাহাকে হউক একজনকে কামারের কাজ করিতে হইবে। যে লোহার কাজ করিবে, তাহাকে কামার বলা হইবে। যে কাঠের কাজ করিবে তাহাকে সূত্রধর বলা হইবে। সুতরাং কর্ম্ম অনুসারেই জাতির সৃষ্টি হইয়াছে।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।" গীতা ৪।১৩

এই জাতিগত পার্থক্য বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যে কামারের ছেলে, সে লোহার কাজ শিখিতে সহজে পটু হইবে, তাহাকে স্থত্রধরের কাজ করিতে দিলে, সে অতি সহজে উহা শিখিতে পারে না।

জাতিধর্ম্ম অনেককেই ত্যাগ করিতে দেখা যায়। দ্রোণাচার্য্যের জাতিধর্ম্ম তপজপ ইত্যাদি, কিন্তু তিনি যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলেন। জাতিধর্ম্ম ত্যাগ করায় তাঁহার পাপ হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম্যযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গলাভ করে, ইহাই শাস্ত্রের উক্তি, ব্রাহ্মণ নহে।

স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা বড় সহজ নহে। যাহা লইয়া 'আমি' তাহাই আমার স্বধর্ম্ম। এই স্বধর্ম্মের উপর আমার শিক্ষা ও দীক্ষা নির্ভর করে। এই স্বধর্ম্মের সাহায্যে ভবিষ্যৎ শিক্ষালাভ করা যায়। এই স্বধর্ম্মের সহিত বিপরীত ধর্ম্ম খাপ খায় না।

পারতপক্ষে এই তিনটী ধর্ম্ম বাঁচাইয়া কাজ করিলে মানুষের মঙ্গল হয়।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" গীতা।

কর্ম্মের প্রক্রিয়ায় দেখান হইয়াছে, মশা, খোঁড়া ও আম আমাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইল বা খেলাইল। ইহারা অ-আমি বা প্রকৃতি। অতএব প্রকৃতিই আমাকে কার্য্য করায় বা খেলায়। প্রকৃতি জড় বা নির্জীব বলিয়া ইহার নিজের কোনও ক্ষমতা নাই। ইহা অব্যক্ত শক্তি বা ব্রহ্ম বা ভগবৎ শক্তির প্রভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। সুতরাং ভগবান প্রকৃতি মারফতে জীবকে কার্য্য করায় বা খেলায়।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ গীতা ১৮।৬১

মায়য়া কিনা প্রকৃত্যা। প্রকৃতিই মায়া (illusion) কারণ ইহা নশ্বর।

যন্ত্রণা নিবারণের জন্যই বা আনন্দ পাইবার জন্যই মশাকে মারিলাম বা উড়াইলাম, খোঁড়াকে পয়সা দি বা না দি আনন্দের জন্য; আম পাড়ি বা না পাড়ি আনন্দের জন্য। অতএব আমি আনন্দের জন্যই কর্ম্ম করি বা খেলি।

"কে খেলায় আমি খেলি বা কেন··· ।"

আমি মর্ত্ত্যে আসিয়াছি ভগবৎকর্ম্ম করিয়া ক্রমাগত শুক্লপথ অর্জ্জন করতঃ ব্রহ্মে লীন হইবার জন্য; কিন্তু আমি দেহ ও মন হইয়া গিয়াছি এবং কেবলই নিজ আহার ও বিহারের জন্য কর্ম্ম করিয়া কৃষ্ণপথ অর্জ্জনকরতঃ বন্ধনযুক্ত হইলাম।

"কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল।
কি জানি কেমন কি খেলা হ'লো।
প্রবাহের বারি রোধিতে কি পারি।
চারিদিকে গোল উঠে নানা রোল।
এই আছে আর এখনি নাই॥

প্রকৃতপক্ষে আমি দেহও নহি এবং মনও নহি, আমি "আমি" বা আত্মা। ভগবান আমাকে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়াছেন এবং আমার হৃদয়ে অংশরূপে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য (সাদা দাগ অর্জ্জন করিবার জন্য) সতত পরামর্শ দিতেছেন। আমি ভারতবর্ষরূপ কর্ম্মভূমিতে কর্ম্ম করিতে অর্থাৎ নিষ্কাম ভগবৎকর্ম্ম করিতে আসিয়াছি।

"জানিনা কেবা এসেছি কোথায়,
কোথায় এসেছি কেবা নিয়ে যায়,
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে,
যাই যাই কোথা কূল কি নাই।"

কাহার কাহারও ধারণা 'আমি আছি বলিয়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা জগৎ আছে।' এ ধারণা খুবই সত্য। যখন তিনি ছিলেন না বা জন্মগ্রহণ করেন নাই, তখন কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছিল না? আবার যখন তিনি থাকিবেন না বা মরিবেন তখন কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থাকিবে না? তিনি যে চিরকালই আছেন। যখন তিনি জন্মেন নাই তখনও তিনি ছিলেন কিন্তু অন্য দেহে। তখন তিনি (হরি) হয়ত যদু নামে পরিচিত ছিলেন; আবার যখন তিনি মরিবেন তখনও তিনি থাকিবেন কিন্তু অন্য দেহে। তখন হয়ত তিনি শ্যাম নামে পরিচিত হইবেন।

আমি অজ্ঞানরূপ তিমিরে আচ্ছন্ন থাকায় প্রকট নহি বলিয়া পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণপথে আনিতে পারি না। জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা অজ্ঞানরূপ তিমির ছেদন করিয়া আত্মার প্রকাশ না হইলে আমার বা আত্মার নিস্তার নাই, মোক্ষলাভ করিবার উপায় নাই।

"তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনা।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥" গীতা ৪।৪৩

অতএব হৃদয়স্থিত অজ্ঞানসম্ভূত সংশয়কে বা অজ্ঞানকে জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছদন করিয়া কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর। হে ভারত (অর্জ্জুন) তুমি ওঠ।

"যে আছ চেতন ঘুমাইও না আর
দারুণ ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তমো নাশ হও হে প্রকাশ,
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়,
তব পদে তাই শরণ চাই।"

এখানে আত্মাকেই বলা হইতেছে। আত্মাই একমাত্র চেতন।

পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে মানুষ আনন্দের জন্যই কর্ম্ম করে এবং কর্ম্ম দ্বারাই মানুষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অতএব আনন্দ লাভই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভি
সংবিশন্তি॥"

জীবসকল কাহা হইতে জন্ম গ্রহণ করে, জন্মগ্রহণ করিয়া কিসের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অন্তিমকালে কি লক্ষ্য করিয়া গমন করে।

এই তিনটী শব্দের উত্তর এক 'আনন্দ' যথা—

"আনন্দাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

আনন্দ হইতে জীবগণ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারা জীবগণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুকালে উহারা আনন্দকে লক্ষ্য করিয়া প্রস্থান করে।

মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি যাবতীয় জীব স্ত্রী ও পুরুষের সঙ্গমে উৎপন্ন হইয়াছে।

জীব কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্ম করে আনন্দের জন্য। অতএব জীব আনন্দ দ্বারাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

প্রত্যেক মানুষ কতকগুলি স্থায়ী কল্পনা ও কতকগুলি অস্থায়ী কল্পনা (fancy) পোষণ করে। স্থায়ী কল্পনা লক্ষ্য করিয়া জীব কর্ম্ম সমুদ্রে ধাবিত হয় এবং অস্থায়ী কল্পনা দ্বারা সে ক্ষণিক সুখ অনুভব করে মাত্র।

"........................To interpose a little case,

Let my frail thoughts dally wilh false surmise."

সামান্য আনন্দের জন্য মনে মনে মিথ্যা চিন্তা করায় দোষ কি?

এই কল্পনা বা আকাশ আনন্দ (expectant imagination) না থাকিলে জীব এক মুহূর্ত্তও বাঁচিত না।

"কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রান্যাৎ যদেষ আকাশআনন্দঃ ন স্যাৎ"

মনে করুন এক দুঃখী কাঠুরীয়া বনে বাস করে। তাহার আপন বলিতে কেই নাই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সে অতি কষ্টে বন হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া যে দুই আনা পায় তদ্দ্বারা অতি কষ্টে নিজ ভরণপোষণ করে। সে কি সুখে বাঁচিয়া আছে? সে নিশ্চয়ই দুঃখে আত্মহত্যা করিত যদি না তাহার মনে এই আকাশ আনন্দ থাকিত যে একদিন তাহার ভগ্নকুটীরে সোণার খনি বাহির হইবে, যদ্দ্বারা তাহার বহু ধন হইবে এবং সে সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবে। সকলেরই মনে এইরূপ আকাশ আনন্দ উদিত হয়। যে ব্যক্তি তাহা প্রকাশ করে, লোকে তাহাকে পাগল বলে।

"Hope springs eternal in human breast,
Man never is but always to be blest." Pope.

আশা মনুষ্যহৃদয়ে সর্ব্বদাই উদিত হইতেছে। মানুষ কখনও সুখী হইতে পারে না যদিও সে সর্ব্বদা সুখের জন্য লালায়িত।

এক আশা মিটিতে না মিটিতে আর এক আশার তরঙ্গ আসিয়া মনুষ্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। আশার শেষ কোথায়? মানুষ আনন্দ চায় কিন্তু পায় না কেন?

"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।" গীতা ৫।১৫

অজ্ঞান বা ষড়রিপু কর্ত্তৃক জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হয়।

কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি জীবগণ অনলকে লক্ষ্য করিয়া আনন্দ পাইবার আশায় উহাতে ঝম্পপ্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

মনে করুন কোনও মনুষ্যের কুড়িটী স্ত্রী কল্পনা ছিল। সাতটীর পূরণ হইতে না হইতে তাহার মৃত্যু সময় উপস্থিত হইল। তখন সে মৃত্যুশয্যায়

শায়িত থাকিয়া মনে মনে ভাবে "জরা আসায় বাকি তেরটী কল্পনা আমি পূরণ করিতে পারিলাম না; আগামী জন্মে নূতন ও কর্ম্মঠ দেহ পাইয়া ঐ তেরটী পূরণ করিতে পারিব। এই আশায় বা আনন্দে সে প্রাণত্যাগ করে। মৃত্যুকালীন ইহাই তাহার আনন্দ।

ইহা যদি যথেষ্ট না হয়, তবে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে মৃত্যুযন্ত্রণা ভয়ানক যন্ত্রণা। নাভিশ্বাসের সময়ে জীবের মনে হয় শেষ নিশ্বাসটুকু গেলেই সে বাঁচে। সুতরাং মৃত্যুকালে ইহাই তাহার আনন্দ। প্রত্যেক কর্ম্মের উদ্দেশ্য আনন্দ বা সুখলাভ।

এক্ষণে দেখিতে হইবে আনন্দ বা সুখ কাহাকে বলে।

এক সের বাঁটাছানার সন্দেশ খাইলে সুখ হয় কিন্তু দেখা যায় পরদিনে মলত্যাগের সময়ে কুন্থনে দারুণ দুঃখ বা কষ্ট অনুভূত হয়। বেশ্যালয়ে পরদার গমনে অত্যন্ত আনন্দ বোধ হয় কিন্তু কিছুদিন পরে উপদংশ বা মেহরোগ উপস্থিত হইলে মানুষ আজীবন দুঃখ বা কষ্ট পায়। মানুষের উদ্দেশ্য এই প্রকার সুখলাভ নহে। সে এমন সুখ চায় বা তাহার এমন সুখ হওয়া উচিত, যাহার পরে দুঃখ নাই অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।" মনু।

পরবশই দুঃখ এবং আত্মবশই সুখ।

এখানে যদি কেহ আত্মবশ শব্দের অর্থ স্বাধীনতা বুঝেন তবে তিনি ভ্রান্ত; কারণ প্রত্যেক মানুষ যদি স্বাধীন হয় বা হইতে পায় অর্থাৎ ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পায়, তবে সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হইতে পাইলে তাহার নিজের এবং যে সমাজে সে বাস করে সেই সমাজের সমূহ ক্ষতি হইবে। আত্ম শব্দে আত্মা বুঝায় এবং পর শব্দে মন বুঝায়। যে কর্ম্ম

আত্মার বশে বা আত্মার প্রস্তাবমতে হইবে তাহা শুক্লদাগযুক্ত সুতরাং সুখাবহ হইবে এবং যে কর্ম্ম মন বা ষড়রিপুর বশে বা প্রস্তাবমতে সম্পন্ন হইবে তাহা কৃষ্ণদাগযুক্ত সুতরাং দুঃখাবহ হইবে।

"প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।" গীতা ২।৬৫

আত্মপ্রসাদ লাভ হইলে বা জন্মিলে সমস্ত দুঃখের শান্তি বা অবসান হয়।

দুঃখের অবসান মানে সুখ। আত্মপ্রসাদ মানে আত্মার তৃপ্তি। আমি কোনও লোককে কোন কর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিলাম। যদি সেই ব্যক্তি আমার উপদেশ গ্রহণ করে বা আমার উপদেশমত কর্ম্ম করে তবে আমার তৃপ্তি বা আনন্দ হয়, আর যদি না করে তবে তাহার উপর কিছু বিরক্তি বা ক্রোধ জন্মে; যদিও আমার উপদেশমত কার্য্য করিলে বা না করিলে আমার নিজের কোন লাভ থাকে না। আত্মা মনকে যে পরামর্শ দিবে, মন তাহা গ্রহণ করিলে আত্মার তৃপ্তি হয় এবং ঐরূপ কর্ম্মে শুক্লদাগ অর্জ্জিত হয়। যেহেতু শুক্লদাগই মোক্ষ বা আনন্দের হেতু, আত্মার মতে কর্ম্ম করিলেই আনন্দ আসিবে। মন দেহের স্বামী বা গুরু হইলেও পর এবং আত্মাই স্ব বা নিজ।

"গোভোজনে মহাপুণ্য,
স্ত্রী থাকতে গৃহ শূন্য।
গুরুকে মেরে স্বর্গে বাস,
হরিভজনে সর্ব্বনাশ।" হেঁয়ালী।

গো শব্দে নানা অর্থ হয়, যথা পৃথিবী, ধেনু, কিরণ প্রভৃতি। ইহার অর্থ বাক্ও হয়। এখানে গো শব্দে বাক্য বুঝিতে হইবে। বাক্য ভোজন করিলে অর্থাৎ কম কথা কহিলে মহাপুণ্য হয়।

"জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘবিপর্য্যয়ঃ।" রঘুবংশ

রাজা দিলীপের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল, কিন্তু তিনি মৌনিভাব অবলম্বন করিতেন, তাঁহার অনিষ্ট করিবার যথেষ্ট শক্তি ছিল কিন্তু তিনি সকলকে ক্ষমা

করিতেন। তিনি বহু দান করিতেন কিন্তু দানের বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। অধিক কথা বিশেষতঃ নিজের সম্বন্ধে কথা বলিলে অনেক সময়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু পাঁচটা অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা কথা বাহির হইয়া যায়, তাহাতে পাপ হয়। কম কথা কহিলে তাহার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং গো (বাক্য) ভোজনে মহাপুণ্য ইহা সত্য।

কবির তরজায় শুনা গিয়াছে একজন বলিলেন—

বহুৎ ভাল্‌না বোল্‌না চোল্‌না বহুৎ ভাল্‌না চুপ্।
বহুৎ ভাল্‌না বাদর বর্ষা বহুৎ ভাল্‌না ধূপ্॥

অধিক হাঁটা বা বকা ভাল নহে, অধিক চুপও ভাল নহে আবার অধিক বর্ষাও ভাল নহে কিম্বা অধিক গরমও ভাল নহে। "সর্ব্বমত্যন্তম্ গর্হিতম্।"

প্রতিদ্বন্দ্বী কবি উঠিয়া তাহা খণ্ডাইয়া দিলেন ঃ—

"ভাটকে ভালা বোল্‌না চোল্‌না বহুরী ভালা চুপ।
ভেককে ভালা বাদর বর্ষা অজকে ভালা ধূপ॥"

ভাটের পক্ষে অধিক হাঁটা ও বকা ভাল, বউমানুষের চুপ করিয়া থাকাই ভাল। বেঙের পক্ষে অধিক বর্ষা ভাল এবং ছাগলের পক্ষে অধিক গরম ভাল।

ভাট ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে অধিক কথা বলা ভাল নহে।

গ্রহণ করা যায় যদ্দ্বারা এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা গৃহ শব্দে আসক্তি বুঝায়। সুতরাং গৃহশূন্য শব্দে আসক্তিহীন বুঝিতে হইবে। স্ত্রী না থাকিলে কোনও ধর্ম্ম বা কর্ম্ম হয় না।

"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।"

রামচন্দ্র সোণার সীতা গড়াইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। স্ত্রী থাকা চাই, কিন্তু আসক্তিহীন অর্থাৎ কামনাসক্ত না হইয়া বিষ্ণুপ্রীতির নিমিত্ত বা প্রজাসৃষ্টির জন্য স্ত্রীতে উপগমন করা উচিত। তবেই স্ত্রী থাকার সার্থকতা।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ।"

"The object of marriage is to produce a good citizen."

পুত্রের জন্যই বিবাহ বা স্ত্রীপরিগ্রহ; পিণ্ডের জন্য পুত্রের প্রয়োজন।

বিবাহের উদ্দেশ্য সৎ নাগরিক উৎপাদন করা। যেমন গন্ধ বলিলেই সদ্‌গন্ধ বুঝায় এবং কর্ম্ম বলিলে সৎকর্ম্ম বুঝায় সেইরূপ পুত্র বলিলেই সুপুত্র বুঝিতে হইবে।

এইজন্য শাস্ত্রে গর্ভাধানের ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমান সময়ে এ প্রথা বড় একটা দেখা যায় না। এক্ষণে কামনা চরিতার্থ করা ও বংশ বৃদ্ধি করা বিবাহের উদ্দেশ্য হইয়াছে।

সুপুত্র উৎপাদিত হইতে হইলে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে দাম্পত্য প্রণয় থাকা আবশ্যক। দাম্পত্য প্রণয় অসম্ভব যদি না কন্যা সদন্তরের সহিত পতিগৃহে আসে। কন্যা সদন্তরের সহিত পতিগৃহে আসিতে পারেনা যদি সে বুঝে তাহার শ্বশুর বা স্বামীর অভিভাবক পীড়ন করিয়া তাহার পিতার নিকট হইতে বরপণ লওয়ায় তাহার পিতার ভদ্রাসনটী বিক্রীত হইবে। ঐ কন্যা যখন পুত্রের মা হয়, তখন পুত্রের বিবাহের সময়ে সে অধিক পরিমাণে বরপণ হাঁকিয়া প্রতিহিংসা সাধন করিয়া থাকে। এইরূপে বিবাহ ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সুপুত্র না জন্মিবার ইহা একটী কারণ।

শুনিয়াছি পূর্ব্বে বিবাহের কথাবার্ত্তার পূর্ব্বে বরের পিতা বা অভিভাবক বিশ্বাসী দাসী দ্বারা কন্যার মাতাকে পরীক্ষা করিয়া লইতেন। তখনকার লোকের ধারণা ছিল কন্যার মাতা ভাল হইলেই কন্যা ভাল হইবে। সদ্বংশ একটা কম কথা নহে। ক্ষেত্র অনুসারে শস্য। বর্ত্তমান সময়ে কন্যা দেখিবার সময়ে বরকর্ত্তা দেখেন কন্যার গায়ের রং ফর্সা কিনা, লেখাপড়া জানে কিনা, নাচগান জানে কিনা এবং কন্যার পিতা তাঁহার খাঁই মত টাকা দিতে পারিবেন কিনা।

বরের পিতা বা ভ্রাতা কন্যাকে যে চক্ষে দেখিতে পারে বর নিজে কন্যাকে কখনও সে চক্ষে দেখিতে পারে না। সেইজন্য পূর্ব্বে বরের কন্যাকে দেখার ব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়া স্ত্রী ও পুরুষের প্রথম দর্শনে (চারি চক্ষু মিলনে) যদি ভালবাসা না জন্মে, তবে তাহাদের মধ্যে ভালবাসা আর কখনও জন্মিবে না। এইজন্য বিবাহের সময়ে বরকন্যার শুভদর্শন হয় এবং চারিদিকে কাপড় ঢাকা দেওয়া হয়।

"Love, whom the crosslightnings of the fourchance met eyes
Flash into fiery life." Tennyson.

কন্যার গায়ের রং ফর্সা কিনা ইহা দেখা মন্দ নহে কারণ

"পহেলা কি দর্শনডালি পিছাড়ী কি গুণ বিচারি।"

বউ দেখতে খারাপ হইলে লোকনিন্দার ভয় আছে। তবে ইহাও দেখিতে হইবে কাল মেয়ের তবে কি বিবাহ হইবে না?

"কোকিলানাং স্বরোরূপং নারীরূপং পতিব্রতা।"

কোকিল কাল হইলে কি হয়, স্বরই তাহার রূপ অর্থাৎ স্বরে তাহার আদর হয়, সেইরূপ রমণীর রূপ হইতেছে পতিভক্তি।

কন্যার লেখাপড়া জানা অনাবশ্যক নহে। মেয়ে মানুষ লেখাপড়া জানিলে পুরুষের অনেক সুবিধা আছে। সাংসারিক হিসাব নিকাশ (ধোপার হিসাব ইত্যাদি) বিষয়ে পুরুষকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। অধিকন্তু পুত্র বাল্যাবস্থায় পিতার নিকটে অপেক্ষা মাতার নিকটে অধিকক্ষণ থাকে। মাতা লেখাপড়া জানিলে পুত্র তাঁহার নিকট হইতে অনেক কিছু শিখিতে পারে, কারণ ঐ সময়ে তাহার অনুকরণ বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল থাকে। মাতার স্বভাব পুত্রের চরিত্র গঠন করে। নেপোলিয়ান ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মাতার স্বভাব উঁহাদিগের চরিত্র গঠন করিয়াছিল; কিন্তু নাচগান কি কাজে আসিবে তাহা

বুঝিয়া উঠা যায় না। গান ভিতরের জিনিষকে বাহিরে আনে। অত্যধিক সুখে বা দুঃখে গান আসে। এখনও অসভ্য লোকেরা মৃত ব্যক্তির শোকের জন্য গান করিয়া কাঁদে। স্থানে স্থানে শুনা গিয়াছে, কেহ রাত্রিতে মৃতের জন্য কাঁদিলে "কাঁদিতেছে" বলিতে নাই, 'গান করিতেছে' বলিতে হয়। সা ঋ গা মা দিয়া গান না শিখিলেও সকল লোকেই আপন মনে গান গায় এবং তাহাতে বিশেষ আনন্দ লাভ করে। গান জানে না এমন লোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"The man that hath no music in himself,
Nor is not moved by concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems and spoils,
Let him not be trusted." Shakes.

পূর্ব্বে কর্ম্ম খালি হইলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত—

'None need apply who has not passed the Entrance Examination.'

যিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়াছেন তিনি যেন আবেদন না করেন।

শুনা গিয়াছে এম্-এ পাশ করা পুত্রের ধনাঢ্য পিতা পুত্রের বিবাহের কথাবার্ত্তায় জলখাবার ইত্যাদি বাবদে অযথা খরচ হইতে অব্যাহতি পাইবার মানসে নিজ বহির্বাটীর সম্মুখে নিম্নলিখিত সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া রাখিতেন—

'None need come here for matrimonial negotiation, who will not be able to pay five thousand rupees.'

যিনি পাঁচ হাজার টাকা দিতে অসমর্থ হইবেন তিনি যেন বিবাহের কথাবার্ত্তা কহিতে এখানে না আসেন।

কলিকাতার কোনও প্রসিদ্ধ এবং সঙ্গতিপন্ন উকিলের এম্-এ পাশ করা এক পুত্র ছিল। বারাসত নিবাসী ৫০।৬০ টাকা বেতনের একজন কেরাণী উকিলবাবুর এই পুত্রের সহিত তাঁহার একমাত্র অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যার বিবাহ দিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। কেরাণীবাবু উকিলবাবুকে নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করায় উকিলবাবু বলিলেন "আপনার মিছে আশা, পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারিবেন?" উকিলবাবু বলিলেন "আমি ৫০।৬০ টাকা বেতন পাই, তাহাতে আমাদের খাইতে কুলায় না। আমার বনের ফুল ও পুকুরের জলই সম্বল। ভগবানের কৃপায় আপনার অর্থের অভাব নাই; পরের টাকার প্রত্যাশা করিবেন না।" উকিলবাবু বলিলেন "পাগল আর কি? বামন হইয়া চাঁদে হাত।" কেরাণীবাবু কিন্তু নিরাশ হইলেন না। তিনি একদিন তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে গোপনে উকিলবাবুর বাড়ীর ভিতরে উকিল গৃহিণীর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। পুরুষে পুরুষে যত শীঘ্র সদ্ভাব না হয়, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে তত শীঘ্র সদ্ভাব হইয়া থাকে। উকিল গৃহিণী কেরাণীবাবুর পত্নীকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন এবং দেখিলেন কন্যাটী অনিন্দ্যসুন্দরী। তিনি কেরাণীবাবুর পত্নীকে এক প্রকার কথা দিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি নিজ স্বামীকে কন্যাটীকে বধুরূপে গ্রহণ করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। উকিলবাবু বিনা পয়সায় পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে উকিল গৃহিণী মনে করিলেন কন্যাটীকে দেখিলে হয়ত তাঁহার স্বামী তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি বলিলেন "আগামী রবিবারে মেয়েটীকে একবার দেখেই এস না।" যথাসময়ে উকিলবাবু একজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া বারাসতে কেরাণীবাবুর ভবনে উপস্থিত হইলেন। যখন তিনি দেখিলেন কন্যাটীর কোথাও খুঁত নাই, তিনি কেরাণীবাবুকে বলিলেন "আপনার কন্যাটী বাস্তবিকই অনিন্দ্যসুন্দরী, দুই হাজার টাকা দিলেই হইবে।" কেরাণীবাবু উকিলবাবুর পা জড়াইয়া বলিলেন "মহাশয়, আমার হালচাল সবই আপনাকে জানাইয়াছি।

বাস্তবিকই আমি খাইতে পাই না। আমার বনের ফুল ও পুকুরের জল। আপনি বড় লোক এবং ভগবান আপনাকে আরও বড় করিবেন; দয়া করিয়া আমার মেয়েটীকে বধুরূপে গ্রহণ করুন।" উকিলবাবু বলিলেন "তাহা হইলে হইবে না। Can't help, sorry. উপায় নাই, দুঃখিত।" এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। কেরাণীবাবুর মনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল; তিনি কাঁদ কাঁদ হইয়া গেলেন। পরে তিনি তাঁহার বাল্যকালের সহপাঠী ও গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকটে সমস্ত বর্ণনা করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। জমিদারবাবু সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন "তাহ'লে তোমার ত আর আশা নাই; আমি নিজের জন্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। পাত্রটী নাকি খুবই ভাল।" এই বলিয়া তিনি হুঁকা হাতে করিয়া এবং একজন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া পথিমধ্যে উকিলবাবুকে ডাকিতে লাগিলেন "ও মহাশয় শুনুন।" উকিলবাবু বলিলেন "কি বল্‌ছেন?" জমিদারবাবু বলিলেন "কেরাণীবাবুর মেয়ের সহিত আপনার পুত্রের বিবাহের কি হইল?" উকিলবাবু বলিলেন "মেয়েত খুবই ভাল, কিন্তু তা বলিয়া টাকা নইলে কখনও বিয়ে হয়?" জমিদারবাবু বলিলেন "আমার একটী বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। আপনার খাঁই কত জানিতে পারি কি?" উকিলবাবু বলিলেন "পাঁচ হাজার টাকা।" জমিদারবাবু বলিলেন "আসুন আমার সঙ্গে।" জমিদারবাবুর কন্যা ভদ্রঘরের মেয়ে, সুতরাং অপছন্দের কোনও কারণ নাই, তবে কেরাণীবাবুর মেয়ের তুলনায় সমুদ্রে আর গোষ্পদে তুলনা করিলে যাহা হয় তাহা। যাহা হউক কন্যা পছন্দ হইলে এবং জমিদারবাবু পাঁচ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইলে, পঞ্জিকা দেখিয়া বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। বড় লোক দেখিয়া উকিলবাবু অগ্রিম টাকার কথা মুখে আনিতে পারিলেন না গৃহে গিয়া উকিলবাবু পত্নীর নিকট সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিলেন। উকিল গৃহিণী মাত্র বলিলেন "আমি তোমার পুত্রের বিবাহে নাই।" তাহাতে উকিলবাবু বলিলেন "টাকা

থাকিলে কত পত্নী হইবে। এজগতে টাকাই মূল।" পুত্র মহা সমস্যায় পড়িল। একদিকে পিতা, অন্যদিকে মাতা; সে কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিতে পারে না। সে কি করিবে? এরূপ অবস্থায় সে "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" এই ভাব অবলম্বন করিল।

যথাসময়ে উকিলবাবু বরযাত্রী ও বর লইয়া বারাসতে জমিদার ভবনে উপস্থিত হইলেন। জমিদারবাবু বিবাহের বিরাট আয়োজন করিয়াছেন। তিনি কেরাণীবাবুর পত্নী ও কন্যাকে তাঁহার বাটীতে আসিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলে, কেরাণীবাবু বলিলেন "বাপ্‌রে আমি তা পারিব না, আমি যাইব এইমাত্র। আমার মনে যে কষ্ট হইয়াছে তাহা অন্তর্যামী ব্যতীত আর কে বুঝিবে?" তাহাতে জমিদারবাবু বলিলেন "আমি ত ভাই, তোমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লই নাই; তোমার জবাব হইলে, আমি চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতে আর দোষ কি?" যাহা হউক কেরাণীবাবু পত্নী ও কন্যাকে বিবাহ বাড়ীতে পাঠাইতে রাজী হইলেন। এদিকে কন্যা সম্প্রদানের সময় উপস্থিত হইলে, কন্যাপক্ষের পুরোহিত বরের পুরোহিতকে বরের গোত্র কি জিজ্ঞাসা করিলেন। বরের পুরোহিত বরের কাশ্যপ গোত্র বলিবামাত্র, জমিদারবাবু বলিয়া উঠিলেন "আরে রাম, ছি! ছি! সব পণ্ড হইয়া গেল, এ বিবাহ ত হইবে না, আমি যে কাশ্যপ গোত্র। কে আছিস্ রে, সব উঠাও।" এই কথা শুনিয়া উকিলবাবুর রক্ত গরম হইয়া গেল। তিনি পত্নীর সহিত টেক্কা দিয়া জমিদার বাড়ীতে পুত্রের বিবাহ দিতে আসিয়াছেন, বরকে শুধু ফিরাইয়া লইয়া গেলে, তাহার অপমানের বাকি থাকিবে না ও লোকহাসির সীমা থাকিবে না। তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন "বিবাহ বন্ধ হইতে পারে না; এখন আর কুল গোত্র কেহই মানে না; পুরোহিত মহাশয়, আপনি মন্ত্র বলিয়া যান, আমার মুদ্রা গোত্র।" এই কথা শুনিয়া জমিদারবাবু বলিলেন "আপনি পাগল হইতে পারেন, আমি ত হই নাই। এই সমাজে আপনি ব্যতীত কেহ যদি বলেন সগোত্রে বিবাহ হইতে

পারে, তবে বিবাহ হইতে পারে।” বলা বাহুল্য কেহই সগোত্রে বিবাহ দিতে অনুমোদন করিলেন না। তখন উকিলবাবু পত্নীর অভিমান স্মরণ করিয়া গলা থাট করিয়া বলিলেন “এই পিঁড়ায় কেরাণীবাবুর সেই মেয়ের সহিত বিবাহ হয় না?” জমিদারবাবু বলিলেন “তাহা হইবে না কেন? তবে সেত বনের ফুল আর পুকুরের জল।” উকিলবাবু তাহাতেই স্বীকৃত হইলে, তাঁহার পুত্রের সহিত কেরাণীবাবুর অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। দান সামগ্রী ইত্যাদি যাহা সেখানে সাজান ছিল, সবই বরকে দেওয়া হইল, উকিলবাবু কেবল নগদ একটী টাকাও পাইলেন না। হরিতকীই বরপণ হইয়াছিল।

অবশ্য ইহা জমিদার বাবুরই খেলা। কেরাণীবাবু, উকিল গৃহিণী ও উকিলপুত্র ইহাদের সকলেরই আনন্দ হইয়াছিল, কারণ প্রত্যেকেরই মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু সব চেয়ে বেশী আনন্দ হইয়াছিল উকিলবাবুর পুত্রের, কারণ সে দেখিতে পাইয়াছিল হৃষীকেশ তাহার হৃদয়ের আন্তরিক ডাক শুনিয়াছিলেন।

‘গুরুকে মেরে স্বর্গেবাস’ ইহার অর্থ এই যে দেহের গুরু মনকে মারিলে অর্থাৎ মন বা ষড়রিপু বা শয়তানকে বশে রাখিয়া অর্থাৎ তাহাদের বশে না চলিয়া আত্মার বশে চলিলেই শুক্লদাগ অর্জ্জিত হইবে, সুতরাং জীবের স্বর্গে বাস হইবে।

রাসলীলার অর্থও তাই। রাধা দেহ, আয়ান ঘোষ মন এবং কৃষ্ণ আত্মা। রাধা আপন স্বামী বা গুরু আয়ান ঘোষকে ত্যাগ করিয়া পরপুরুষ কৃষ্ণকে ভজনা করিয়া কৃষ্ণে লীন হইয়াছিলেন বা ভগবানে সাযুজ্যলাভ করিয়াছিলেন। প্রকৃতি পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া পরব্রহ্ম বা পূর্ণ কৃষ্ণ হইয়া গেলেন বা একমেবাদ্বিতীয়ং হইলেন।

হরিভজনে সর্ব্বনাশ:—

বৃন্দাবনে গোপকুমারীরা কৃষ্ণকে পতি পাইবার মানসে সমস্ত কার্ত্তিক মাস ধরিয়া কাত্যায়ণী ব্রত সমাপন করিয়া যমুনাতীরে নিজ নিজ বসন রাখিয়া স্নান করিতে নামিলেন। এদিকে কৃষ্ণ বসনগুলি লইয়া কদমগাছে উঠিলেন। স্নানান্তে গোপকুমারীরা তীরে বসন দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন কদমগাছে তাঁহাদের কাপড় ঝুলিতেছে। তাঁহারা বসন চাহিলে কৃষ্ণ বলিলেন "আইস, কাপড় দিতেছি।" তাঁহারা কি করিয়া কদমতলে যাইবেন? যখন কৃষ্ণ কিছুতেই কাপড় দিলেন না, তখন তাঁহারা অগত্যা নিজ নিজ যোনিদেশ করাচ্ছাদনকরতঃ কদম্ববৃক্ষের তলে আগমন করিলেন। কৃষ্ণ কাপড় ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন "তোমরা মনে করিয়াছ কাত্যায়ণী ব্রত করিয়া তোমরা অভীপ্সিত বর পাইবে, কিন্তু তাহা হইতে পারে না। তোমরা যে কাত্যায়নীদেবীর পূজা করিয়াছ, তিনি আবার আমার পূজা করেন। আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ঈশ্বর।

'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্ ··।' গীতা ৫।২৯

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এই নীতি অবলম্বন করিলে অর্থাৎ সর্ব্বস্ব ত্যাগ না করিলে আমাকে পাওয়া যায় না। তোমরা এখনও লজ্জা ত্যাগ করিতে পার নাই; সুতরাং আমাকে পাইবার তোমরা এখনও যোগ্যা হও নাই। বস্ত্রহরণ তোমাদের পরীক্ষামাত্র। আরও এক বৎসর সময় দেওয়া হইল, যদি ঐ সময়ের মধ্যে সব ত্যাগ করিতে পার তবে তোমরা রাসলীলার যোগ্যা হইবে।" গোপকুমারীরা নিজ নিজকে ধিক্কার দিতে দিতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহারা বহু চেষ্টা ও তপস্যার ফলে সব ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া রাসলীলায় স্থান পাইয়াছিলেন। প্রত্যেক গোপীই এক কৃষ্ণ পাইয়াছিলেন। জীব মাত্রই যে গোপী এবং তাহার মধ্যে কৃষ্ণ বিরাজ

করেন। অজ্ঞানতিমিরে ডুবিয়া থাকে বলিয়া জীব আত্মদর্শন (কৃষ্ণদর্শন) করিতে সমর্থ হয় না।

রাসলীলা অন্তে গোপকুমারীরা কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন "হাঁ কৃষ্ণ! জগতে তিন প্রকার মনুষ্য দেখা যায় যথা—

(১) যাহারা ভালবাসিলে ভালবাসে

(২) যাহারা ভাল না বাসিলেও ভালবাসে

(৩) যাহারা ভালবাসিলেও ভালবাসেনা এবং ভাল না বাসিলেও ভাল বাসে না।

তুমি ইহাদের মধ্যে কোন্‌টীর অন্তর্গত?

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিয়াছিলেন—

(১) যাহারা ভালবাসিলে ভালবাসে তাহাদের ব্যবসা বিনিময়। আমার শত্রু বা মিত্র নাই; আমাকে যে ভালবাসে আমি তাহাকে ভালবাসি এবং যে আমাকে উপেক্ষা করে আমি তাহার প্রতি বিরক্ত হইনা। সুতরাং আমি এ শ্রেণীর অন্তর্গত নহি।

(২) যাহারা ভাল না বাসিলেও ভালবাসে, যেমন মাতা ও পুত্র। তাহারা ভালবাসে মোহে; আমি কামাদি ষড়রিপুর বাহিরে; সুতরাং আমি এ শ্রেণীর অন্তর্গত নহি।

(৩) যাহারা ভালবাসেনা, বাসিলেও না, না বাসিলেও না। ইহারা আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—

(১) আত্মারাম।

ইহাদের বাহ্যজ্ঞান থাকে না, সুতরাং ভালবাসিবে কি করিয়া? আমার বাহ্যজ্ঞান আছে, কেননা আমাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত করিতে হয়।

(২) আপ্তরাম।

ইহাদের বাহ্যজ্ঞান থাকিলেও, বাহিরের কোন কিছুতেই বড় একটা স্পৃহা থাকে না বলিয়া ইহারা কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না। আমি ভক্তের ইচ্ছায় কার্য্য করিয়া থাকি, সুতরাং আমার স্পৃহা আছে; আমি এ শ্রেণীরও অন্তর্গত নহি।

(৩) কৃতঘ্ন।

ইহারা উপকারীর উপকার স্বীকার করে না। আমি এ শ্রেণীর অন্তর্গত নহি, কারণ আমি ভক্তকে ফলপ্রদান করিয়া থাকি।

(৪) গুরুদ্রোহী।

ইহারা কৃতঘ্নের উপরে যায়। ইহারা উপকারীর উপকার স্বীকার ত করেই না, অধিকন্তু উপকারীর অপকার করে। আমি এ শ্রেণীরও অন্তর্গত নহি, কারণ আমি সেই প্রকার পাপাত্মাদিগের ন্যায় কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করি না; ভক্তেরও না এবং অভক্তেরও না।

তখন গোপকুমারীরা বলিলেন "তবে আমরা তোমার চরিত্র জানিব কি প্রকারে?" তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন

"যাঁহারা কামাদি ষড়রিপু্ জয় করিয়া আমার শরণাপন্ন হন, আমি তাঁহাদিগকে একবার মাত্র দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হই। তখন তাঁহাদিগের বিষয়বাসনা আর থাকে না। অহর্নিশ অন্তরে ও বাহিরে আমাকে দেখিবার জন্য তাঁহারা চেষ্টিত হন। তাঁহারা পার্থিব পদার্থে আদৌ আকৃষ্ট হন না।"

"অন্তর্বহির্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্॥"

যিনি অন্তরে ও বাহিরে হরিকে দেখেন তাঁহার জপতপে প্রয়োজন কি? আর যিনি অন্তরে ও বাহিরে হরিকে না দেখেন তাঁহার জপতপে কি হইবে?

"যে ক'রে আমার আশ, (আমি) তার করি সর্ব্বনাশ।
তাতেও যদি সে না ছাড়ে আশ,
(আমি) হই তার দাসানুদাস॥"

"যিনি সত্যের আলো একবার দেখিতে পান, মৃগনাভির ঘ্রাণে মৃগ যেমন ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে, তিনিও সেইরূপ সমস্ত ত্যাগ করিয়া সেই আলোর সন্ধানে ধাবিত হয়েন। তিনি তখন "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" এই নীতি অবলম্বন করেন।"

"সংসারের কোনও বিষয় দেখিবার তাঁহার সময় কোথায়? তাঁহার সংসার রসাতলে যায়। সংসারের যে সুখ তাহা অপেক্ষা অধিক সুখ পান বলিয়াই তিনি ভগবদুপাসনায় ধাবিত হন।"

মানকর নিবাসী ব্রাহ্মণ জীবন যমুনাতীরস্থ সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন

"যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি।
(আমি) তাহারি কিঞ্চিৎ মাগি তব পায়॥"

এবং প্রাপ্ত পরশমণি যমুনাজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

(৩) নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা মোক্ষলাভ করিতে হইলে নিয়ত শুক্লদাগ অর্জ্জন করিতে হইবে। আত্মার পরামর্শমতে কার্য্য করিলে শুক্লদাগ অর্জ্জিত হয়, অথবা আত্মাতে আস্থা (মতি) স্থাপন করিয়া উহার পরামর্শ মত কার্য্য করিলেই জীবন বা পথ শুক্ল হইয়া যাইবে। শুক্লপথই মোক্ষের হেতু। অতএব আত্মাতে মতি রাখিলেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা মোক্ষলাভ হইবে। আত্মা ভগবানের অংশ। পূর্ণ ভগবানে মতি রাখিলেই অংশ আত্মাতে মতি রাখাই হইল। সুতরাং শ্রীভগবানে মতি রাখিতে পারিলেই জীবনের উদ্দেশ্য (আনন্দ বা মোক্ষলাভ) সাধিত হইবে।

দেখা গেল নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা মোক্ষলাভ করিবার চারিটী মাত্র উপায় :—

(১) ব্রহ্মজ্ঞান।

(২) আত্মদর্শন।

(৩) সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান।

(৪) নাদ বা ওঁকারের পরামর্শ মত সত্যকে আশ্রয়।

(১) ওঁ মন্ত্র জপ করিতে থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে; কিন্তু ওঁ শব্দটী সাধারণ নহে। ইহা অ, উ এবং ম এই তিন অক্ষরের সংযোগ বা বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং ব্রহ্মার মিলন অর্থাৎ ব্রহ্ম, যাঁহা হইতে ঐ তিনের আবির্ভাব।

"অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।
মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়োমতাঃ॥"

বিশিষ্ট গুরুকৃপা ভিন্ন ওঁ মন্ত্রের জপ হয় না। ইহাতে সা ঋ গা মা আছে। প্রত্যেক মনুষ্যের প্রত্যহ ওঁ মন্ত্র জপ করা উচিত, তা ঠিক হউক আর না হউক। জপ করিতে আরম্ভ করিলে এবং প্রকৃত ইচ্ছা থাকিলে প্রকৃত গুরু মিলিলেও মিলিতে পারে।

"ওমিত্যে কাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং সঃ যাতি পরমং পদম্॥" গীতা

মৃত্যুকালে যে ব্যক্তি যে ভাব স্মরণ করে, দেহান্তে সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিলে রাজা ভরত অরণ্যে ভগবদুপাসনা করিতেন। একদিন এক আসন্নপ্রসবা হরিণী ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়া প্রাণভয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে ভরতের আশ্রমের সম্মুখে এক খাল পার হইতেছিল। খালের এপারে হরিণশিশুকে প্রসব করিয়া হরিণী পলায়ন করিল। ভরত অসহায় হরিণশিশুকে কুড়াইয়া আনিয়া সযতনে পালন করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদাই হরিণশিশুর চিন্তা করিতেন এবং অবশেষে হরিণ-

শিশুগতপ্রাণ হইয়া গেলেন। অন্তিমকালে তিনি হরিণশিশুর চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া পরজন্মে তিনি হরিণ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যে ব্যক্তি ওঁ অর্থাৎ ব্রহ্মধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিবেন তিনি ব্রহ্মপদই প্রাপ্ত হইবেন। আজীবন প্রাণভরে ওঁ মন্ত্র না সাধিলে কেহ মৃত্যু-কালীন ভীষণ যন্ত্রণার সময়ে ওঁ এই কথাটী বলিতে পারে না।

"যস্ত্বক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স এব কৃপণঃ।"

হে গার্গি যে ব্যক্তি 'ওঁ' ইহাকে অবগত না হইয়া এই পৃথিবী হইতে প্রস্থান করে অর্থাৎ মরিয়া যায়, সেই কৃপণ বা হতভাগা।

প্রচুর অর্থ থাকিতে যে ব্যক্তি উহার সদ্ব্যবহার না করে বা ভোগ না করে লোকে তাহাকে কৃপণ বা হতভাগা বলে অর্থাৎ সে ব্যক্তি কৃপার পাত্র; সেইরূপ যে ব্যক্তি 'ওঁ' ইহাকে না জানে সেই কৃপার পাত্র।

(২) প্রাণায়াম, তপস্যা ইত্যাদি দ্বারা আত্মদর্শন হয়; কিন্তু ইহা আদৌ সহজসাধ্য নহে। প্রাণায়াম ক্রিয়া প্রকৃতভাবে না হইলে অনেক সময়ে উল্টা ফল ফলে। অনেককে পাগল হইতে দেখা গিয়াছে।

(৩) সৎকর্ম্মের সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া না গেলে মানুষের সমস্ত পথই শুদ্ধ হইবে না। জনকঋষি প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যে যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ তালিকা কোথায় পাওয়া যাইবে?

(৪) সত্যকে আশ্রয় করিলে ব্রহ্মকে আশ্রয় করাই হয় কারণ ব্রহ্ম সত্য। ব্রহ্মকে আশ্রয় করিলে আত্মাকে আশ্রয় করা হয়। যেহেতু আত্মাও সত্য, সত্যকে আশ্রয় করিবার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে আত্মা পুনঃ পুনঃ আঘাত করে। কামাদি ষড়্রিপুর বা শয়তানের প্ররোচনায় সত্য অপসারিত হইয়া যায় বলিয়াই মানুষের এত অধঃপতন। অনেকের ধারণা সত্য একটা

মস্ত জিনিষ যাহা লোকের আয়ত্ত বা অধীন নহে; কিন্তু তাহা আদৌ নহে, সত্যকে আশ্রয় করা বড় একটা শক্ত কাজ নহে। সামান্য চেষ্টা করিলেই ইহা অভ্যস্ত হইয়া যায়। প্রথম প্রথম ইহা লোকদেখান হইতে পারে কিন্তু পরে ইহা মজ্জাগত হইয়া যায়। সামান্য উদাহরণ যথা—

মনে করুন আমি চিংড়ি মাছ দিয়া ভাত খাইয়া আসিয়াছি। আপনি আমাকে বলিলেন "মহাশয় কি দিয়া ভাত খাইয়া আসিলেন?" যেহেতু আমি চিংড়ি মাছ দিয়া ভাত খাইয়া আসিয়াছি, ইহা সত্য, আত্মা মনকে বলিল "বল, চিংড়ি মাছ দিয়া ভাত খাইয়া আসিয়াছি।" ষড়রিপু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল "ওরূপ বলিলে তোমার মানের হানি হইবে, অতএব বল, আমি রুইমাছ দিয়া ভাত খাইয়া আসিয়াছি।" মন মুখের সাহায্যে তাহাই বলিল। ইহারই নাম সত্যের অপলাপ। চিংড়ি দিয়া ভাত খাইয়া আসিয়াছি বলাটা এমন গুরুতর কাজ নহে। অবশ্য কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। সত্যকে আলিঙ্গন করিতে প্রাণায়াম ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না, গেরুয়া বসন বা মালা পরিধান করিতে হয় না বা স্ত্রীপুত্রাদি ত্যাগ করিতে হয় না; কেবল ভিতর ও বাহির এক করিলেই হইল।

"ভিতর বাহির সমান রাখ মানুষ যদি হ'তে চাও।"

"If to your heart your tongue be true,
Why hunt for words with much ado."

যদি অন্তরের সহিত মুখের সদ্ভাব থাকে, তবে শব্দের জন্য ভাবিতে হয় না। ভাষা আপনি আসিয়া জুটিবে।

"That which goeth into the mouth not defileth a man,
But that which cometh out of it, this defiles the man."

যাহা মুখের ভিতর প্রবেশ করে তাহা মনুষ্যকে কলুষিত করে না, কিন্তু যাহা মুখ হইতে বহির্গত হইয়া আসে ইহাই তাহাকে কলুষিত করে।

খাদ্য মুখের ভিতরে প্রবেশ করে এবং বাক্য মুখ হইতে বহির্গত হইয়া আসে। সহমত খাদ্য খাওয়া যাইতে পারে কিন্তু বাক্য (অসত্য) হইতে সাবধান হইতে হইবে। আবার যে সব খাদ্যে চিত্ত চাঞ্চল্য জন্মে সেই সব খাদ্য বর্জ্জন করা উচিত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কর্ম্ম তিন প্রকার—কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম। অকর্ম্মই বিকর্ম্ম আনয়ন করে। কর্ম্ম না করা অপেক্ষা সকাম কর্ম্ম করা অনেক ভাল। কর্ম্ম না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে মনে নানা প্রকার কুচিন্তাই আসে।

"In works of labour or of skill,
I would be busy too.
For Satan finds some mischief still,
For idle hands to do."

শ্রম ও নিপুণতা বিষয়ক কার্য্যে আমি সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিব, কারণ অকর্ম্মার জন্য শয়তান সর্ব্বদাই কিছু না কিছু দুষ্কর্ম্ম ঠিক করিয়া রাখে।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তে যূপজায়তে।" গীতা

বিষয় ধ্যান করিতে করিতে মানুষের তাহাতে আসক্তি আসিয়া পড়ে। ইহা খুবই সত্য যে এই প্রকার কুচিন্তা—মানুষকে পরে বাস্তবিক কুকার্য্যে ধাবিত করে।

এক দরিদ্র ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণ তিন দিন ভিক্ষা না পাইয়া আত্মহত্যা করিবার মানসে নিকটবর্ত্তী সরোবরে অবগাহন স্নান করিয়া প্রাণভরে (উচ্চ

মগজ ও নিম্ন মগজ একত্র করিয়া) তত্রাবস্থিত মহাকাল ভৈরবের পূজা সমাপন করতঃ বর প্রার্থনা করিলেন "হে প্রভো, বড় দুঃখের জ্বালায় আত্মহত্যা করিব, অনুগ্রহ করিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি দিবেন।" একগলা জলে নামিলে এক জটাধারী সন্ন্যাসী তাঁহাকে আত্মহত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ বলিলেন "তিল তিল করিয়া মরা অপেক্ষা একেবারে মরা ভাল।" তাহাতে সন্ন্যাসী বলিলেন "বৎস, অন্নাভাবে মরিতে হইবে না। আমি তোমাকে এক চেলা দিতেছি; এই চেলাকে তুমি যখন যাহা হুকুম করিবে, অসাধ্য হইলেও সে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবে; কিন্তু কাজ না পাইলে সে তোমার ঘাড় ভাঙ্গিতে কুণ্ঠিত হইবে না।" ব্রাহ্মণ চেলাকে আদেশ করিলেন "আইস আমার সঙ্গে।" চেলা কাজ পাইয়া ব্রাহ্মণের অনুগমন করিল। গৃহে উপস্থিত হইয়া চেলা ব্রাহ্মণের আদেশমত তাহার যাবতীয় অভাব পূরণ করিয়া দিল। ব্রাহ্মণের আর অভাব নাই। তখন চেলা বলিল "ব্রাহ্মণ, কাজ দাও, নচেৎ তোমার ঘাড় ভাঙ্গিব।" ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া চেলাকে বলিল "আইস আমার সঙ্গে।" ব্রাহ্মণ চেলাকে সঙ্গে লইয়া সরোবরে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে মহাকাল ভৈরবকে ডাকিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকথিত সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকে দর্শন দিলে ব্রাহ্মণ বলিলেন "প্রভো, আপনার চেলা ফিরাইয়া লউন। আমার আর অভাব নাই" তাহাতে সন্ন্যাসী বলিলেন "এখন অভাব নাই। পরে ত অভাব হইতে পারে, তখন কি করিবে? চেলা ত্যাগ করিলে চলিবে না। আমি তোমাকে এক উপদেশ দিতেছি শুন। চেলাকে গৃহে লইয়া গিয়া এক হাত অন্তর গিরা বা পাপ বিশিষ্ট একশ আট হাত লম্বা একখানি বাঁশ আনিতে আদেশ করিবে। অসম্ভব হইলেও চেলা তাহা করিবে। পরে তাহাকে বাঁশটী মাটীতে পুঁতিয়া এক একটী গণিয়া বাঁশটীর অগ্রভাগে উঠিতে এবং পুনরায় গণিয়া নামিতে আদেশ করিবে। এইরূপে চেলা উঠিতে ও নামিতে থাকিবে; পরে যখন তোমার কোনও দ্রব্যের প্রয়োজন

হইবে, তাহার দ্বারা করাইয়া লইবে এবং আবার তাহাকে উঠিতে ও নামিতে বলিবে। ইহাতে সে তোমার ঘাড় ভাঙ্গিবার অবসর পাইবে না; অধিকন্তু তোমার যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, তাহা তাহার দ্বারা করাইয়া লইতে পারিবে।” ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে গিয়া তাহাই করিলেন।

এই চেলাই আমাদের মন। মনের সাহায্যে যাবতীয় সুকর্ম্ম করা যাইবে; মন না থাকিলে চলিবে না; কারণ ভগবান কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগকে মনের আজ্ঞাকারী করিয়াছেন। ধন্য তাঁহার লীলা! কর্ম্ম না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে মন কুচিন্তা দ্বারা আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে।

ইহাই ১০৮ দানাযুক্ত মালার সৃষ্টি। যখনই কাজ থাকিবে না, মালা ঘুরাইয়া ভগবানের নাম জপ কর। তাহাতে যদি প্রবৃত্তি না আসে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ কর বা সাধুসঙ্গ কর; তাহা হইলে কুচিন্তার হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

সংসাররূপ বিষবৃক্ষের দুইটী মাত্র মধুর ফল—সদ্‌গ্রন্থ পাঠ এবং সাধু জনের সহিত সহবাস। ভগবানের নাম জপিলে ইহকালে এবং পরকালে সুখ ও শান্তি।

“শতং ত্যক্ত্বা স্নানং সহস্রং বিহায় ভোজনম্।
লক্ষং পরিত্যজ্য পরোপকারং কোটিং ত্যক্ত্বা হরিং ভজ॥”

শত কাজ ফেলিয়া স্নানটা করিয়া লইবে। হাজার কাজ ছাড়িয়া দুটো খেয়ে নেবে। লক্ষ কাজ ফেলিয়া পরোপকার বা ভগবৎ কর্ম্ম করিবে এবং কোটি কাজ রাখিয়া হরির ভজনা করিবে।

ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য—

স্নান, ভোজন, পরোপকার এবং হরিভজনা এই চারিটীই অত্যাবশ্যক। পারতপক্ষে এই চারিটী কার্য্যই প্রত্যহ করা উচিত। এমন দিন হইতে পারে যেদিন স্নান হইল না, তাহাতে বিশেষ আসে যায় না, কিন্তু ভোজন,

পরোপকার ও হরিভজনা করা চাই। আবার এমন হইতে পারে যেদিন স্নান ও আহার হইল না, তাহাতেও আসিয়া যায় না, কিন্তু পরোপকার ও ঈশ্বরারাধনা করা চাই। যদিই বা এমন দিন হয় যেদিন স্নান, আহার ও পরোপকার হইল না, তাহাতেও বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু এমন দিন যেন কভু না আসে যেদিন হরিভজনা হইবে না। ভগবদারাধনা সর্ব্বোপরে।

কর্ম্ম করিতেই হইবে। কিন্তু—

"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽত্র মোহিতাঃ।" গীতা ৪।১৬

কোন্‌টী সুকর্ম্ম ও কোন্‌টী কুকর্ম্ম এ বিষয়ে মহামহাপণ্ডিতগণও মুগ্ধ হইয়াছেন।

"কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥"

সুকর্ম্ম জানিতে হইবে। বিকর্ম্ম বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম কি কি তাহাও জানিতে হইবে। আবার অকর্ম্মের বা শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয় অতি দুর্জ্জেয়।

"তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।" গীতা ৪।১৬

আমি কর্ম্ম অর্থাৎ সুকর্ম্ম সম্বন্ধে তোমাকে বলিতেছি; ইহা জানিয়া কার্য্য করিলে তুমি অমঙ্গল হইতে মুক্ত হইবে।

কয়েকটী কর্ম্মের তালিকা :—

(১) সর্ব্বদা সত্যকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিবে।

একদা রাজা বিক্রমাদিত্য হাট বসাইবার সময়ে ঘোষণা করিয়া দিলেন হাটে যাহা বিক্রীত হইবে না তিনি তাহা ক্রয় করিয়া লইবেন। একদিন এক কুমার হাটে অলক্ষ্মীর প্রতিমা আনিয়াছিল। অলক্ষ্মী বলিয়া কেহ উহা ক্রয় করে নাই। হাট ভাঙ্গিয়া গেলে রাজা পাত্রমিত্রসহ হাটে প্রতিমাখানি

অবিক্রীত দেখিয়া কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন উহা কিসের প্রতিমা। কুমার বলিল উহা অলক্ষ্মীর প্রতিমা। রাজা প্রার্থিত মূল্য দিয়া প্রতিমা লইতে উদ্যত হইলে মন্ত্রী বাধা দিয়া বলিলেন "মহারাজ, অলক্ষ্মী লইবেন না, রাজ্য ছারখার হইয়া যাইবে।" রাজা মন্ত্রীর নিষেধবাক্য শ্রবণ না করিয়া মূল্য দিয়া প্রতিমাখানি গৃহে লইয়া গেলেন। রাজমাতা, রাণী প্রভৃতি সকলেই আপত্তি করিলেন, কিন্তু রাজা কাহারও কথা শুনিলেন না। তিনি প্রতিমাখানি নিজ বহির্বাটীতে রাখিয়া দিলেন। এদিকে রাজ্যে নানাপ্রকার অশান্তির কারণ দেখা গেল। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে রাজা চিন্তিতচিত্তে সিংহদ্বারে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তিনি এক দেবী মূর্ত্তিকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিলেন। রাজা মূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "কে মা আপনি, কোথায় যান্?" মূর্ত্তি বলিলেন "আমি লক্ষ্মী, তুমি গৃহে অলক্ষ্মী আনিয়া আমাকে তাড়াইয়াছ, আমি অলক্ষ্মীর সহিত একগৃহে বাস করি কি করিয়া?" রাজা বলিলেন "যান"। অল্পক্ষণ পরে এক দেবমূর্ত্তিকে বাহির হইতে দেখিয়া রাজা বলিলেন "কে আপনি প্রভো?" মূর্ত্তি বলিলেন "আমি নারায়ণ, যেখানে লক্ষ্মী সেইখানেই নারায়ণ; লক্ষ্মী চলিয়া গেলেন, আমি থাকি কি করিয়া?" রাজা প্রণত হইয়া বলিলেন "যান"। এইরূপে এক কম তেত্রিশ কোটি দেবতা একে একে চলিয়া গেলেন। রাজা সকলকেই প্রণাম করিয়া বলিলেন "যান"।

অবশেষে ধর্ম্ম অতি সন্তর্পণে আসিলেন। রাজা বলিলেন "কে আপনি?" মূর্ত্তি বলিলেন "আমি ধর্ম্ম; সকল দেবতাই চলিয়া গেলেন, আমিই বা একা থাকি কি করিয়া?" রাজা বলিলেন "ঠাকুর, তাহা হইবে না। আমি ধর্ম্ম বা সত্য রক্ষা করিবার জন্যই অলক্ষ্মী গৃহে আনিয়াছি। অপর দেবতারা চলিয়া যান তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু আপনি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিবেন? আপনি চলিয়া গেলে কেহই আর ধর্ম্ম বা সত্য রক্ষার জন্য

ব্যস্ত হইবে না। সত্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া রাখিয়াছে, ইহা আমি গুরুমুখে শুনিয়াছি।" রাজার ঈদৃশ যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম ফিরিয়া গেলেন এবং অবশেষে সকল দেবতাই এমন কি লক্ষ্মী ও নারায়ণ রাজগৃহে ফিরিয়া গেলেন। লক্ষ্মী অলক্ষ্মীর সহিত একগৃহে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

যাহার ধর্ম্ম আছে তাহার সবই আছে।

মনে করুন ছয়জন দস্যু এক গ্রামের প্রান্তভাগে আমাকে ঘিরিয়াছে। প্রাণভয়ে অদূরস্থিত এক ব্যক্তির সাহায্য চাহিলাম। তিনি বলিলেন "শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া বাহির হইয়া আইস।" প্রত্যেক শত্রুই যে আমা অপেক্ষা অধিক বলবান্। আমি কেমন করিয়া তাহাদের সকলকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইব? ইহাই ত সমস্যা। এরূপ উপদেশ অকিঞ্চিৎকর; ইহা আদৌ ফলপ্রদ নহে। যদি অন্য দয়ালু ব্যক্তি আমার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া নিজগৃহ হইতে একটী আগ্নেয়াস্ত্র আনয়ন করিয়া দূর হইতে ছুড়িয়া দেন ও বলেন "অস্ত্রটী প্রত্যেক শত্রুর প্রতি লক্ষ্য কর" বুঝিতে হইবে এই ব্যক্তিই আমার পরম হিতৈষী, কারণ আমি দেখিলাম আগ্নেয়াস্ত্রটী ছুড়িতেও হইল না; উহা দস্যুদিগের প্রতি লক্ষ্য করিবামাত্র প্রত্যেক শত্রুই প্রাণভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক পলায়ন করিল। শত্রুরা জানিত তাহাদের অসি ও লাঠি এই আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে কিছুই নহে।

অসি ও লাঠিধারী শত্রুরা আমার ষড়রিপু এবং আগ্নেয়াস্ত্র সত্য। এই শয়তান বা ষড়রিপু একমাত্র (বজ্র বা) সত্যের নিকটে পরাজিত হয়, আর কাহারও নিকটে নহে। ষড়রিপু সত্যের নিকটে ঘেঁষিতে পারে না। যে ব্যক্তি সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন ষড়রিপু তাঁহার নিকট হইতে মহাবলশালী হস্তিগণ যেরূপ সিংহদর্শনে পুচ্ছ উত্তোলনপূর্ব্বক পলায়ন করে সেইরূপ দূরে পলাইয়া যায়।

"শুনিয়ে গোবিন্দ রব, আপদ পলাবে সব,
রে এএ এএ
(ও ভাই) সিংহরবে যেন করিগণ
রে এএএএ।"

ষড়রিপু বা শয়তানই মানুষের আপদ। অব্যক্ত শক্তি, অব্যক্তশক্তির নাদ, ওঁ, হরি, গোবিন্দ, রাম, সত্য প্রভৃতি সবই এক কৃষ্ণ।

গীতার

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই শক্তিই আগ্নেয়াস্ত্র ও ভয়ানক প্রবল।

(২) বর্ণোচিত নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম করিবে।

আজকালকার অনেকের ধারণা সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্মে কোন ফল নাই; ইহাতে অযথা সময় নষ্ট হয় ও ইহা বুজরুকী। ফল না থাকিলে শুধু শুধু কোন কর্ম্মের ব্যবস্থা হয় নাই বা হয় না। সন্ধ্যা করিতে হইলে পুনঃপুনঃ উঠিতে ও বসিতে হয়, তাহাতে শারীরিক ব্যায়াম বা ড্রিলের কাজ হয়। তাহাতে বাতাদি পীড়া শরীরে আশ্রয় করিতে পারে না। প্রাতঃসন্ধ্যা অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ করিতে হয়, তাহাতে অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগের অভ্যাস হয়। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ আয়ুর্বৃদ্ধির লক্ষণ। যিনি প্রত্যহ অরুণোদয় দর্শন করেন অর্থাৎ সূর্য্যদেবের জবাফুলের রংএর ন্যায় লালমূর্ত্তি অবলোকন করেন তিনি এক শত কুড়ি বৎসরের কম বাঁচিতে পারেন না।

যখন সূর্য্যদেব চক্রবালের উপরে লালমূর্ত্তিতে উদিত হন, তখন প্রকৃত সূর্য্য চক্রবালের নীচে থাকেন। আলোকরেখার দিগ্‌বিবর্ত্তন (refraction) হেতু সূর্য্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি (image) চক্রবালের উপরে দেখায় মাত্র।

সূর্য্যাস্তের সময়েও প্রকৃত সূর্য্য চক্রবালের নীচে নামিয়া গেলেও উহার প্রতিমূর্ত্তি (লালবর্ণের সূর্য্য) চক্রবালের উপরে দেখায়। প্রকৃত সূর্য্য অতীব জ্যোতির্ম্ময়, সুতরাং উহার দিকে তাকান যায় না। শুনা গিয়াছে বহু বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পশ্চিম আকাশে দুইটী সূর্য্য দৃষ্ট হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে একটী ভাক্ত (false) সূর্য্য। দ্বাদশ সূর্য্যের উদয়ও নিতান্ত অসম্ভব নহে।

সূর্য্যদেব নাকি কৃষ্ণের আদেশে সর্ব্বদাই নিজ বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণ করিতেছেন এবং তাহাতেই আলোক ও তাপ উৎপন্ন হইতেছে। কেহ কেহ বলেন সূর্য্যের আলোক ও তাপ অনবরত বিকীর্ণ হওয়ায় এমন দিন আসিবে যখন আলোক ও তাপ নিঃশেষিত হইয়া যাইবে; সুতরাং পৃথিবীর ধ্বংস হইবে। সাগর হইতে জল বাষ্পাকারে অনবরত উত্থিত হইতেছে, কিন্তু তাহা বলিয়া সাগরের জল কমে না, কারণ ঐ জলরাশি বৃষ্টিরূপে ভূপতিত হওয়ায় নদী মারফতে আবার সাগরে আসিয়া পড়ে। সূর্য্যরশ্মি ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া প্রতিফলিত হইয়া পুনরায় সূর্য্যমণ্ডলে মিশে; সুতরাং আলোক ও তাপের অভাবে পৃথিবীর ধ্বংস হইবে এভয় বোধ হয় আমাদিগের থাকিবার কারণ নাই। পৃথিবীর সহিত কোন গ্রহ বা উপগ্রহের সংঘর্ষে পৃথিবীর ধ্বংস হইবে, এধারণা বা ভয়েরও কোন কারণ নাই, কারণ মঙ্গলময় ভগবানের ইচ্ছা তাহা নহে। অনেক সময়ে মনুষ্য গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছিল হালেসাহেবের ধূমকেতুর সংঘর্ষে পৃথিবীর ধ্বংস হইবে, ভূমিকম্প দ্বারা পৃথিবীর ওলটপালট হইয়া যাইবে, কিন্তু কই আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর ধ্বংস ত হয় নাই। লীলাময়ের লীলার অবসান হইলেই পৃথিবীর কেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হইবে। যখন সমস্ত আত্মাই ব্রহ্মে লীন হইয়া যাইবে, তখনই বিশ্বের ধ্বংস হইবে, তাহাও কৃষ্ণের ইচ্ছায় অর্থাৎ তিনি বিশ্ব হইতে শক্তি কাড়িয়া লইলে তবে বিশ্বের ধ্বংস হইবে। সে এখন অনেক

বিলম্ব। কতদিন বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে তাহা মানুষ আজ পর্য্যন্ত বলিতে সমর্থ হয় নাই এবং কতগুলি আত্মা আজ পর্য্যন্ত ব্রহ্মে লীন হইয়াছে তাহাও জানিবার উপায় নাই। সুতরাং পৃথিবী বা বিশ্বের ধ্বংস সম্বন্ধে আমাদের মাথা ঘামাইবার কোনও কারণ নাই; তবে ইহা অনুমিত হইতে পারে যে বর্ত্তমান সময়ে জীবাত্মাগণের কর্ম্ম ঘোরতরভাবে চলিতেছে।

সন্ধ্যা আহ্নিক করিবার সময়ে কিছুক্ষণ গোড়ালি উত্তোলন করিয়া থাকিতে হয় এবং মেরুদণ্ড পৃথিবীর সহিত লম্ব রাখিতে হয়। ইহাতে শরীরে সহসা কোন রোগ প্রবেশ করিতে পারে না।

দেখা গেল সন্ধ্যা আহ্নিক ক্রিয়া শরীরের উপর ক্রিয়া করে। ইহা মনের উপরেও ক্রিয়া করে।

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভাল হ'য়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে॥"

শিশু ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতেছে যেন সে সমস্ত দিনই সৎ হইয়া কার্য্য করে। অহর্নিশ ভাল হইবার ইচ্ছা করিলে কোন মনুষ্যই ভাল না হইয়া যায় না।

বেদপাঠ না করিয়া গায়ত্রী জপ করা উচিত নহে; কারণ সাধারণ ব্রাহ্মণকে যে গায়ত্রী জপ করিতে হয় উহা ব্রহ্মগায়ত্রী। গায়ত্রী বহু প্রকারের আছে যথা—কৃষ্ণগায়ত্রী, রামগায়ত্রী, লক্ষ্মীগায়ত্রী ইত্যাদি।

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠে ভবেৎ বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

জন্মমাত্র মানুষ শূদ্র হইয়া থাকে, দশবিধ সংস্কার হইলে তাহাকে দ্বিজ বলে। বেদপাঠ করিলে বিপ্র হয় এবং যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ।

সুতরাং বিপ্রের উপরে ব্রাহ্মণ।

সন্ধ্যা আহ্নিকের পূর্ব্বে যিনি প্রত্যহ নিম্নলিখিত শ্লোকটী অন্তরের সহিত আবৃত্তি করেন, তিনি সৎ না হইয়া থাকিতে পারেন না।

"ওঁ অসতো মা সদ্গময়,
ওঁ তমসো মা জ্যোতির্গময়।
ওঁ মৃত্যোর্মামমৃতং গময়,
ওঁ আবিরাবি র্ময়েধি।"

হে ভগবন্! তুমি আমাকে অসৎ হইতে সতে লইয়া চল। তুমি আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া চল, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া চল। হে আবির্ম্ময়, হে চিরপ্রকাশ, তুমি আমাতে আবির্ভূত হও। চিদচিৎ যে তোমার প্রকাশবিলাস, তোমার বিকাশে যে সর্ব্বপ্রকাশ, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও।

ষোল আনা চাহিলে ছয় আনাও পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে আত্মার উপরেও ক্রিয়া হয়; কারণ ইহা হইতে ভগবানের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করা যায়।

তৈল মাখিবার উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে আমাদের লোমকূপের নীচে একটী করিয়া ক্ষুদ্র বাটী (cell) আছে। লোমকূপের অগ্রভাগ বাটী স্পর্শ করিয়া থাকে না। লোমকূপের অগ্রভাগ ও বাটীর মধ্যে কিছু স্নেহময় পদার্থ থাকে। এই তৈলময় পদার্থ লোমকূপের অগ্রভাগের নীচে পড়িয়া গেলেই সেই স্থানের চর্ম্ম ফাটিয়া যায়। গা-ফাটা, পা-ফাটা, ঠোঁট-ফাটার ইহাই কারণ। স্নেহময় দ্রব্য কমিয়া গিয়া লোমকূপের নীচে পড়িয়া গিয়াছে কিনা ইহাত আমরা দেখিতে পাই না। তৈল মর্দ্দন করাতে যদি প্রকৃতপক্ষে বাটীর তেল

কমিয়া গিয়া থাকে, তবে লোমকূপের অগ্রভাগ দিয়া অতি সামান্য পরিমাণে তেল বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাটীটী পূর্ণ করিয়া দেয়, আর যদি তেল না কমিয়া থাকে, তবে বাহিরের তেল ভিতরে প্রবেশ করে না।

সূর্য্য রশ্মিতে সাতটী রং থাকে। এই সাতটী রং রামধনুতে দেখা যায় এবং ইহাদের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। একটী গোল কাঠের চাকায় পর পর সাতটী রং লাগাইয়া চাকাটী অতি দ্রুত ঘুরাইলে মনে হইবে শ্বেতবর্ণের চাকা ঘুরিতেছে। এই সাতটী রং অক্ষিগোলকের পশ্চাদাবরক ঝিল্লিতে (retina) এত দ্রুত আসিয়া পড়ে যে, মন সাতটী পৃথক রং ধারণা করিতে সময় পায় না; সেইজন্য শ্বেতবর্ণ মনে হয়। চলচ্ছবিতে (bioscope) ঐরূপ প্রক্রিয়া হয় বলিয়া ছবি হাত পা নাড়িতেছে মনে হয়।

এই সাতটী রংএর মধ্যে লাল ও নীল প্রধান। মানবশরীরে এই সাতটী রংএর একটী বা ততোধিক রংএর অভাব হইলে তদনুযায়ী পীড়া হয়। সেই রং বা সেই সেই রং শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে পীড়ার উপশম হয়। এইরূপ অভিনব চিকিৎসা বর্ত্তমান যুগে অজ্ঞাত নহে। আমাদের শরীরের মধ্যে কোন্ রংটী কমিয়া গিয়াছে তাহাত আমরা জানিতে পারি না।

প্রাতঃকালে 'সন্ধ্যা' করিবার সময়ে গায়ত্রীর ব্রহ্মরূপ ধ্যান করিতে হয়। ব্রহ্মা লাল রংএর। সাধারণতঃ ১০৮ বার গায়ত্রী জপিতে হয়। অনেকে সময়াভাবে হয়ত দশ বার বা আঠার বার গায়ত্রী জপ করেন। ১০৮ বার গায়ত্রী জপিতে অন্ততঃ এক কোয়াটার সময় লাগে।

"ওঁ কুমারী মৃগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডল সংস্থিতাম্॥"

সুতরাং যদি লাল রংএর অভাব হইয়া থাকে, তবে পনর মিনিট ধরিয়া লাল রংএর চিন্তা করিতে থাকায়, সেই অভাবের পূরণ হইয়া যাইতে পারে।

মধ্যাহ্নে গায়ত্রীর বিষ্ণুরূপ ধ্যান করিতে হয়। বিষ্ণু নীল রংএর।

"ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসম্।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্॥"

যদি নীল রংএর অভাব হইয়া থাকে, তবে নীল রংএর গায়ত্রী ধ্যান করিতে করিতে তাহার পূরণ হইতে পারে।

সায়ংকালে গায়ত্রীর শিবরূপ ধ্যান করিতে হয়। শিব শ্বেতবর্ণের এবং শ্বেতবর্ণ সাতটী রংএর সমষ্টি।

"ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদ-সমাযুতাম্॥"

সুতরাং দুই বা ততোধিক রংএর অভাব হইলে, শ্বেতবর্ণের গায়ত্রী চিন্তা করিতে করিতে তাহাদিগের অভাব পূরণ হইয়া যাইতে পারে।

মনের সহিত শরীরের খুব নিকট সম্বন্ধ।
"Sound mind in a sound body."

'সন্ধ্যা' সূর্য্যদেবের উপাসনা। আমরা ভগবানকে দেখিতে পাই না। সূর্য্যই তাঁহার প্রতিনিধি। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী বিরাট পুরুষই ভগবান। সূর্য্যকে সবিতা বা সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হয়।

সূর্য্যার্ঘের মন্ত্র ঃ—

"ও নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥"

বিষ্ণু বা ভগবানের তেজে তেজঃ প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যদেব জগৎ প্রসব করিয়াছেন।

সূর্য্যের প্রণাম মন্ত্র :—

"নমঃ সবিত্রে জগদেক চক্ষুষে,
জগৎ প্রসূতি স্থিতিনাশ হেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্ম ধারিণে,
বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করাত্মনে॥"

ইহাতে সূর্য্যকে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশের হেতু বলা হইয়াছে।

অধিকন্তু উচ্চৈঃস্বরে সন্ধ্যার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে উচ্চ মগজ ও নিম্ন মগজ এক হইতে পারে। সন্ধ্যার প্রাণায়ামের সময়েও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের রূপ চিন্তা করিতে হয়। প্রাণায়ামে শ্বাসরোধ হওয়ায় আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়।

স্বাস্থ্যই সকল সম্পদের মূল (health is wealth) ইহা কে না জানেন? যদি সন্ধ্যা আহ্নিক ইত্যাদি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে তবে তাহা করা উচিত নহে কি? যিনি প্রত্যহ নিয়মমত অর্থাৎ উচ্চ মগজ ও নিম্ন মগজ একত্র করিয়া ত্রিসন্ধ্যা করেন, তাঁহার কোন প্রকার পীড়া সহসা হইতেই পারে না। শাস্ত্রসকল স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অর্থাৎ দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে ইহা বিশ্বাস করিতে যদি কেহ প্রস্তুত না হন তবে আর উপায় নাই। মানুষ যতই দীর্ঘজীবন লাভ করিবে, ততই তাহার জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে। মানুষের যতই জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে, ততই সে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবে।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাণাঃ সংস্থিতি হেতবঃ।"

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গফলের মূল হইতেছে প্রাণ বা জীবন। সুতরাং দীর্ঘজীবন লাভ করিলে চতুর্ব্বর্গের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বঙ্কিমবাবুর 'রজনী' গ্রন্থে ডাক্তারবাবুর বিমাতা লবঙ্গলতা নিজ সতীন-পুত্রকে কাণা ফুলওয়ালী রজনীর প্রতি আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে কাশীধাম

হইতে এক সন্ন্যাসীকে আনয়ন করিয়াছিলেন। ডাক্তারবাবুর ঘরের সম্মুখের ঘরে সন্ন্যাসী আড্ডা লইয়াছিলেন। সন্ন্যাসী প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে তারস্বরে বেদপাঠ করিতেন বলিয়া একদিন ডাক্তারবাবু বলিয়াছিলেন "সন্ন্যাসি, প্রত্যহ বুজরুকি করেন কেন?" সন্ন্যাসী বলিলেন "কোন্‌টা বুজরুকি, ডাক্তারবাবু?" ডাক্তারবাবু বলিলেন "এই চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া বেদপাঠ ইত্যাদি; ইহাতে কি ফল হয়?" সন্ন্যাসী বলিলেন "আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি ত অনেক বহি পড়িয়াছেন; বলুন দেখি, কোকিল ডাকে কেন?" ডাক্তারবাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "আমার বোধ হয় কোকিল ডাকে দুইটী কারণে, প্রথমতঃ পুং কোকিল ডাকিয়া স্ত্রী কোকিলকে মোহিত করিয়া নিজ সান্নিধ্যে আনয়ন করে এবং দ্বিতীয়তঃ কোকিলকে ভগবান ডাকিতে দিয়াছেন, কোকিলের ডাকিয়াই সুখ।" তখন সন্ন্যাসী বলিলেন "ডাক্তারবাবু, আমারও ঠিক তাই। আমার মন আত্মার বশে আসিতে চায় না। আমি তারস্বরে মন্ত্রসকল উচ্চারিত করিয়া মনকে আত্মার বশে আনিবার চেষ্টা করি মাত্র এবং উচ্চ মগজকে নিম্ন মগজের পাশে রাখিবার চেষ্টা করি। দ্বিতীয়তঃ ভগবান মনুষ্য সৃজন করিয়াছেন, প্রত্যেক মনুষ্যের তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা দেখান উচিত।"

"মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ,
পাণিদ্বয়ং ভোক্তুম মন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্ত,
কৌপীণবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥" কৌপীণ পঞ্চকম্।

যিনি কৌপীণ ধারণ করিয়া বৃক্ষের মূলদেশে বাস করেন অর্থাৎ যিনি গৃহ নির্ম্মাণ না করিয়া পাদপমূলে বাস করিয়া কালাতিপাত করেন, ভগবান হস্তদ্বয় দিয়াছেন খাদ্যদ্রব্যের আহরণের জন্য নহে অর্থাৎ তাঁহাকে উপাসনা

করিবার জন্য এই ভাব যিনি মনে পোষণ করেন, লোকে ছিন্ন কন্থা (কাঁথা) দেখিলে যেমন ঘৃণা করিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ লক্ষ্মী বা অর্থকে যিনি ঘৃণা করেন অর্থাৎ যিনি অর্থ সঞ্চয়ের প্রয়াস করেন না, তিনিই ভাগ্যবান।

"ডাক্তারবাবু, আমারও ভগবানকে ডাকিয়া সুখ। যে ডাকে সেই জানে ভগবানকে ডাকিয়া কত সুখ। ভগবানকে ডাকিয়া যাহার নয়নাশ্রু বহির্গত না হয় তাহার ডাকা বৃথা। উচ্চ মগজের সহিত নিম্ন মগজ এক হইলেই, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর্দ্বয় হইতে অশ্রু গড়াইবে।"

(৩) প্রত্যহ জপসমাপনান্তে মৃত পিতা ও মাতার উদ্দেশে মন্ত্রযুক্ত বা মন্ত্রহীন হইয়া এক গণ্ডুষ জল দিবে। ইহাতে তাঁহাদের স্মরণ হয়। মন্ত্র যথা :—

ওঁ পিতা তৃপ্যতু, ওঁ মাতা তৃপ্যতু, ওঁ পিতরস্তৃপ্যন্তাং॥

পরে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে হয়।

পিতার প্রণাম মন্ত্র যথা :—

পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥

পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই স্বর্গ, পিতাই শ্রেষ্ঠ তপ, পিতা সন্তুষ্ট থাকিলে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট থাকেন।

গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণের বৃদ্ধ পিতা ও মাতা ছিলেন। তিনি তপস্যার্থ বনে যাইবার অভিপ্রায় জানাইলে, তাঁহার পিতা বলিলেন "বৎস, তুমি যখন অসহায় ছিলে, আমি তোমাকে পালন করিয়াছি, এক্ষণে তুমি কৃতী হইয়াছ এবং আমি বৃদ্ধ হওয়ায় অসহায় শিশু হইয়া গিয়াছি। তোমার বৃদ্ধ পিতা ও মাতাকে সেবা করাই তোমার প্রধান কাজ। পিতামাতার সেবা করিলে গৃহে বসিয়াই যাবতীয় ফল পাওয়া যায়; অতএব তুমি বনে গমন করিও না, করিলে নিশ্চয়ই তোমার পাপ হইবে।" গৌতম পিতার

কথা না শুনিয়া বনে গেলেন এবং দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিলেন। পরে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি দেখিলেন দীর্ঘ দ্বাদশবৎসর ধরিয়া গভীর তপস্যা করায় তাঁহার কেশ জটায় পরিণত হইয়াছে এবং তাঁহার শরীর অস্থিচর্ম্মময় হইয়া গিয়াছে। ইহাতে তাঁহার তমোভাবের উদয় হইয়াছিল। এক্ষণে ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় তিনি নিকটস্থ সরোবরে স্নান করিয়া আহারের সন্ধানে কোন ব্রাহ্মণের বাড়ীর দিকে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক বক অন্তরীক্ষে উড়িয়া যাইবার সময়ে বিষ্ঠাত্যাগ করায় সেই পুরীষ দৈবযোগে গৌতমের গায়ে পড়িয়াছিল। গৌতম ক্রোধে অধীর হইয়া গেলেন এবং রোষকটাক্ষে বকের দিকে তাকাইবামাত্র বকটী ভস্ম হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া গৌতমের মাৎসর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি মনে ভাবিলেন কী কঠোর তপস্যাই করিয়াছি!

যে ব্রাহ্মণগৃহস্থের বাটীতে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই গৃহস্থ আহারান্তে উপযুক্ত পুত্রের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণপুত্র অতিথিকে দেখিয়াও কিছু বলেন নাই। অতিথি নিজকে উপেক্ষিত ভাবিয়া রোষনয়নে ব্রাহ্মণপুত্রকে বলিতে লাগিলেন "কিহে বিপ্রতনয়, অতিথিকে সমাদর করিতেছ না যে! জাননা অতিথি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলে গৃহস্থের কি হয়? তাছাড়া আমি যেমন তেমন অতিথি নহি।"

"অতিথি র্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
সঃ তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥"

অতিথি কাহারও গৃহ হইতে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলে সে গৃহস্থকে তাহার পাপ প্রদান করিয়া গৃহস্থের পুণ্য লইয়া প্রস্থান করে। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণকুমার বলিলেন "হে বকভস্মকারী অতিথি, আমি সবই

জানি, কিন্তু আমি কি করিব, আমার উপায় নাই। আমার পূজনীয় পিতাঠাকুর মহাশয় আমার কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছেন; আমি এক্ষণে উঠিতে পারি না। আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। আমার পিতা এখনি উঠিয়া আপনার যথোচিত সমাদর করিবেন। আপনাকে সন্ন্যাসী দেখিতেছি; সন্ন্যাসীর ক্রোধ থাকা উচিত নহে। আপনি সন্ন্যাসী হইয়াও সামান্য জঠরজ্বালা সহ্য করিতে পারিতেছেন না, ইহা অতীব বিচিত্র। যাহা হউক মহাশয় আপনি যেরূপ রোষনয়নে আমার দিকে তাকাইতেছেন, তাহাতে মনে হইতেছে আপনি আমাকে ভস্ম করিবার ইচ্ছা করিতেছেন; কিন্তু জানিয়া রাখা ভাল আমি বক নহি।" ব্রাহ্মণকুমারের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসী মনে করিলেন "এই ব্রাহ্মণকুমার ত সাধারণ নহে; আমি এইমাত্র বক ভস্ম করিয়া আসিতেছি ব্রাহ্মণকুমার তাহা জানিল কি প্রকারে?" তখন তিনি কিছু নরম হইয়া ব্রাহ্মণকুমারকে বলিলেন "হে বিপ্রতনয়, আমি দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিয়া যে পরোক্ষ-জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইলাম না, আপনি এই নবীন বয়সে কি প্রকারে সেই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন ইহা জানিতে আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে। বাস্তবিকই আমি এইমাত্র এক বক ভস্ম করিয়াছি।" ব্রাহ্মণকুমার বলিলেন "সেকথা পরে হইবে, এক্ষণে আমার পিতা জাগরিত হইয়াছেন। আপনি অগ্রে আতিথ্য গ্রহণ করুন।" আহারান্তে গৌতম ব্রাহ্মণপুত্রকে পীড়াপীড়ি করিতে থাকায়, ব্রাহ্মণতনয় বলিলেন "মহাশয় আমার সময় নাই, আমি সর্ব্বদাই পিতামাতার সেবা করিয়া থাকি। আপনি কাশীধামে মহাতপা নামক ব্যাধের নিকটে গমন করুন; সে আমার শিষ্য; আমার নাম করিলে, সে আপনাকে পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় উপদেশ দিবে।"

গৌতম কাশীধামে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যাধের গৃহে গিয়া সংবাদ লইলেন ব্যাধ হাটে গিয়াছে। হাটে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন সেই ব্যাধ

হরিণের মাংস বিক্রয় করিতেছে। তাহা দেখিয়া গৌতম মনে মনে ভাবিলেন "এই ব্যাধ মাংস বেচিতেছে। আমাকে ইহার নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হইবে? ব্রাহ্মণকুমার আমাকে ইহার নিকট হইতে উপদেশ লইবার জন্য পাঠাইয়াছেন?" তখন মহাতপা ব্যাধ গৌতমকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "আসুন বকভস্মকারী গৌতম সন্ন্যাসী মহাশয়, আপনাকে অমুক ব্রাহ্মণ আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন। তা মহাশয়, আপনি আমাকে অযথা ঘৃণা করিতেছেন। আমি নিজে হরিণ নিহত করি না। অপরে হরিণ মারে, আমি তাহার নিকট হইতে দুই টাকায় ক্রয় করিয়া নয় সিকায় বিক্রয় করি মাত্র। পরিশ্রমলব্ধ চারি আনা মুনাফায় আমি পিতা প্রভৃতি পরিজন পালন করিয়া থাকি। ইহাতে আমার পাপ কোথায়?" গৌতম বিস্মিত হইয়া গেলেন। সামান্য মাংসবিক্রয়কারী ব্যাধ তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিয়াছে। ব্যাধ বলিলেন "ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। বিক্রয় শেষ হইলে খাদ্য দ্রব্য লইয়া আপনাকে গৃহে লইয়া যাইতেছি।" যথাসময়ে গৃহে উপস্থিত হইয়া ব্যাধ বৃদ্ধ পিতা ও মাতার পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন এবং অতিথি-সেবার বন্দোবস্ত করিলেন। বিশ্রামান্তে গৌতম বলিলেন "আমি গভীর তপস্যা দ্বারা যে পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই, আপনারা কিরূপে তাহা লাভ করিয়াছেন তাহাই আমি শুনিতে ইচ্ছা করি; অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমাকে তাহাই বলুন।" তদুত্তরে ব্যাধ বলিতে আরম্ভ করিলেন "মহাশয়, দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি এক বনে ফাঁদ পাতিয়া আড়ালে বসিয়াছিলাম। দেখিলাম এক বৃদ্ধ পক্ষী ফাঁদে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। ইত্যবসরে এক নবীন পক্ষী ঠোঁটে করিয়া কি আনিয়া বৃদ্ধ ও মরণোন্মুখ পক্ষীর মুখে দিবামাত্র বৃদ্ধ পক্ষীটী মরিয়া গেল। অব্যবহিত পরে নবীন পক্ষীটী ধূলায় লুটাইতে লুটাইতে প্রাণত্যাগ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে স্বর্গ হইতে রথ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নবীন পক্ষীটীর লিঙ্গশরীর দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রথের

উপর উপবেশন করিল এবং রথখানি দিব্য দেহকে লইয়া স্বর্গে উঠিয়া গেল এবং স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অদূরে ব্রাহ্মণকুমারকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন এই নবীন পক্ষীটী বৃদ্ধ পক্ষীটীর পুত্র। বৃদ্ধ পক্ষীটী ফাঁদে পড়িয়া মরিয়া গেল। নবীন পক্ষীটী বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুর সময়ে এক ফোঁটা জল (যাহা উহা ঠোঁটে করিয়া আনিয়াছিল) দিতে পারিয়াছিল বলিয়া তাহার এরূপ সদ্‌গতি হইল। পিতামাতার সেবা করিলে যাবতীয় ফল পাওয়া যায়। তদবধি সেই ব্রাহ্মণকুমার আমার গুরু হইলেন এবং আমি হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করতঃ প্রাণপণে বৃদ্ধ পিতা ও মাতার সেবা করিয়া থাকি। ইহাতেই আমার পরোক্ষজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। আপনি বৃদ্ধ পিতার নিষেধবাক্য শ্রবণ না করিয়া বনে তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন তাহাতে আপনার পাপই হইয়াছে। আমার মতে আপনি গৃহে গিয়া বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করিতে থাকুন।" গৌতম ব্যাধের পরামর্শমত তাহাই করিয়া পরে পরোক্ষজ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

একদা দেবতাদিগের মধ্যে তর্ক উঠিয়াছিল কার্ত্তিক ও গণেশের মধ্যে কে অগ্রে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারেন। কার্ত্তিক গণেশকে বলিলেন "দাদা, আপনিত মূষিকে আরোহণ করিয়া যাইবেন, সুতরাং প্রস্তুত হউন।" গণেশ বলিলেন "তুমি আরম্ভ কর, আমি যথাসময়ে ভ্রমণে বাহির হইব।" কার্ত্তিক ময়ূরে চড়িয়া পোঁ পোঁ করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিলেন এবং তিন দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন দাদা গণেশ নিজ স্থানে বসিয়া আছেন। তিনি জানিতেন তাঁহার বাহন যেরূপ দ্রুতগতিতে ভ্রমণ করিয়াছে, নির্জীবপ্রায় মূষিক কখনও সেইরূপ গতিতে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই; সুতরাং ভাবিলেন নিশ্চয়ই গণেশ বাহির হন নাই। তিনি বলিলেন "কি দাদা, আপনি গেলেন না?" গণেশ বলিলেন "আমি ত তোমার মত মূর্খ নহি যে পৃথিবী ঘুরিতে

যাইব। সম্মুখে পিতা মহেশ্বর বসিয়া আছেন, আমি তাঁহাকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া বহুপূর্ব্বে নিজস্থানে বসিয়া আছি।" কার্ত্তিক নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া নিরুত্তর রহিলেন।

মাতার প্রণাম মন্ত্র ঃ—

"মূর্ত্তির্দ্দয়ায়া ইব ভাতি লোকে, শান্তি পরা যা মনুজস্য বিশ্বে।
দুঃখং সুতার্থং সুখমেব যস্যাস্তাং মাতরং সর্ব্বসহাং নমামঃ॥"

মাতা দয়ার অবতার এবং এই পৃথিবীতে শান্তির একমাত্র আধার। পুত্রের নিমিত্ত যে দুঃখ তাহা তাঁহার নিকটে সুখ বোধ হয়। মাতার তুল্য সর্ব্বসহা আর কে আছে? এ হেন মাতাকে আমরা প্রণাম করি।

এ হেন পিতা ও মাতাকে হৃদয়ে প্রত্যহ স্মরণ করা কি প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে? পিতা মাতার ফটো রাখা ত বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র; তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে রাখাই প্রশংসনীয়। আজকাল আবার অনেকের পিতৃমাতৃ ভক্তির পরিবর্ত্তে পত্নীপ্রেমের ভাব দেখা যায়। পত্নী মরিয়া গেলে তাহার মৃতাবস্থার ফটো লওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সাবিত্রীদেবীর পতিভক্তির কথা শুনা গিয়াছে। ওরফিয়াস (Orpheus) তদীয় পত্নী মরিয়া গেলে বেহালার গানে মৃত্যুপতিকে ভুলাইয়া পত্নীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

হুগলী জেলার সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত কোন গ্রামে এক ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার পত্নীর সান্নিপাতিক পীড়া হইয়াছিল। তিনি প্রথমে নিজে চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় শ্রীরামপুর হইতে কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারকে দেখান হইয়াছিল। ঐ ডাক্তার একদিন বলিয়াছিলেন "তাইত আর কোন আশা দেখিতেছি না, নাড়ী বসিয়া গিয়াছে।" পত্নীর মৃত্যুদর্শন সহ্য করিতে পারিবেন না ভাবিয়া ডাক্তারবাবু নিজ ঔষধালয় হইতে

হাইড্রোসিয়ানিক্ (hydrocyanic) এসিড্ খাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় ডাক্তারবাবুর পত্নী বাঁচিয়া উঠিয়াছিলেন। এরূপ পত্নীপ্রেম অতি সুদুর্লভ। ইংলণ্ডের অধীশ্বর তৃতীয় উইলিয়ম (William III) পত্নী মেরী মরিয়া গেলে তাঁহার মাথার চুল হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন মাত্র। পত্নীর জন্য আত্মহত্যা করা অতি বড় আহাম্মকের লক্ষণ।

(৪) প্রত্যহ ১০৮ বার 'ওঁ' মন্ত্র জপ করিবে; তা ঠিক হউক আর নাই হউক। ওঁ মন্ত্র উচ্চারণে উর্দ্ধগতি হয় এবং অহং বলিলে নিম্নগতি হয়। অহঙ্কার হইতে ক্ষিত্যপ্‌তেজঃমরুৎব্যোমের উৎপত্তি। অহং না থাকিলে কোন জিনিষই বাহির হয় না। কোঁৎ দেওয়া অহঙ্কারের রূপান্তর মাত্র।

যখন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, স্ত্রী প্রভৃতি সকলেরই মোক্ষে অধিকার আছে তখন সকলেরই ওঁ মন্ত্র জপিবার অধিকার আছে বুঝিতে হইবে।

(৫) পুরুষ ৬ ঘণ্টা, স্ত্রী ৭ ঘণ্টা এবং বালক ও আহাম্মক ৮ ঘণ্টা ঘুমাইবে।

উদরপূর্ত্তির জন্য মানুষকে ৬ ঘণ্টা খাটিতে হয়। দিবসে যে শ্রান্তি হয় তাহা দূর করিবার জন্য ৬ ঘণ্টা নিদ্রা যাইবার সময়। খাদ্য প্রস্তুত করিবার ৩ ঘণ্টা সময় দেওয়া যাইতে পারে। এখনও ৯ ঘণ্টা সময় থাকিবে, এই ৯ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ এক ঘণ্টা সময় ভগবদারাধানায় দেওয়া যাইতে পারে। রাত্রি ৯টার সময়ে সান্ধ্যভোজন সমাপন করিয়া বিছানায় শয়ন করিবে। এক ঘণ্টা বিছানায় থাকিয়া ভগবচ্চিন্তা করা উচিত। ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইবার প্রকৃত সময়। রাত্রি ৪টার সময়কে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত বলে। এই সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ৬টার পূর্ব্বে সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক্রিয়া শেষ করিয়া সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। রাত্রি

৯টার সময়ে বিছানায় শয়ন করিয়া দিবসে কি কার্য্য করা হইল তাহার বিষয়ে চিন্তা করা মন্দ নহে।

"If you wish to be stout and strong, get up at 5 and go to bed at 9."

(৬) সর্ব্বদা জীবনের উদ্দেশ্য মনে রাখিবে এবং যে কার্য্য করিতে যাইতেছ তাহাতে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে কিনা দেখিবে।

(৭) প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে (১১টা হইতে ১২ টার মধ্যে) হস্তপদাদি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পবিত্র হইয়া আচমনকরতঃ ভোজ্যবস্তু মন্ত্রযুক্ত বা মন্ত্রহীন হইয়া ভগবানকে নিবেদন করিয়া খাইবে। ইহাতে ভগবানের নিকটে কৃতজ্ঞতা দেখান হয়।

"তদীয়ং বস্তু গোবিন্দ, তুভ্যমেব সমর্পয়ে"

হে গোবিন্দ, তোমারই জিনিষ তোমাকে দিতেছি।

ইহা অপেক্ষা গভীর কৃতজ্ঞতা আর কি থাকিতে পারে? ভোজন করিয়া এক শত পদ ধীরে ধীরে হাঁটিবে, পরে বাম দিকে শয়ন করিবে, ঘুমাইবে না।

"জীর্ণে হিতমিতভোজী শতপদগামী বামশায়ী চ।

অবিজিতমূত্রপুরীষী খগেন্দ্র সোহরুক্ সোহরুক্ সোহরুক্ ॥"

যে ব্যক্তি ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইলে শরীরের পোষণোপযোগী খাদ্য পরিমিতভাবে আহার করে, পরে এক শত পদ ধীরে ধীরে ভ্রমণ করে, পরে বাম দিক চাপিয়া শয়ন করে এবং যে ব্যক্তি মল ও মূত্রের বেগ ধারণ করে না হে পক্ষিশ্রেষ্ঠ, সে ব্যক্তি চিরকাল অরুগ্ন থাকে। তাহার কখনও কোনও রোগ হয় না।

আহারের ৩ ঘণ্টা পরে পেট খালি হয়; সুতরাং একবার খাইয়া ৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে আর কিছু খাওয়া উচিত নহে।

একদা নারদ ঋষি ও চ্যবনমুনি ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহাদের মাথার উপরে গাছের ডালে একটী পক্ষী ডাকিয়া উঠিল "কোহরুক্ কোহরুক্ কোহরুক্।" এই পক্ষী এখনও ডাকে; ইহার নাম সম্ভবতঃ বসন্ত বুলবুলি। নারদঋষি চ্যবনমুনিকে বলিলেন "হাঁ মুনে, পক্ষিটী কিছু বলিতেছে না কি?" চ্যবনমুনি বলিলেন "হাঁ বলিতেছে; কঃ+অরুক্=কোঽরুক্। যদি অকারের পর বিসর্গ থাকে এবং পরে অকার থাকে, তবে অকার ও তৎপরস্থিত বিসর্গ উভয়ে মিলিয়া ওকার হয় এবং পরের অকারের লোপ হয়, লোপ হইয়া লুপ্ত অকার (ঽ) ধারণ করে। সুতরাং কঃ+অরুক্ ইহার অর্থ অরুগ্ন কে?" তখন নারদঋষি বলিলেন "তাহ'লে ত পাখীকে উত্তর দেওয়া আবশ্যক।" তখন চ্যবনমুনি বলিলেন "হাঁ আবশ্যক।" এই বলিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত "জীর্ণেহিতমিতভোজী…" ইত্যাদি শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

পাকস্থলীর অর্দ্ধেক ভাগ কঠিন দ্রব্যে, সিকি ভাগ তরল পদার্থে এবং অবশিষ্ট সিকি ভাগ বায়ুচলাচলের জন্য রাখিয়া দিবে। খাইবার সময়ে ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চিবাইয়া খাইবে। অধিকক্ষণ ধরিয়া চিবাইয়া খাইলে অধিক পরিমাণে লালা খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়; তাহাতে পরিপাক ক্রিয়ার সুবিধা হয়। প্রাতঃকাল হইতে ৯টা পর্য্যন্ত নাড়ীতে কফের প্রাবল্য থাকে, পরে অল্প অল্প করিয়া পিত্ত নিঃসৃত হইতে থাকে। ১২টার সময়ে পূর্ণ পিত্তের সময়; এই সময়ে যাহা খাওয়া যাইবে, তাহাই সহজে হজম হইয়া যায়। ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত পিত্ত কমিতে থাকে পরে বায়ুর সময়; সন্ধ্যার সময়ে পূর্ণ বায়ুর সময়, পরে বায়ুর প্রকোপ কমিতে থাকে, ৯টার সময়ে আবার পিত্ত সঞ্চারিত হইতে থাকে। স্বাস্থ্যের এই সব নিয়ম পালন না করিয়াই আমাদের শারীরিক দুর্গতি হইয়াছে ও হইতেছে।

ভোজন করিবার সময়ে কথা কওয়া উচিত নহে। কথা বলিবার সময়ে আমাদের মুখ হইতে অঙ্গারাম্ল গ্যাস (carbonic acid) বহির্গত

হয়। এই গ্যাস শরীরের পক্ষে অনিষ্টকারী। খাইতে খাইতে কথা বলিলে গ্রাস তুলিবার সময়ে মুখনিঃসৃত অঙ্গারাম্ল গ্যাস ঐ গ্রাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া উদরের ভিতরে প্রবেশ করে। যে গৃহে ভোজন করিবে তাহা যেন উত্তমরূপে সজ্জীকৃত থাকে অর্থাৎ তাহাতে হর্ষোৎপাদনকারী দ্রব্য রাখিবে। তাহাতে যেন শোকোৎপাদনকারী কোন দ্রব্যই থাকে না। প্রশান্ত মনে ভোজন করিতে হয়। রাগান্বিতচিত্তে ভোজন করিলে খাদ্যদ্রব্য গলায় আটক্াইয়া যাইতে পারে। পা উত্তমরূপে ধুইয়া খাইতে বসিবে।

"ভিজা পায়ে খাবে, শুক্‌নো পায়ে শোবে।"

হাত পা না ধুইয়া তাড়াতাড়ি খাইতে বসিলে শুক্‌নো ভাত গলায় লাগিয়া যায়। এইজন্য গণ্ডুষের ব্যবস্থা আছে।

নিভৃতে ভোজনের ব্যবস্থা ভাল; তাহাতে 'দৃষ্টি দেওয়ার' হাত হইতে এড়ান যায়। কাহার মনে কি আছে কে বলিতে পারে? কেহ কুভাবে 'দৃষ্টি' দিলে খাদ্যদ্রব্য ভাল হজম হয় না; ইহাকে সাদা কথায় 'ডাইনে পাওয়া' বলে। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি 'খাইবার সময়ে কুকুর বিড়াল কাছে থাকিলে ক্ষতি হয় না কিন্তু অস্পৃশ্য বা নীচ জাতির লোক থাকিলে ব্রাহ্মণদিগের খাওয়া হয় না।' কুকুর বিড়াল প্রভৃতি জন্তুদিগের উচ্চ মগজ নাই, সুতরাং তাহারা 'দৃষ্টি' দেয় না। নিম্ন মগজে তাহারা এই ধারণা করে খাওয়া হইয়া গেলে তাহারা চারিটী প্রসাদ পাইবে, কারণ তাহারা ঐরূপ পাইতে অভ্যস্ত। ক্ষুধাগ্রস্ত নীচ জাতীয় লোক আহার করা দেখিলে উচ্চ মগজে কুভাব ধারণ করিতে পারে; তাহাতে পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।

রন্ধন তিন প্রকার। স্বপাক, মাতা কর্ত্তৃক ও পত্নী কর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্ন প্রথম শ্রেণীর। কন্যা, ভগ্নী, ভ্রাতৃজায়া, বন্ধুপত্নী প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত অন্ন

দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং বেতনভোগী লোক দ্বারা প্রস্তুত অন্ন তৃতীয় শ্রেণীর বা অধম শ্রেণীর। প্রথম বা উত্তম শ্রেণীর অন্নে শরীরের রীতিমত পোষণ হয়। দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর অন্নে শরীরের উৎকর্ষ হয় না বা অপকর্ষ হয় না এবং তৃতীয় ও অধম শ্রেণীর অন্নে শরীরের অবনতি হয়।

(৮) কটু, তিক্ত ও অমিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবে।

"রসনা সুতৃপ্ত বটে মিষ্ট রসে হয়।
উদরের পীড়া কিন্তু জনমে নিশ্চয়॥
আপাত মধুর পাপ কার্য্যকালে বটে।
পরিণামে পরিতাপ অবশ্যই ঘটে॥"

মিষ্টদ্রব্য ভোজনে পীড়া হয় এবং ঔষধের সাহায্যে সেই পীড়ার উপশম হয়। ঔষধ কখনও মিষ্ট বা রসনার প্রীতিকর হয় না। ইহা সাধারণতঃ কটু, তিক্ত ও কষায় হয়।

(৯) প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞ অন্ততঃ পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ করিবে।

প্রত্যেক গৃহস্থকে ঢেঁকি, শিল নোড়া, উনান, জলের কলসী ও ঝাঁটা এই পাঁচটী দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়। এইগুলির ব্যবহারে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে বহু প্রাণীর নাশ হয়; তাহাতে গৃহস্থের পাপ হয়। অথচ এগুলি ব্যবহার না করিলেও গৃহস্থের চলিবে না। সুতরাং শাস্ত্র বলিলেন এই পাঁচ প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইতে গেলে প্রত্যেক গৃহস্থকে নিম্নলিখিত পাঁচটী যজ্ঞ করিতে হইবে:—

(১) শিক্ষিত ও ব্রহ্মজ্ঞানলব্ধ ব্রাহ্মণ অজ্ঞ ভ্রাতৃবৃন্দের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে ভগবৎকথা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন এবং ইহার জন্য কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন না। শ্রোতৃবৃন্দ শক্তি ও ভক্তি অনুসারে যাহা দিবে, বক্তা তাহাই সাদরে গ্রহণ করিবেন।

এক পয়সা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত প্রণামী দেওয়া যাইতে পারে। এক পয়সা দিতেও অক্ষম হইলে একটী হরিতকী দেওয়ার বিধি আছে। বক্তাকে কাপড় দিবার ব্যবস্থা আছে ঃ—

"গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ॥
বাচকং পূজয়েদ্‌ভক্ত্যা দ্রব্য-বস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্ব্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ॥" গীতামাহাত্ম্যম্।

কাপড়ের অভাবে পৈতা এবং তদভাবে 'দশী' অর্থাৎ নূতন কাপড়ের এক-গাছা সূতা দিবার ব্যবস্থাও আছে।

বক্তা যদি পারিশ্রমিক লন কিম্বা চুক্তি করিয়া ধর্ম্ম বক্তৃতা দেন, তবে তাঁহার ব্রহ্মযজ্ঞ হইবে না। যদি কোনও শ্রোতা বক্তাকে একটী আধ পয়সা দিতে যায় এবং বক্তা যদি বলেন "থাক্ ও আর দিতে হ'বে না" তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বক্তা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণকে কিছুই দেওয়া উচিত নহে এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার যোগ্য নহে।

"অসন্তুষ্টাঃ দ্বিজাঃ নষ্টাঃ"।

নষ্ট ব্রাহ্মণকে দান করিলে দাতার পাপ হয় এবং দাতা নাকি সকুটুম্ব নরকে গমন করে।

"কুটবঁ সহিত নরকে চলা নাথ লিয়ে যিজমান।"

পূর্ব্বে ব্রহ্মযজ্ঞ ছিল কিন্তু এখন আর আছে বলিয়া মনে হয় না। কালের কুটীলা গতি। এখন বিলাসিতা আসিয়া জুটিয়াছে। অল্প পয়সায় কাহারও চলে না। বিনা পরিশ্রমে বক্তৃতা দিতে গেলে অনেক সময়ে বক্তার চলে না। সাধারণ লোকের দানের প্রবৃত্তিও দেখা যায় না। যিনি বিনা পারিশ্রমিকে

এরূপ মহৎ ও পুণ্য কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহারই ব্রহ্মযজ্ঞ সার্থক; সুতরাং তিনি পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

(২) ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞের নাম দেবযজ্ঞ। হোমঘৃত হইতে উত্থিত ধূম বারিপতনের সাহায্য করে। ইহাতে সাধারণের উপকার করা হয়। মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাও দেবযজ্ঞের অন্তর্গত।

কোন গৃহস্থ বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা বা শিবপ্রতিষ্ঠা করিলেন। ঐ বিগ্রহের ভোগের জন্য পাঁচ সের আতপ চাউলের ব্যবস্থা আছে। গৃহস্থ ইচ্ছা করিলে ঐ প্রসাদের কণিকামাত্র পাইতে পারেন। হঠাৎ দশজন অতিথি সমাগত হইলে ঐ প্রসাদ হইতে তাহাদের আহারের ব্যবস্থা হইবে। যদি কোন দিন অতিথি উপস্থিত না হয়, তবে দরিদ্র প্রতিবেশিগণকে ঐ প্রসাদ বিতরণ করিতে হইবে। গৃহস্থ যদি প্রসাদ ভোজন করে তবে তাহার দেবযজ্ঞের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। আজকাল প্রায় দেখা যায় গৃহস্থের বাড়ীতে যতজন লোক আছে তত পোয়া চাউলের ভোগ দেওয়া হয়, পরে ঐ প্রসাদ গৃহস্থের বাড়ীর লোক ভোজন করে। যিনি নিঃস্বার্থভাবে দেবযজ্ঞ করেন তিনি পাঁচ প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

(৩) মৃত পিতা ও মাতার দিবসিক শ্রাদ্ধ ত করিতেই হইবে, অধিকন্তু তাঁহাদের প্রাত্যাহিক স্মরণার্থ তাঁহাদিগের তর্পণ করা উচিত। ইহা করিলে অর্থাৎ পিতৃভক্তি হৃদয়ে পোষণ করিলে পাঁচ প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ইহার নাম পিতৃযজ্ঞ।

(৪) পশু ও পক্ষিগণকে আহার দানের নাম ভূতযজ্ঞ। অন্ন ভোজনের পূর্ব্বে পাঁচ থাক অন্ন মৃত্তিকায় রাখিয়া প্রত্যেক থাকে 'নাগায় নমঃ, কুর্ম্মায় নমঃ, কৃকরায় নমঃ, দেবদত্তায় নমঃ, ধনঞ্জয়ায় নমঃ' বলিয়া একটু জল দিতে হয়, পরে ভোজন শেষ হইলে "শতান্ন" অর্থাৎ অন্ততঃ এক শত ভাত রাখিয়া উঠিতে হয়। পশু পক্ষিগণ এইগুলি আহার করিবে। ভূতযজ্ঞ করিলে পাঁচ প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন পাতে ভাত রাখিয়া উঠিলে বুঝিতে হইবে ভোক্তার পেট ভরিয়াছে। ইহা কেবল কষ্ট কল্পনা।

মাড়োয়ারীদিগের মধ্যে এই ভূতযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। ইহাঁরা পায়রা দিগকে কলাই, পিপীলিকাদিগকে চিনি এবং গবাদি পশুদিগকে মিষ্টান্ন দিয়া থাকেন। প্রাণিহত্যা ভয়ে জৈনরা সূর্য্যাস্তের পরে আর ভোজন করেন না বা অগ্নি প্রজ্জালিত করেন না। আমাদিগের মধ্যে এ প্রথা (গণ্ডুষ প্রথা) বড় একটা নাই। ইহা ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে।

(৫) যে কোন অতিথি যেন গৃহ হইতে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া না যায়। সাধ্যমত তাহাকে কিছু দেওয়া চাই; অন্ততঃ মুষ্টিভিক্ষা দিতেই হইবে। ভিক্ষা দেওয়া প্রথাও ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে; অধিকন্তু অনেক গৃহস্থকে ভিখারীকে তিরস্কৃত করিতেও দেখা গিয়াছে। যদি একান্তই ভিখারীকে ভিক্ষা দিবার দ্রব্য গৃহে না থাকে, তবে তাহাকে মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করা ভাল। ব্যবসায়ী ভিখারীকে ভিক্ষা না দেওয়াই উচিত। ন তিথি ইতি অতিথি অর্থাৎ যাহার পক্ষে তিথি নক্ষত্রের বিচার নাই। যিনি ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ মাত্র উদর তৃপ্তির আশায় কাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন, তাঁহাকেই অতিথি বলে। তিনি হয়ত জীবনে আর কখনও সেই ব্যক্তির দ্বারে আসিবেন না। এই নৃযজ্ঞ করিলে গৃহস্থ পাঁচ প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন।

দুঃখের বিষয় এক্ষণে উক্ত পাঁচ প্রকার যজ্ঞের স্থান আর এক যজ্ঞ (ষষ্ঠ যজ্ঞ) দখল করিয়াছে। ইহাকে উদরযজ্ঞ বলা যাইতে পারে। সাধু বা অসাধু যে কোন প্রকারে হউক না কেন, অর্থ উপার্জ্জন করিয়া স্ত্রীপুত্র পালন করিতেই হইবে।

(১০) স্ত্রীলোকদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিবে; কারণ তাঁহারা মাতৃজাতি।

প্রকৃত শিক্ষার অভাবে বর্ত্তমান সময়ে নারীধর্ষণ ব্যাপার ভীষণভাবে চলিতেছে। রামায়ণে পাই, রাবণ সীতাকে ঘাঁটাইয়া সবংশে নির্ব্বংশ হইয়াছিলেন। মহাভারত হইতে অবগত হই, দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করিতে গিয়া পাণ্ডবগণের রোষানলে পড়িয়া নিরানব্বই ভ্রাতাসহ যমালয়ে গমন করিয়াছিলেন! সৈরন্ধ্রীকে ধর্ষণ করিতে গিয়া বিরাটশ্যালক কীচক সূপকারের হস্তে কী দুর্গতিলাভ করিয়াছিল! রূপনগরের রাজকন্যাকে ধর্ষণ করিতে গিয়া বাদশা আওরাঙ্গজেব অবরুদ্ধ হইয়া কী দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন! যেহেতু নারী মাতৃজাতি, ইহাদিগকে অপমান করিতে গেলেই সমূহ বিপদ।

(১১) কথা কম কহিবে।

'গোভোজনে মহাপুণ্য' ব্যাখ্যা করিবার সময়ে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হইয়াছে। সর্ব্বদা হাস্য ও প্রফুল্লতার সহিত কথা কওয়া ভাল। ইহাতে বুঝা যায়—বক্তার মনে কোন গ্লানি নাই।

"Loud laugh that spake the vacant mind." *Goldsmith.*

কোন ব্যক্তি উচ্চ হাসিলে বুঝিতে হইবে তাহার মনে খলকপটতা নাই।

(১২) পুত্রকন্যাদিগকে ভগবানের দান মনে করিবে। কর্ত্তব্যবোধে তাহাদিগকে পালন করা উচিত। প্রতিদানের আশায় তাহাদিগকে প্রতিপালন করা বিড়ম্বনা মাত্র। কাঁচা মাটীর দেহ কখন্ কি হয় বলা যায় না।

(১৩) যাবতীয় কর্ম্ম করিবার সময়ে উচ্চ মগজ নিম্ন মগজের নিকটে রাখিবার চেষ্টা করিবে। তাহাতে প্রত্যেক কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়।

(১৪) নিজেকে 'তৃণাদপি সুনীচ' অর্থাৎ তৃণ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র মনে করিবে।

"মাটী হ'তে দেহ তব মাটী হবে জাননা
মাটী হ'বার আগে তবে মাটী কেন হওনা।"

"আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়।
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়॥
সংসারেতে বড় হওয়া কঠিন ব্যাপার।
সংসারে সে বড় হয় বড় গুণ যার॥
গুণেতে হইলে বড়, বড় কয় সবে।
বড় যদি হ'তে চাও ছোট হও তবে॥"

'ওঁ'এ ঊর্দ্ধগতি হয় এবং 'অহং'এ অধোগতি হয়।

(১৫) বিষ্ণুপ্রীতির বা জনসাধারণের জন্য কর্ম্ম করিবে।

নিজ বা পরিজনের উদরপূর্ত্তির জন্য কতক্ষণ সময় লাগে? ভগবৎকর্ম্ম করিবার যথেষ্ট সময় আছে। মন বা ইচ্ছা থাকা চাই।

(১৬) দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

পঞ্চমবর্ষীয় ধ্রুব ভগবদ্দর্শন কামনায় কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। লক্ষ্মী নারায়ণকে বলিলেন "আপনার হৃদয় নিশ্চয়ই পাষাণে গঠিত, নচেৎ আপনি এখনও ধ্রুবকে দর্শন দিলেন না।" তদুত্তরে নারায়ণ লক্ষ্মীকে বলিলেন "কি করিব লক্ষ্মি, ধ্রুবের যে এখনও দীক্ষা হয় নাই। দীক্ষা অর্থে প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞান ভিন্ন কাহারও ভগবদ্দর্শন হইতে পারে না।" তখন লক্ষ্মীর অনুরোধে নারায়ণ ধ্রুবের দীক্ষার জন্য দেবর্ষি নারদকে পাঠাইলেন।

প্রহ্লাদ যখন হিরণ্যকশিপুপত্নী কয়াধুর গর্ভে ছিলেন, দেবতারা কয়াধুকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। নারদ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য প্রত্যহ ভগবৎ কথা শুনাইতেন। ইহাতেই প্রহ্লাদের দীক্ষার কার্য্য হইয়াছিল বলিয়া তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অনেক অনুনয়ের ফলে রাজকুমার সিদ্ধার্থ তিনদিন মাত্র নগর পরিভ্রমণের অনুমতি পাইয়াছিলেন। দুঃখ, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু দর্শনে রাজকুমারের হৃদয়

ব্যথিত হইয়াছিল। তিনি সারথি ছন্দককে বলিলেন "ছন্দক, আমার পিতার জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু হইবে?" ছন্দক বলিলেন "হাঁ, রাজকুমার"। সিদ্ধার্থ চিন্তিত হইয়া পুনরায় বলিলেন "আমার হইবে"? ছন্দক বলিলেন "হাঁ রাজকুমার, আপনারও হইবে, রাম, যদু ও হরি সকলেরই হইবে। ইহাদেরই হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কাহারও উপায় নাই।" রাজকুমার আবার বলিলেন "বল ছন্দক বল, ইহাদের হাত হইতে এড়াইবার কি কোনও প্রতীকার নাই, কোনও ঔষধ নাই?" তখন ছন্দক বলিয়াছিলেন

"ওষুদ আছে খুঁজ্‌ছে কোন্ জনা,
ওই যে রাঙ্ নিয়ে ব্যস্ত সবাই গো,
কে আর চা'চ্ছে বল ঠিক সোণা॥"

এখানে রাঙ্ হইতেছে ষড়রিপু এবং সোণা হইতেছে আত্মা।

"বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত স্তরুণস্তাবত্তরুণী রক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥"

মোহমুদ্গর।

শিশু খেলা লইয়া ব্যস্ত, যুবা যুবতী লইয়া মত্ত।
বৃদ্ধ হায় কি হইল বলিয়া বিষম চিন্তান্বিত, শ্রীকৃষ্ণে মতি কাহারও নাই।
তত্ত্বকথা শুনিতে ইচ্ছা কাহারও নাই।

ছন্দক রাজকুমারকে সোণার সন্ধান বলিয়া দিলে সিদ্ধার্থ সুন্দরী ও যুবতী পত্নী গোপা, সুকুমার রাহুল এবং বিপুল রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া সোণার সন্ধানে বহির্গত হইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আত্মদর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন। সিদ্ধার্থই উত্তরকালে বুদ্ধ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন এবং ছন্দকই বুদ্ধদেবের গুরু হইয়াছিলেন।

প্রবলপরাক্রান্ত ও অত্যাচারী জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র সিং পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে মাথট্ (poll tax) আদায় করিবার জন্য মহলে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে তিনি শুনিলেন এক রজক কন্যা তাহার পিতাকে বলিতেছিল 'বাবা বেলা যে গেল, বাসনায় কখন্ আগুণ দেবে?" কলার বাসনা শুকাইয়া পোড়াইলে ছাই প্রস্তুত হয়; তাহাতে ক্ষার হয়। এখনও সুদুর পল্লীতে এরূপ ক্ষারের চলন আছে। রজক কন্যা ঐ অর্থে বাসনা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিল। উহাতেই কৃষ্ণচন্দ্র সিংএর দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল। তিনি ভাবিলেন 'এই নয় বৎসরের মেয়ের বাসনায় আগুণ দেবার জ্ঞান হইয়াছে, আর আমি বুড়া হইতে চলিলাম, তথাপি আমার সে জ্ঞান হইল না? আমি যাইতেছি মাথট্ আদায় করিতে।" তিনি তথা হইতে ফিরিলেন এবং রজক ও রজক কন্যাকে সঙ্গে লইয়া নিজ গৃহে উপস্থিত হইয়া রজক কন্যাকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন "মা, তুমি আমার গুরু। তোমার প্রসাদে আমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছি।" তিনি তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি দেব সেবায় অর্পণ করিয়া কৌপীণ ধারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি সুপ্ত অবস্থায় ছিল, হঠাৎ জাগরিত হইয়া গেল। ভগবৎ কৃপা হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। এই কৃষ্ণচন্দ্র সিং ই লালাবাবু নামে পরিচিত।

"যদি বিষয়েতে কৃষ্ণ পেতো রে, তবে লালাবাবু ফকির হ'তো না,
হরিবোল্ হরিবোল্ বল্‌রে রসনা।"

কয়েকটী বিকর্ম্মের তালিকা—

(১) জীবিত বা মৃতের জন্য শোক করিবে না।

জগতে যাবতীয় কর্ম্ম ভগবৎ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট; উহাতে কাহারও হাত নাই। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহা বিশদ ভাবে বুঝান হইয়াছে।

(২) দিবানিদ্রা যাইবে না।

ইহাতে আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। আদিতে মনুষ্যদেহ নির্ম্মাণ করিবার সময়ে ভগবান এমত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে ঐ যন্ত্রে নিয়মিত কার্য্য হইলে ১২৪৪১৬০০০ বার শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া হইতে পারিবে। শ্বাসপ্রশ্বাসই ভগবানের মানদণ্ড। বৎসর, মাস ও দিন মানুষের গণনা। মানুষ ইহাকে নিম্নলিখিত উপায়ে বৎসর, মাস, দিনে পরিণত করিয়া লইয়াছে। বালকের প্রতি মিনিটে ২৫ বার, যুবকের ২০ বার ও বৃদ্ধের ১৫ বার শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া হইয়া থাকে। ইহার গড় হইল $\frac{২৫+২০+১৫}{৩}$=২০। ১ বৎসর হইতে ১২ বৎসরের বালকের শ্বাসের গতি ঠিক করিয়া সেইগুলিকে যোগ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ করিয়া ২৫ পাওয়া যায়; সেইরূপ ১১ হইতে ৪০ বৎসরের লোকের শ্বাসের গতি যোগ করিয়া ২৮ দিয়া ভাগ করিলে ২০ পাওয়া যায়। ৪১ হইতে ১২০ বৎসরের লোকের শ্বাসের গতি যোগ করিয়া ৮০ দিয়া ভাগ করিয়া ১৫ পাওয়া যায়। মনুষ্যের প্রতি মিনিটে ২০ বার শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া হয় ইহা পাওয়া গেল। ১২৪৪১৬০০০কে ২০ দিয়া ভাগ করিয়া ৬২২০৮০০০ পাওয়া যায়। ইহাই মিনিট। এই ৬২২০৮০০০ মিনিটই মনুষ্যের পরমায়ু। ৬২২০৮০০০কে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে ১০৩৬৮০০ ঘণ্টা হয়। ইহাকে ২৪ দিয়া ভাগ করিলে ৪৩২০০ দিন হয়। তাহাকে ৩০ দিয়া ভাগ করিয়া ১৪৪০ মাস হয়। এই ১৪৪০ মাসকে ১২ দিয়া ভাগ করিলে ১২০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহা হইতেই মানুষের আয়ু একশ কুড়ি বৎসর ধরা হয়।

"নরা গজে বিশে শয়।
তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়॥
বাইশ বল্দা তের ছাগ্লা।
ব'লে গেল সেই বরা পাগ্লা॥"

কুম্ভক প্রভৃতি প্রাণায়ামে থাকিলে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার হ্রাস হইয়া থাকে ; সুতরাং এই প্রকার ক্রিয়া করিতে থাকিলে মানুষ ১২০ বৎসরের অধিকও বাঁচিতে পারে। যে সব ক্রিয়ায় শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া ঘন ঘন চলিতে থাকে, সেই সব ক্রিয়া করিলে মানুষের আয়ু কমিয়া যায়। দিবানিদ্রা, দ্রুতহাঁটা, গুরুতর পরিশ্রম ও মৈথুন দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া ঘন ঘন চলিতে থাকে। সুতরাং ঐ প্রকার কার্য্য করিলে মানুষের আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। মুটে মজুর শ্রেণীর লোকদিগকে দীর্ঘজীবী হইতে দেখা যায় না।

"মানুষ মরে বুলে, বাঁশ মরে ফুলে।"

বুলা মানে চলা। বাঁকুড়া জেলায় এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

বাঁশ গাছে ফুল ধরিলে বুঝিতে হইবে গাছটী অতি শীঘ্র মরিয়া যাইবে এবং যে মানুষ অনবরত রাস্তা হাঁটে, সে বেশী দিন বাঁচে না।

তামাকু সেবনে নাকি শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া কমিয়া যায়। তামাকু সেবনের পূর্ব্বে যদি কাহারও হৃদপিণ্ডের বেগ ৭০ থাকে, তামাকু সেবনের পরেই উহা ৬৮ হইয়া যাইবে। কিয়ৎক্ষণ পরে উহা আবার ৭০ হইয়া আসিবে। হৃদপিণ্ডের চারিবার বেগে ফুসফুসের একবার ক্রিয়া হয়। অতএব তামাকু সেবনে অর্দ্ধবার শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া কমিয়া যায়। সুতরাং তামাকু সেবনে আয়ুর্বৃদ্ধি হইতে পারে। চরকসংহিতায় তামাকুর অনুকূলে অনেক লেখা আছে। বৃদ্ধদিগকে তামাকু সেবন করিতে দেখা গিয়াছে। এখন তামাকু সেবনের প্রথা বড় একটা নাই, সুতরাং বৃদ্ধও আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। বর্ত্তিকার সাহায্যে (অর্থাৎ গঁড়গড়ার সাহায্যে) তামাকু সেবনই ভাল। অনেকে বলেন তামাকু সেবনে অম্লনাশ হইয়া থাকে। তামাকু সেবন করিয়া মুখ টিপিয়া নাক দিয়া ধূম নির্গত করার অভ্যাস অতীব অনিষ্টকর। ইহাতে দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয়। এখন তামাকুর চলন কমিয়া গিয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে বিড়ির চলন হইয়াছে। এক পয়সার তামাকে

৪।৫ জন সমস্ত দিন ধূমপান করিতে পারে; কিন্তু এক পয়সার বিড়িতে একজন লোকের সমস্ত দিন যায় না। তামাকু সেবনে আগুনের খরচ প্রায়ই হয় না, কিন্তু একটী বিড়িতে অন্ততঃ ৪টী দেশলাইএর কাঠী খরচ করিতে হয়। তাহা হইলে এক পয়সার বিড়িতে প্রায় এক পয়সার দেশালাইএর আবশ্যক হয়। বিড়িতে পেট গরম হয় এবং ফুসফুস্ খারাপ হইয়া যায়। বিড়ির সুবিধা এই যে গাড়ীতে রাস্তায় যেখানে সেখানে ইহার ধূমপান করা যায়। এমন লোক পাওয়া ভার যাহার পকেটে বিড়ি ও দেশালাই নাই। ৪ বৎসরের বালকও বিড়ির ধূমপান করিতেছে। মানুষ কোনও না কোনও প্রকারে তামাকু ব্যবহার করিয়া থাকে। অনেকের ধারণা তামাকু এদেশে ছিলনা। কাদম্বরী গ্রন্থে পাওয়া যায় রাজা তাড়াপীড় আহারান্তে তাম্বুল ভক্ষণ করিরা ধূমপান করিলেন। চরকসংহিতাও প্রাচীন গ্রন্থ। বিড়ি আমাদের যেরূপ অনিষ্ট করিতেছে, চা পান তদপেক্ষা কম অনিষ্ট করেনা। দোকানে চায়ের বাটী ভাল করিয়া ধোওয়া হয় না। চাকরেরা বাটীগুলি জলে ডুবাইয়াই তুলে। জাতিবিচারের কথা বলিতে চাহিনা, উহাতে ক্ষয়রোগের বিস্তৃতি হইতেছে। প্রাতে চা পান একটা রোগের মত হইয়া গিয়াছে। ইহা গরম গরম খাইতে হয়। প্রাতঃকালে উঠিয়াই চা প্রস্তুতের ধূম পড়িয়া যায়। ক্ষুধার বৃদ্ধির জন্য লোকে কত চেষ্টা করে; এই চা পানে ক্ষুধামান্দ্য হয়। ইহা রাজসিক খাদ্য বলিয়া শরীরের নানা অনিষ্ট করিয়া থাকে।

"কট্বম্ল-লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ-রুক্ষ-বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥" ১৭।৯ গীতা

অর্থাৎ অতি কটু (নিম্বাদি), অতি রুক্ষ, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতিশয় উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ (মরিচ), অতি বিদাহী (শরিষা) এই সকল খাদ্যকে রাজসিক খাদ্য বলে বা রাজসিক ব্যক্তিগণের এইগুলি প্রিয়খাদ্য। এইগুলি

ভোজনকালে ক্লেশ, অনন্তর মনস্তাপ এবং পরিশেষে নানা রোগ উৎপাদন করে।

কেহ কেহ আবার আদর করিয়া এক বৎসরের শিশুকে চা পান করাইয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা জানেন না এ আদর অধিক দিন টিকিবে না। বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত চাপায়ী কখনও দীর্ঘজীবী হইতে পারে না।

(৩) সুরাপান করিও না।

ইহাতে যকৃতের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। অতিরিক্ত মদ্যপায়ী ব্যক্তির যকৃতের পীড়া (Liver abscess) হয়। মানুষ নরহত্যা ইত্যাদি কুকার্য্য সুরাপান না করিলে করিতে পারে না। সুরাপানে আত্মজ্ঞান লোপ পায়।

এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পথিমধ্যে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সম্মুখে এক সুন্দর সরোবর দেখিতে পাইয়া জলপানের নিমিত্ত তথায় গমন করিলে সরোবরে চারিটী ঘাট দেখিতে পাইলেন; প্রথম ঘাটে এক শৌণ্ডিক মদের দোকান করিয়াছিল। দ্বিতীয় ঘাটে গোমাংসনির্ম্মিত এক খাদ্যের দোকান ছিল। তৃতীয় ঘাটে এক সুন্দরী কামিনী দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত ছিল এবং চতুর্থ ঘাটে এক যোগী বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার পাশে একখানি শাণিত অসি ছিল। ব্রাহ্মণ প্রথম ঘাটে নামিতে উদ্যত হইলে শৌণ্ডিক বলিল "ব্রাহ্মণ, এ ঘাট আমার। একটু মদ না খাইলে তুমি জলপান করিতে পাইবে না।" দ্বিতীয় ঘাটে নামিতে গেলে তিনি যবনকে বলিতে শুনিলেন "ব্রাহ্মণ, এ ঘাট আমার, এই চাটনি না খাইলে জলপান করিতে পাইবে না।" তৃতীয় ঘাটে নামিতে যাইলে কামিনী বলিয়া উঠিল "ব্রাহ্মণ, এ ঘাট আমার। আমার সহিত এই বিছানায় বিহার না করিলে জলপান করিতে পাইবে না।" চতুর্থ ঘাটে নামিতে উদ্যত হইলে যোগী বলিলেন "ব্রাহ্মণ, এ ঘাট আমার, এই অসি দ্বারা আমার শিরশ্ছেদ না করিলে জলপান করিতে পাইবে না।" ব্রাহ্মণ দেখিলেন চারিটী কর্ম্মই পাপযুক্ত কিন্তু জলপান না করিলেও প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে।

"আত্মানং সততং রক্ষেৎ।"

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

এক্ষণে কি করা যায়? পাপের মধ্যে লঘুগুরু আছে। ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। পরস্ত্রী মাতৃবৎ এবং যবনের দ্বারা প্রস্তুত অখাদ্যই বা খাই কি করিয়া? তবে সুরাপান পূর্ব্বে পাপ বলিয়া গণ্য হইত না। শুক্রাচার্য্যের সময় হইতেই ইহা পাপ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। অতএব প্রাণরক্ষার জন্য একটু সুরাপান করিয়া শৌণ্ডিকের ঘাটে জলপান করিয়া চলিয়া যাই; গৃহে গিয়া সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইবে। এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ সুরাপান করিলেন; কিন্তু ইহার এমন গুণ যে একবার পান করিলে ইহা পান করিবার ইচ্ছা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অত্যধিক সুরা পান করায় ব্রাহ্মণের পিপাসা অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং মুখে দুর্গন্ধ হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ কিছু চাটনী খাইয়া দুর্গন্ধ দূর করিবার মানসে দ্বিতীয় অকার্য্যটী করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ব্রাহ্মণের আত্মজ্ঞান লোপ পাওয়ায় তিনি তৃতীয় অকার্য্যও করিলেন। পরমুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণ ভাবিলেন "এই তিনজনের স্বার্থ আছে, ইহারা আমার দুষ্কর্ম্ম প্রকাশ করিবে না। এই সাধু হয়ত আমার কুকার্য্য লোকসমাজে প্রকাশ করিয়া দিবে; অতএব ইহাকে বিনাশ করাই ভাল।" এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ সাধুর শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। মায়া সরোবর তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহাই 'মদিরা মাহাত্ম্য'। এই ব্রাহ্মণের মনে নিষ্ঠা সম্বন্ধে অহঙ্কার ছিল। ভগবান কাহারও অহঙ্কার রাখেন না।

(৪) তাস, দাবা ও পাশা খেলিবে না।

এরূপ খেলাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় ও মনে সর্ব্বদাই জয়েচ্ছা প্রবল থাকে। খেলার উদ্দেশ্য আনন্দ কিন্তু দেখা যায় উক্ত প্রকার খেলার শেষে উভয় পক্ষে দ্বন্দ্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। সময় না কাটে মালা ঘুরাও কিম্বা তাহাতে প্রবৃত্তি

না হইলে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ কর; কিম্বা অন্যপ্রকার খেলা করিতে পার। দাবা বা সতরঞ্চ খেলায় মস্তিষ্কের অত্যধিক চালনা হয়। ইহাতে "কাদের সাপ" বলিতে হয়।

(৫) টাকা ধার দিয়া সুদ গ্রহণ করিবে না।

ইহাতে অর্থে অযথা লালসা আসে। কোনও বন্ধু বিপদে পড়িলে এবং তোমার সামর্থ্য থাকিলে তুমি নিয়মমত হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইয়া তাহাকে টাকা ধার দিবে; কিন্তু কথা থাকিবে নির্দ্দিষ্ট দিনে টাকা পরিশোধ করিলে সুদ লাগিবে না। অধমর্ণ নিশ্চয়ই সুদ হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় অন্য উত্তমর্ণের নিকট হইতে টাকা ধার লইয়াও তোমার টাকা পরিশোধ করিবে। তাহাতে তোমার বন্ধুর উপকার করাও হইল এবং তোমার টাকাও ডুবিল না। যদি কোনও কারণে সে ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট দিবসে তোমার টাকা পরিশোধ না করে, তবে তুমি আদালতে নালিশ করিয়া মোকদ্দমার ন্যায্য খরচও সুদসহ আসল টাকা আদায় করিবে এবং মোকদ্দমার ন্যায্য খরচও আসল টাকা তুমি লইবে এবং বক্রী টাকা উপযুক্ত পাত্রে দান করিবে।

অর্থে অযথা স্পৃহা ত্যাগ করিবে কিন্তু তা বলিয়া অর্থোপার্জ্জনে উদাসীন থাকিবে না। চরকসংহিতায় লেখা আছে, মানুষ প্রথমে নিজের দেহকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে, পরে অর্থ আহরণে চেষ্টিত থাকিবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থাৎ ধর্ম্মপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবে এবং এইরূপে উপার্জ্জিত অর্থের অর্দ্ধেক পরিজন পোষণের জন্য ব্যয়িত করিবে, সিকিভাগ ভবিষ্যৎ আপদ-বিপদের জন্য সঞ্চয় করিবে ও বক্রী সিকিভাগ পরমার্থ বা দান করিবে। পরে যথাসময়ে বা উপার্জ্জন অধিক হইলে পরমার্থ করিব ইহা কদাচ মনে করা উচিত নহে। মৃত্যু শিয়রে ভাবিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করা উচিত। অন্যায় উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের ইচ্ছা আদৌ করিবে না, কারণ ওরূপ উপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ থাকে না।

কোনও সদাশয় জমিদারের সেরেস্তায় হরিহর রায় নামে একজন নায়েব ছিলেন। নায়েব মহাশয়ের মাসিক আট টাকা বেতন ছিল। তিনি সুদক্ষ নায়েব হইলে কি হয়, তাঁহার এক প্রধান দোষ ছিল তহবিল তছরূপ করা। তিনবারে তিনি সাত হাজার টাকা ভাঙ্গিয়াছিলেন। জমিদার মহাশয় অতীব সদাশয় ছিলেন বলিয়া, তিনি নায়েব মহাশয়কে ফৌজদারী সোপরদ্দ না করিয়া কেবল কর্ম্মচ্যুত করিলেন। অসদুপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ সাধারণতঃ বিলাসিতায় খরচ হইয়া যায়, সুতরাং নায়েব মহাশয় কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। দুর্ণাম অর্জ্জন করায় অন্য স্থানেও কর্ম্ম জুটিল না। কলসীর জল গড়াইতে থাকিলে, উহা শূন্য হইতে অধিকক্ষণ লাগে না। নায়েব মহাশয়ের দারুণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল এবং ক্রমে পত্নীর অলঙ্কারাদিও বিক্রীত হইল। শেষে অর্থাভাবে তাঁহাদের তিন দিন আহার জুটিল না। পুত্র কন্যারা ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট্ করিতেছে দেখিয়া নায়েব মহাশয়ের চোখে জল আসিল এবং তাঁহার কৃতকর্ম্মের অনুশোচনা আসিল। তখন তিনি গামছা কাঁধে করিয়া জমিদার বাটীতে গমন করিলেন।

এদিকে জমিদারবাবু নারায়ণপুর নামে একটী নূতন মৌজা ক্রয় করিয়াছিলেন। সেখানকার প্রজারা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ছিল। তাহারা নায়েব মহাশয়কে আমলদখল দেয় নাই। ছয় মাস ধরিয়া একটী পয়সাও আদায় হয় নাই; সদর হইতে খরচ আসিত। জমিদারবাবু ভাবিতেছিলেন 'থাক্‌ত এই সময়ে হরিহর নায়েব, তা'হলে প্রজারা জব্দ হইত।' ঠিক এমত সময়ে হরিহর রায় জমিদারবাবুর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পা জড়াইয়া বলিলেন "আমাকে মারিয়া ফেলুন," জমিদারবাবু কারণ জিজ্ঞাসা করায় নায়েব মহাশয় তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা যথাযথ বর্ণনা করিলেন ও বলিলেন "আমার শিক্ষা যথেষ্ট হইয়াছে, আমি ওরূপ কর্ম্ম আর কখনও করিব না; আপনি দয়া করিয়া আমাকে শেষ একবার মাত্র পরীক্ষা করুন।" জমিদার মহাশয় সম্মত হইলেন এবং নগদ

ত্রিশটী টাকা ও কিছু খাদ্য দ্রব্য দিলেন। একজন ভোজপুরী নগদী আদায়ের টাকা প্রত্যহ সদরে লইয়া যাইবে এরূপ ব্যবস্থাও হইল।

নায়েব মহাশয়ের পত্নী তাঁহাকে দেবীস্থানে হাত দিয়া শপথ করিতে অনুরোধ করিলে নায়েব মহাশয় বলিলেন "বলিতেছ, আমি দেবী স্থানে হাত দিয়া শপথ করিতেছি, কিন্তু যে শিক্ষা পাইয়াছি তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না।" গৃহের সুবন্দোবস্ত করিয়া নায়েব মহাশয় যথা সময়ে নারায়ণপুর গ্রামে উপস্থিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন এবং সাত দিনে যাবতীয় বকেয়া খাজনা আদায় করিয়া ভোজপুরী নগদী মারফতে এক সহস্র মুদ্রা সদরে পাঠাইয়া দিলেন। জমিদার মহাশয় নায়েব মহাশয়ের কার্য্যে অতীব প্রীত হইলেন। এইরূপে ছয় মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। পরে শ্রাবণ মাসের পুণ্যাহ দিবসে সাত শত টাকা আদায় হইয়াছিল। ভোজপুরী টাকার থলিয়াটী সদরে লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময়ে পশ্চিম দিকে মেঘ দেখা দিল। অনতিবিলম্বে ভীষণ ঝড় উপস্থিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। টাকাটী সদরে লইয়া যাওয়া হইল না।

আহারের পরে রাত্রিতে নায়েব মহাশয় নিজের কুঠারীতে কাঠের সিন্ধুকের উপরে টাকার থলিয়াটী লইয়া বসিয়া রহিলেন, পাছে কোনওরূপ গোলমাল ঘটে। রাত্রি দুইটার সময়ে নিদ্রাভঙ্গে নায়েব মহাশয় সভয়ে ও সবিস্ময়ে দেখিলেন টাকার থলিয়াটী নাই, অথচ দরজার খিল ঠিক ছিল। চারিদিক অনুসন্ধান করিয়াও থলিয়ার সন্ধান মিলিল না। অবশেষে নায়েব মহাশয় দেখিলেন সিন্ধুকের পশ্চাতের দেওয়ালে সিঁদ কাটা ছিল। তাঁহার বুঝিতে আর কিছু বাকি রহিল না। তিনি ভাবিলেন ভগবান বুঝি আবার তাঁহাকে নূতন বিপদে ফেলিলেন। তিনি দোষী সুতরাং কেহই তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে না, অধিকন্তু সকলেই মনে করিবে সিঁদ তাঁহারই কাটা। তখন টাকাটীর উদ্ধারের অভিপ্রায়ে তিনি গ্রামের অভিমুখে চলিলেন। নারায়ণপুর গ্রামের

সাধারণ লোকের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নাই; এখানে দুই এক ঘর বসতি, পরে ৫০।৬০ বিঘা জমির মাঠ, আবার দু-পাঁচ ঘর বসতি। মধ্যে মধ্যে কলার বাগান ও আমকাঁঠালের বনও আছে এবং এই বনে ছোট ছোট বাঘও থাকে। নায়েব মহাশয় দেখিলেন গ্রাম নিস্তব্ধ, কেবল একস্থান হইতে মিট্‌মিটে আলো আসিতেছে। তিনি সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া সেই বাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইয়া জানালা দিয়া দেখিলেন একজন লোক তাঁহারই থলিয়া হইতে টাকা বাহির করিয়া গণনা করিতেছে ও তাহার স্ত্রী তাহার পাশে বসিয়া আছে এবং তাহাদের দ্বাদশ বৎসরের এক পুত্র বিছানায় ঘুমাইতেছে। গণনা শেষ হইলে লোকটী টাকা পুনরায় থলিয়ায় রাখিয়া উহার মুখটী দড়ি দিয়া বাঁধিল। এমন সময়ে ভগবান নায়েব মহাশয়ের উপর সুপ্রসন্ন হইলেন। ছেলেটীর ঘুম ভাঙ্গিলে সে বলিল "মা আমার বাহ্যে পেয়েছে।" মা তখন টাকার গরমে ছিল, সুতরাং সে বলিল "দাওয়ায় বাহ্যে যা, আমি কাল ময়লা পরিষ্কার করিয়া দিব।" ছেলেটী যেমন বাহিরের দাওয়ায় গিয়াছে, নায়েব মহাশয় সেখানে গিয়া ছেলেটীর গলা টিপিয়া অন্য দিকে লইয়া গেলেন। ছেলেটী চীৎকার করিতে থাকায়, তাহার পিতামাতা মনে করিল ছেলেকে বাঘে ধরিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহারা টাকার থলিয়া ফেলিয়া ছেলের উদ্ধারের জন্য বাহিরে গেল। ইত্যবসরে নায়েব মহাশয় টাকার থলিয়াটী লইয়া প্রস্থান করিলেন এবং রাত্রির মধ্যেই সিঁদকাটাস্থানটীর মেরামত করাইয়া লইলেন। পরদিন কাহাকে কিছু না বলিয়া তিনি নগদী মারফতে টাকাটী সদরে পাঠাইয়া দিলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে এক ভিখারী সেরেস্তার সম্মুখে একতারার সাহায্যে গান ধরিল—

"(মনরে) তুমি যদি এমন তবে কেন এমন।"

কর্ম্মচারীরা এক পয়সা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত দিতে গেলেন, ভিখারী কিন্তু কিছুই লইল না; সে কেবলই ঐ সুরে গান করে। তখন একজন কর্ম্মচারী নায়েব মহাশয়ের গৃহে গিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত ভিখারীর কথা

বলিলেন। নায়েব মহাশয় কৌতূহলবশতঃ সেই অপূর্ব্ব ভিখারীকে দেখিতে গেলেন এবং তাহাকে দেখিয়া লইয়া তিনি বলিলেন "দাওতহে ভাই, তোমার একতারাটী একবার"। একতারার সাহায্যে তিনি গান ধরিলেন

"বহুত করেছি ভাই, কিছুতে কিছু হয় নাই"

ভিখারী মনের মত উত্তর পাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

(৬) পশ্চাদ্দিকে তাকাইও না।

রাজা যুধিষ্ঠির চারি ভাই ও দ্রোপদীসহ স্বর্গারোহণ করিতেছিলেন। হিমাঙ্গ হইয়া পথিমধ্যে দ্রৌপদী পড়িয়া গেলেন। ভীম বলিলেন "দাদা, দেখুন প্রিয়তমা দ্রৌপদী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন।" যুধিষ্ঠির বলিলেন "পশ্চাদ্দিকে তাকাইও না, কেবলই অগ্রসর হও।" ক্রমে সহদেব, নকুল ও অর্জ্জুন হিমগিরির উপরে পড়িয়া গেলেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিলেন "চলিয়া আইস, উহাদের জন্য মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া কেবলই অগ্রসর হও।" অবশেষে ভীমও হিম সহ্য করিতে না পারিয়া পতিত হইলেন। যুধিষ্ঠির পশ্চাদ্দিকে তাকান নাই। তিনি অগ্রসরই হইতে লাগিলেন।

(৭) (ক) উপাদেয় বস্তু পাইলে একা খাইবে না।

প্রতিবেশিগণকে কিছু কিছু দিয়া খাইতে হয়। একা খাইবার অভ্যাসে স্বার্থপরতার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

(খ) গৃহে অপর সকলে নিদ্রিত হইলে তুমি জাগিয়া থাকিবে না।

তাহাতে সামান্য ও অলীক ভয়ে তুমি ভীত হইতে পার।

(গ) একা রাস্তা হাঁটিবে না।

পথিমধ্যে তুমি একা থাকিলে কল্পিত বিপদে তুমি হতবুদ্ধি হইতে পার।

একজন গোমস্তা হঠাৎ বিশেষ কারণে খাজনা আদায়ের জন্য গ্রামান্তরে যাইবার মনস্থ করিলে তাঁহার মাতা বলিলেন "বাবা একা যাইও না, সঙ্গে কাহাকে

লও।" পুত্র বলিলেন "এ সময়ে কাহাকে পাইব?" তখন মাতা নিকটস্থ পুকুর হইতে একটী জীবন্ত কুলীরক বা কাঁকড়া ধরিয়া আনিয়া পুত্রকে বলিলেন "বাবা, এটাকে সঙ্গে লও।" পুত্র মাতৃবাক্য অবহেলা না করিয়া সেইটাকে একটী কর্পূরের শিশির মধ্যে পূরিয়া যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে আতপক্লান্ত হইয়া গোমস্তা এক বটবৃক্ষের ছায়ায় শয়ন করিলেন এবং অবিলম্বে গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়া গেলেন। ইতিমধ্যে বৃক্ষ-কোটরস্থিত এক ভীষণ বিষধর সর্প বাহির হইল এবং কর্পূরের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া শিশির মধ্যে মুখ প্রবেশ করাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ কাঁকড়াটী তাহার দাড়া দ্বারা সর্পের গলদেশ কর্ত্তন করিয়া ফেলিল। গোমস্তা নিদ্রাভঙ্গে ব্যাপার দেখিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন এবং মাতৃবাক্যের সার্থকতা বুঝিলেন।

(৭) একা বৈষয়িক চিন্তা করিবে না।

'তিনমুড়া' বা বৃদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।
"একঃ স্বাদু ন ভুঞ্জীত নৈকঃ সুপ্তেষু জাগৃয়াৎ।
একো ন গচ্ছেদধ্বানং নৈকশ্চার্থান্ প্রচিন্তয়েৎ ॥"

(৮) পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিও না।

অপরের উপার্জ্জিত অর্থে সুখভোগ করিবার ইচ্ছা প্রশংসনীয় নহে। আপাততঃ "পরের পিঠা বড় মিঠা" লাগে, কিন্তু পরে পস্তাইতে হয়। চিরকালই পরের পায়ে দাঁড়ান যায় না।

(৯) কখনও আহাম্মক হইবে না।

জগতে দশপ্রকার আহাম্মক আছে যথা :—
আহাম্মক হয় এক যৌবনে নেয় ভেক।
আহাম্মক হয় দুই চালে তোলে পুঁই।
আহাম্মক হয় তিন আপন কড়ি পরকে দিয়ে নিজে করে ঋণ।

আহাম্মক হয় চার মাকে দেয় মার।
আহাম্মক হয় পাঁচ পর পুকুরে ছাড়ে মাছ।
আহাম্মক হয় ছয় এর কথা ওরে কয়।
আহাম্মক হয় সাত শ্বশুরের খায় ভাত।
আহাম্মক হয় আট বৌঝি পাঠায় হাট।
আহাম্মক হয় নয় পিছনে কথা কয়।
আহাম্মক হয় দশ স্ত্রীর কথায় বশ।

যৌবনে মানুষ বিবাহ করে ভেক লয় না। বৃদ্ধেরই ভেক লইবার ব্যবস্থা আছে।

চালে পুঁই জাতীয় লতা তুলিলে চালের যে ক্ষতি হয়, ফল বিক্রয়ে সে ক্ষতির পূরণ হয় না।

নিজের টাকা পরকে দিয়া নিজে ঋণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে।

ত্রিজগতে মাতা অপেক্ষা অধিক গুরু আর কেহ নাই। পিতা অতিশয় পূজনীয় কিন্তু মাতা পিতা অপেক্ষাও গুরু।

"পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণ পোষণাৎ।
অতো হি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃ সমো গুরুঃ॥"

গর্ভে ধারণ ও পোষণ করেন বলিয়া পিতা অপেক্ষাও মাতা গুরু। অতএব ত্রিজগতে মাতার সমান গুরু আর কেহ হইতে পারে না। বিদেশ হইতে প্রত্যাগত পুত্র একস্থানে পিতা ও মাতাকে বসিয়া থাকিতে দেখিলে অগ্রে মাতাকে প্রণাম করিয়া পরে পিতাকে প্রণাম করিবে ইহাই শাস্ত্রের বিধি। যাহার মা নাই তাহার কেহ নাই। মাতৃহারা শিশু দয়ার পাত্র। এ হেন মাতাকে যে ব্যক্তি প্রহার করে সে অতি বড় আহাম্মক।

পরের জমিতে লাঙ্গল দিয়া ধান রোপণ করিলে যাহার জমি সে ধান কাটিয়া লইবে। সেইরূপ পরের পুকুরে যে মাছ ছাড়ে তার কি?

ইহার কথা উহার নামে লাগাইলে, যে লাগায় তাহার কোন লাভ নাই। যাহার নামে লাগান হয় এবং যাহার কাছে লাগান হয় এই উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়।

ভগবান মানুষকে হাত, পা, বুদ্ধি ইত্যাদি দিয়াছেন, সেইগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া ধর্ম্মপথে থাকিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করাই প্রশস্ত। শ্বশুরের অন্নে জীবনধারণ করিলে শ্বশুর শাশুড়ী কিছু না বলুক শ্যালকপ্রবরেরা ভগ্নীপতিকে সর্ব্বদাই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে এবং তাহাকে অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

বধু, কন্যা প্রভৃতিকে হাটে যাইতে দিলে ব্যভিচার দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে এবং ঐ সকল রমণীরা প্রায়ই মুখরা হইয়া থাকে। লজ্জাই নারীর অলঙ্কার—

"সরমভূষণ নারীর বলে।"

"বহুরী ভালা চুপ"।

মনে করুন কোনও ব্যক্তি তাহার বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া কিছু স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমার খোসামোদ করিয়া কিছু লইয়া প্রস্থান করিল। লোকটী একটু আড়াল হইয়াই তাহার বন্ধুকে বলিল "বেটাকে আচ্ছা ঠকাইয়াছি।" হায় ভ্রান্ত মানব, আমি ঠকি নাই, আমি না হয় বুঝিয়া হউক আর না বুঝিয়া হউক তোমাকে পাঁচটী টাকা দিয়াছি। আমি অন্য উপায়ে ঐ পাঁচ টাকা পাইতে পারি, কিন্তু ঠকিলে তুমি। আমি যাহার যোগ্য নহি তাহার আরোপ করার নাম খোসামোদ। যখনই তুমি আমার স্তবস্তুতি করিবার উপক্রম করিলে, তখনই তোমার আত্মা তোমাকে বা তোমার মনকে বাধা দিতে আরম্ভ করিল কারণ তোমার আত্মা জানে আমি ঐ প্রকার প্রশংসার যোগ্য নহি। সুতরাং তোমার উক্তি অসত্য বা মিথ্যা। তুমি ঐ প্রকার অসত্য প্রশংসা দ্বারা তোমার আত্মাকে ঘাত করিলে বা কলুষিত করিলে,

সুতরাং তুমি প্রকৃত পক্ষে আত্মঘাতী হইলে বা অবীর হইলে। পিছনে কথা কহিয়া তুমি আত্মঘাতী ও আহাম্মক হইলে। ইহা তোমার মজ্জাগত হইয়া যাইবে; তুমি যাহা নষ্ট করিলে তাহা আর কখনও ফিরিয়া পাইবে না।

যে ব্যক্তি পিছনে কথা কহে না অর্থাৎ মনে যাহা হইতেছে তাহা বাহিরে প্রকাশ করিতে যাহার সাহস আছে তাহাকে অনাত্মঘাতী বা প্রকৃত বীর বলে। প্রকৃত গুরুর সৎসাহস থাকা একান্ত আবশ্যক। যদি শিষ্যের নিকট হইতে দশ টাকা পাইবার আশায় তিনি শিষ্যের অযথা প্রশংসা করেন, তবে তিনি শিষ্যের অজ্ঞান নাশ করিয়া ঘোর সংসার-সাগর হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবেন কি করিয়া?

স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ ভাবাবেগ প্রবণ (inclined to sentiment) পুরুষদিগের অপেক্ষা ইহাদের বিচারশক্তি বড়ই কম। এইজন্যই ইহারা অনেক সময়ে সংসারে নানারূপ অশান্তি আনয়ন করে।

"বালানাং রোদনং বলম্।
স্ত্রীণাং ঘ্যান্‌ঘ্যানং বলম্॥"

কোনও অসহায় শিশু কোনও লোভনীয় দ্রব্য দেখিয়া তাহা পাইতে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু তাহা তাহার আয়ত্তে আসিতেছে না; সে কি করিবে? অত্যধিক ক্রন্দন করায়, তাহার পিতা বা অভিভাবক সেই দ্রব্যটী তাহার হাতে দিবে। অতএব ক্রন্দনই শিশুর বল। স্ত্রীলোকগণ 'ঘ্যান্‌ঘ্যান্' রূপ অস্ত্র দ্বারা নিজ উদ্দেশ্য সাধিত করে।

শিব দুর্গাকে পিত্রালয়ে কিছুতেই যাইতে দিবেন না। দুর্গা ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া শিবের অনুমতি পাইয়াছিলেন।

কৌটার মূল্যের পরিবর্ত্তে রাক্ষসীগণ রাজকন্যার স্বামীর প্রকৃত নাম জানিতে চাহিলে, রাক্ষসবিধ্বস্ত নাগছালাবৃত বনবিদ্যাধর রাজকন্যাকে বলিয়াছিলেন

"রাজকন্যে আমাকে কাজ না তোমার কৌটাবাটাতে কাজ?" রাজকন্যা উত্তর করিয়াছিলেন "আমার কৌটাবাটাতেই কাজ।" তখন রাজকন্যার স্বামী একগলা জলে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন "যা যা কন্যে যা যা ঘর আমার নাম বনবিদ্যাধর।" রাজকন্যা স্বামীকে হারাইলেন।

মাতৃজাতি বলিয়া স্ত্রীলোকদিগকে সম্মান দেখাইবে এবং আদর যত্ন করিবে; কিন্তু তাহাদিগের বশীভূত হওয়া ঘোরতর আহাম্মকের লক্ষণ।

ভগবান প্রথম মনুষ্য আদমকে সৃজন করিয়া নন্দনকাননে রাখিয়াছিলেন ও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "এই নিষিদ্ধ ফল বা ভালমন্দ জ্ঞানের বৃক্ষের ফল (fruit of the tree of the knowledge of good and evil) ব্যতীত যাবতীয় দ্রব্য তুমি ইচ্ছামত ভোগ করিতে পাইবে এবং আবশ্যকমত আমাকে স্মরণ করিলেই আমার দর্শন পাইবে। যদি কাহারও প্রলোভনে পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষের ফল আস্বাদন কর, তবে তোমার অনিষ্ট হইবে, সাবধান।" নিষ্পাপ আদম মহা আনন্দে নন্দনকাননে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদিন ঐ বৃক্ষের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে আদম শুনিতে পাইলেন এক সর্প বৃক্ষের ডালে জড়াইয়া থাকিয়া বলিতেছে "ভাই আদম, তুমি জাননা এই বৃক্ষের ফল কত সুস্বাদু। যে যে বয়সে ইহা খাইবে সে সেই বয়সেই থাকিবে। আমার কথা শুন, তুমি এই বৃক্ষের একটী ফল খাও।" আদম জানিতেন না যে এই সর্প আর কেহই নহে স্বয়ং শয়তান, ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী। শয়তান সম্মুখ সমরে ভগবানের হস্তে পরাজিত হইয়াছিল বলিয়া অন্য উপায়ে তাঁহার মনে কষ্ট দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল। মানুষ ভগবানের অতি প্রিয়, তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া কুপথে লইয়া যাইতে পারিলেই ভগবানের মনে কষ্ট দেওয়া হইবে।

আদম বলিলেন "পরম পিতা পরমেশ্বর আমাকে এই ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং আমি তাঁহার অবাধ্য হইতে পারিব না।" পুনঃ পুনঃ

প্রলোভনেও আদম ফল খাইতে স্বীকৃত হইলেন না। একদিন তিনি মনে মনে ভাবিলেন "তাইত, একা মন হুহু করে, কাহারও সহিত পরামর্শ করিতে পাই না। একজন দোসর হইলে ভাল হয়।" তখন তিনি ভগবানকে স্মরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ ভগবান দর্শন দিয়া বলিলেন "কি বাবা আদম, তোমার কি প্রয়োজন?" আদম বলিলেন "প্রভো, একা থাকি একজন দোসর দিন।" ভগবান তখন তাঁহার পঞ্জরের হাড় হইতে সঙ্গিনী ইভাকে সৃজন করিলেন। ইভাকে পাইয়া আদমের বড়ই স্ফূর্ত্তি হইল। শয়তান আদমকে কিছুতেই প্রলুব্ধ করিতে না পারিয়া একদিন ইভাকে ধরিল এবং ইভা আদমকে ফল খাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ঘ্যানঘ্যানের ফল ফলিল। আদম ফল খাইবার অভিপ্রায়ে উহা মুখে পূরিল। ফলটী আদমের টাক্‌রায় আটকাইয়া গেল; শয়তানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, সে অন্যত্র পলায়ন করিল। তৎক্ষণাৎ ভগবান আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আদমকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "নরাধম, আমার নিষেধবাক্য লঙ্ঘন করিলি; তোরা আর এখানে থাকিবার যোগ্য নহিস্। আজ হইতে মানুষের মৃত্যু হইবে।" এই বলিয়া ভগবান আদম ও ইভাকে নন্দনকানন হইতে মরজগতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আদম যদি শয়তানের প্রলোভনে ফল না খাইতেন তবে মানুষের মৃত্যু হইত না।

এই শয়তানই ষড়রিপু। ইহা আত্মা বা ভগবানের শত্রু। আত্মা যে পরামর্শ দিবে ষড়রিপু ঠিক তাহার উল্টা পরামর্শ দিবে।

এক তন্তুবায় (তাঁতী) বনে কাঠ কাটিতে গিয়া একটী শিমূলবৃক্ষ ছেদন করিতে উদ্যত হইলে এক ব্রহ্মদৈত্য তাহাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া বলিল "ভাই তন্তুবায়, এই গাছটী কাটিও না। কারণ আমি বহুদিন হইতে এই বৃক্ষে আশ্রয় করিয়া আছি; যে ঘরে তুমি বাস কর তাহা যদি কেহ ভাঙ্গিয়া দেয়, তবে তোমার

মনে কত কষ্ট হয় তাহা তুমি বুঝ, অতএব আমার অনুরোধ তুমি এ গাছটী কাটিও না।" তন্তুবায় বলিল "আমাকে এই গাছটী কাটিতেই হইবে।" তখন ব্রহ্মদৈত্য বলিল "ভাই, তুমি আমার নিকট হইতে ইচ্ছামত বর গ্রহণ কর, তবু এই গাছটীকে অব্যাহতি দাও।" তাহাতে তন্তুবায় বলিল "আচ্ছা কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমি কি বর লইব, গৃহ হইতে জানিয়া আসি।"

পথিমধ্যে নাপিতবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে নাপিত বলিল "কিহে ভাই বন্ধু এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাইতেছ?" তন্তুবায় বলিল "এক ব্রহ্মদৈত্য আমাকে ইচ্ছামত বর দিতে চাহিয়াছে, কি বর লইব তাহা জানিতে স্ত্রীর নিকট যাইতেছি।" নাপিত বলিল "ওরূপ কার্য্য কদাচ করিও না, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। তাহাদিগের সহিত পরামর্শ করা বা তাহাদিগের নিকটে গোপনীয় কথা প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে, তাহাতে হিতে বিপরীত হয়। তবে শোন তোমায় বলি :—

কোনও সময়ে শ্যামনগরের রাজা পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন একটী সুন্দর শিশু কর্দ্দমে পতিত রহিয়াছে ও ক্রন্দন করিতেছে। রাজার পুত্র বা কন্যা ছিল না। তাঁহার হৃদয়ে দয়া জন্মিল। যখন অনুসন্ধান করিয়াও শিশুটী কাহার পুত্র জানিতে পারিলেন না, তিনি তাহাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। শিশুটীর নাম হইল রণবীর। পাঁচ বৎসর পরে রাজার একটী কন্যা জন্মিল। রণবীর বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিল এবং তাহার অসাধারণ বুদ্ধি ছিল বলিয়া সংস্কৃত বিদ্যায় অনায়াসে সাঁতার দিতে লাগিল। এক্ষণে রণবীরের বয়স উনিশ বৎসর হইয়াছে। রণবীরের চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে যারপরনাই ভালবাসিতেন।

একদিন রণবীর অধ্যাপক মহাশয়ের গৃহে গিয়া দেখিলেন তিনি গৃহে নাই। রণবীর অধ্যাপক মহাশয়ের বিছানায় বসিলেন এবং অল্পক্ষণ পরে

ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অধ্যাপক মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রণবীরকে নিজ বিছানায় শায়িত দেখিয়া কিছু বিরক্ত হইলেন, কারণ ছাত্রের গুরুর বিছানায় শয়ন নীতিবিরুদ্ধ। তিনি ডাকিলেন "রণবীর! রণবীর!" রণবীর তাড়াতাড়ি উঠিয়া থতমত খাইয়া অধ্যাপক মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কি ভাবিলেন এবং পরক্ষণেই ফীক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। অধ্যাপক মহাশয় অধিকতর অসন্তুষ্ট হইলেন এবং নিজকে উপেক্ষিত ভাবিয়া রণবীরকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "বদ্মাইস্, কি জন্য হাসিলি বল্।" তখন রণবীর নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন "কই গুরুমহাশয়, আমি ত হাসি নাই।" অধ্যাপক বলিলেন "হাসিস্ নাই, আমাকে দেখিয়া হাসিলি, আবার মিথ্যা কথা?" রণবীর বলিলেন "আজ্ঞে না, আমি হাসি নাই।" তখন রণবীরকে প্রহার করিতে করিতে অধ্যাপক মহাশয় রাজার নিকটে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন "মহারাজ, রণবীর আমাকে উপহাস করিয়া হাসিয়াছে কিন্তু সে কারণ বলিতেছে না।" রাজা সস্নেহে বলিলেন "রণবীর কি জন্য হাসিয়াছ বল।" রণবীর এক কথাই বলেন "আমি হাসি নাই, তা কারণ কি বলিব?" অনেক অনুনয়েও যখন রণবীর হাসির কারণ বলিলেন না, তখন রাজা আদেশ দিলেন যতদিন না হাসির কারণ বলিবে ততদিন রণবীর জেলে থাকিবে। রণবীর জেলে পচিতে লাগিলেন কিন্তু রাজা রণবীরকে এতই ভালবাসিতেন যে তিনি প্রত্যহ জেলে গিয়া রণবীরের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিতেন "বাবা রণবীর, বলনা কিজন্য হাসিয়াছিলে?" রণবীরের সেই একই উত্তর "আমি হাসি নাই তা কারণ কি বলিব?"

এই ঘটনার ছয় মাস পরে প্রবল পরাক্রমশালী রামনগরের রাজা শ্যামনগরের রাজার নিকটে দূত মারফতে একখানি কাগজ পাঠাইলেন, তাহাতে নিম্নলিখিত চারিটী প্রশ্ন ছিল :—

(১) অমৃতে বিষ ?
(২) বিষে সুধা ?
(৩) নগরশ্বা ?
(৪) রাজরাসভ ?

পূর্ব্বকালে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রথা বর্ত্তমান ছিল। যিনি উত্তর দিতে না পারিতেন তাঁহাকে অপমানিত হইতে হইত। তজ্জন্য প্রত্যেক রাজা রাজসভায় ভাল ভাল পণ্ডিত রাখিতেন। শ্যামনগরের রাজার সভাসদ্ পণ্ডিতগণ প্রশ্ন চতুষ্টয়ের কোনও কিনারাই করিতে পারিলেন না। তখন রাজা কাগজখানি লইয়া জেলস্থিত রণবীরের নিকটে গমন করিয়া বলিলেন "বাবা রণবীর বড় বিপদে পড়িয়াছি, তোমার বুদ্ধির উপরে আমার যথেষ্ট আস্থা আছে; দেখ তুমি যদি আমাকে অপমান হইতে অব্যাহতি দিতে পার।" রণবীর বলিলেন "বলুন মহারাজ, আমাকে কি করিতে হইবে। আমি আপনার জন্য নিজ প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নহি। আমি অসহায় অবস্থায় ছিলাম; আপনিই দয়া করিয়া আমাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন। জানিনা আমার পিতা বা মাতা কে। আপনিই আমার সর্ব্বস্ব।" তখন রাজা রণবীরকে কাগজখানি দেখাইলেন। রণবীর প্রশ্নগুলি পড়িয়া বলিলেন "মহারাজ, আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ দাস বোধ হয় প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইবে। ইহার জন্য এক লক্ষ মুদ্রা ও এক মাস সময় চাই।" রাজা বলিলেন "তাহা তুমি পাইবে।" রণবীর বলিলেন "আপনি কাগজখানির উল্টাদিকে লিখিয়া দিউন "আমার এই লোক প্রশ্ন চারিটীর উত্তর দিবে" এবং আপনার নাম সহি করিয়া দিউন।" রণবীর কাগজখানি ও এক লক্ষ মুদ্রা লইয়া রামনগরে চলিয়া গেলেন এবং ষাট হাজার টাকা দিয়া এক সুন্দর অট্টালিকা রামনগরের রাজার প্রাসাদের সম্মুখে নির্ম্মাণ

করাইলেন। পাঁচ হাজার টাকার মূল্যের আসবাবপত্রও সংগৃহীত হইল। রামনগরের রাজার কিছু ঈর্ষা হইয়াছিল কিন্তু রণবীর নিজের পয়সায় বাবুয়ানা করিতেছেন তাহাতে বলিবার কি আছে? ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব হয় না। মোসাহেব জুটিল। মদ ও বেশ্যার অভাব রহিল না। মোসাহেবগণের মধ্যে নগরকোটাল প্রধান। বেশ্যাদিগের মধ্যে ক্ষণপ্রভা অতিশয় রূপবতী ছিল এবং রণবীরকে আন্তরিক ভালবাসিত। এক মাসের মধ্যে সমস্ত টাকা ফুরাইয়া গেল। তখন রণবীর শ্যামনগরের রাজাকে পত্র লিখিলেন "মহারাজ, প্রশ্নের উত্তরের অধিক বিলম্ব নাই; অনেক অর্থের প্রয়োজন হইতেছে; আর পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবেন ও পনর দিন সময় চাই।" শ্যামনগরের রাজা সংবাদ লইতে ভুলেন নাই। তিনি জানিলেন রণবীরের প্রশ্নের উত্তরের কোনও চেষ্টাই নাই; সে কেবলই টাকার শ্রাদ্ধ করিতেছে। যাহা হউক তিনি পঁচিশ হাজার টাকা ও সাত দিন সময় দিলেন। পনর দিন যাইতে না যাইতে পঁচিশ হাজার টাকা উড়িয়া গেল। রণবীর আবার লিখিলেন "আর সামান্য বিলম্ব আছে, আর দশ হাজার টাকা ও সাত দিন সময় পাইলেই আমি প্রশ্নের উত্তর দিয়া ফিরিয়া যাইব।" রাজা আর টাকা পাঠাইলেন না।

রস ফুরাইলেই মুস্কিল!

"আশায় বঞ্চিত হ'লে আসিবেনা আর।
আর না করিবে এই মধুর ঝঙ্কার॥
সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়।
অসময়ে হায়! হায়! কেহ কিছু নয়॥"

মোসাহেবগণ খসিয়া পড়িল। তখন রণবীর শ্যামনগরে ফিরিয়া যাইবার আশা ত্যাগ করিয়া রামনগরের এক সাধারণ ক্ষত্রিয় রমণীর পাণিগ্রহণ

করিলেন। অট্টালিকা ও আসবাব পত্র ৫০০০৲ টাকার মূল্যে বিক্রীত হইল। রামনগরের রাজাই উহা ক্রয় করিলেন। ঐ টাকাও মহাসমারোহে ব্যয়িত হইল। রণবীরের যেমন অসৎকার্য্য ছিল সেইরূপ দান ধ্যানও ছিল। সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইলে রণবীর শ্বশুরালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। রণবীরের শ্যালকপ্রবরেরা রণবীরকে সর্ব্বদাই ঘৃণার চক্ষে দেখিত এবং রণবীরকে স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া রণবীর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন।

একদিন একপ্রহর রাত্রিতে রণবীর একটী কাঠের বাক্স হাতে লইয়া তাঁহার স্ত্রীকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া নিজ কামরায় লইয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রী দেখিল ঐ বাক্স হইতে রক্ত গড়াইতেছে, তাহাতে সে বিস্মিত হইয়া বলিল "তোমার হাতে ওকি?" রণবীর উত্তর করিলেন "দেখ, দুঃখের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া এক শিশুকে হত্যা করিয়াছি; ইহার গায়ের গহণাগুলি লইয়া মৃতদেহটী নদীতে ভাসাইয়া দিব, তোমাকে সাহায্য করিতে হইবে; কিন্তু দেখিও যেন একথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করিও না; করিলে আমার প্রাণ যাইবে।" রণবীরের কথা শেষ হইতে না হইতে তাঁহার স্ত্রী গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া গৃহের শিকল তুলিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। ক্রন্দন শুনিয়া তাহার পিতা ও ভ্রাতারা আসিয়া উপস্থিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রণবীরের স্ত্রী বলিল "তোমরা নরঘাতকের সহিত আমার বিবাহ দিয়াছ, সে কাহার ছেলেকে হত্যা করিয়াছে।" তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটী এক কাণ দুকাণ হইতে সহরময় প্রচারিত হইয়া গেল, এমন কি রাজার কাণে উঠিল। রাজা রণবীরকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য সহরকোটালকে আদেশ দিলেন। কোটাল দুইজন রক্ষী সহ রণবীরের গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং রণবীরের হস্তে শৃঙ্খল পরাইবার জন্য রক্ষীদ্বয়কে হুকুম করিলেন। তাহাতে রণবীর বলিলেন

"সে কিহে ভাই বন্ধু, তুমি আমার এক গ্ল্যাসের ইয়ার, আমার হাতে কড়া লাগাইবে? আমার সহিত তুমি কিরূপ অভিন্নহৃদয় তাহা কি ভুলিয়া গেলে?" তাহাতে নগরকোটাল বলিলেন "তুই আসামী, নরঘাতক, আমাকে বন্ধু বলিতে তোর লজ্জা হইতেছে না? আমি হইতেছি নগরকোটাল, আমার পদ কত উচ্চে; অতঃপর আমার সহিত সাবধানে কথা কহিবি।" এই বলিয়া নগরকোটাল রণবীরকে বেত্রাঘাত করিতে করিতে শৃঙ্খলাবস্থায় রাজসমীপে লইয়া গেলেন। ঐ অবস্থায় রণবীর সেই রাত্রির জন্য হাজতে রহিলেন। পরদিন প্রাতে মন্ত্রীর সহিত বিচার করিয়া রাজা রণবীরের শূল আজ্ঞা দিলেন এবং রাজ্যে ঘোষণা করিলেন "অদ্য বেলা ১২টার সময়ে রণবীরের শূল হইবে, সকলে দেখিবার জন্য বধ্যমঞ্চে আসিবে।"

এদিকে প্রথা অনুসারে রণবীরকে স্নান করাইয়া ও মাথায় গাধার টুপি পরাইয়া দিয়া নগর প্রদক্ষিণ করান হইল। বেলা দশটার পর হইতে পালে পালে লোক বধ্যমঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা, মন্ত্রী এবং নগরকোটাল তথায় উপস্থিত ছিলেন। বেলা ১১টার সময়ে এক অর্দ্ধবসনা ও আলুলয়িত কেশা রমণী বহুকষ্টে ভিড় ঠেলিয়া রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া অতিকাতর ভাবে বলিল "মহারাজ! ধর্ম্মাবতার! ন্যায় বিচার করিবেন। আপনি যাঁহাকে শূলে দিতেছেন, তিনি প্রকৃত পক্ষে হত্যা করেন নাই। হত্যা আমি করিয়াছি; উনি আমাকে অতিশয় ভালবাসেন, তাই আমাকে বাঁচাইবার জন্য উনি বলিয়াছেন তিনি হত্যা করিয়াছেন। পাছে নির্দ্দোষকে শাস্তি দিলে আপনার পাপ হয়, তাই আমি আপনাকে একথা বলিতে আসিয়াছি। আমাকে শূলে দিতে আজ্ঞা হয়।" রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই রমণী কে?" মন্ত্রী রমণীকে চিনিতেন না, সুতরাং তিনি নিরুত্তর রহিলেন। নগরকোটাল ঐ রমণীকে বিলক্ষণ চিনিতেন। তিনি বলিলেন "মহারাজ, এই রমণীর নাম ক্ষণপ্রভা, রণবীরের রক্ষিতা স্ত্রী"। রাজা কোটালের বাক্য শ্রবণ করিয়া

বলিলেন "বারাঙ্গনার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে; অতএব উহাকে বেত্রাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দাও।"

১২টা বাজিতে পনর মিনিট মাত্র আছে, এমন সময়ে রাজা বলিলেন "রণবীর আর পনর মিনিট পরে তোমার মৃত্যু হইবে। তোমার কোনও অভিলাষ আছে?" তখন রণবীর শ্যামনগরের রাজার স্বহস্তে লিখিত সেই পত্রখানি রাজার হস্তে দিলেন। তাহাতে রাজা বলিলেন "তুমি ত অনেক দিন এখানে আসিয়াছ; এতদিন আমার চারিটী প্রশ্নের উত্তর দাও নাই কেন? এখন আর কি করিতে পার?" রণবীর বলিলেন "মহারাজ এতদিন সময় হয় নাই, এখন সময় হইয়াছে, যদি আপনি অনুমতি করেন তবে আমি পনর মিনিটের মধ্যেই আপনার চারিটী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি।" রাজা বলিলেন "পার ত দাও।"

রণবীর বলিয়া গেলেন "আমি রক্তাক্ত বাক্সটী লইয়া আমার স্ত্রীকে বলিয়াছিলাম 'দেখিও কথাটী কাহারও নিকটে প্রকাশ করিও না, করিলে আমার মৃত্যু হইবে' কিন্তু আমার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ কথাটী প্রকাশ করিয়া দিয়া আমার মৃত্যুর কারণ হইল। এজগতে স্ত্রী অপেক্ষা আপন বা অমৃত কি আছে বলুন। লোকে স্ত্রীর জন্য পরমারাধ্য পিতা এমন কি মাতাকেও লাঞ্ছিত করিয়া থাকে। অতএব দেখুন সেই অমৃতই বিষের কাজ করিয়া গেল।

অর্দ্ধবসনা ও আলুলায়িতকেশা যে স্ত্রীলোকটী নিজ প্রাণ দিবার জন্য আপনার নিকটে ভিক্ষা করিতেছিল সে গণিকামাত্র; সুতরাং তাহাকে বিষ বলা যাইতে পারে। সেও আন্তরিক ভালবাসিতে জানে। নিজ প্রাণ অপেক্ষা আদরের জিনিষ কি থাকিতে পারে? ঐ গণিকা আমার জন্য প্রাণ দিতে আসিয়াছিল। আপনি শুনিলেন না, শুনিলে সে অকাতরে প্রাণ দিত। প্রকৃতপক্ষে সেও হত্যা করে নাই। অতএব বিষ অমৃতের কাজ করিয়া গেল।

শ্বা অর্থে কুকুর। কুকুরকে ভাত দিলে লেজ নাড়িয়া ভাত খাইতে থাকে, ভাত দেওয়া বন্ধ করিয়া হাত একটু উপরে উঠাইলে কুকুর খ্যাক্ খ্যাক্ করিয়া কামড়াইতে উদ্যত হয়; আপনার নগরকোটাল ঐ কুকুরজাতীয়। যখন আমি অত্যধিক পয়সা উড়াইয়াছি তখন উনি আমার মোসাহেব বা স্তাবক ছিলেন। উনি আমার পয়সায় অনেক বাবুয়ানি করিয়াছেন; এক্ষণে আমার দুর্দ্দিনে আমি উঁহাকে বন্ধু বলিয়াছিলাম বলিয়া উনি আমাকে যৎপরনাস্তি তিরস্কার ও প্রহার করিয়াছেন। অতএব আপনার নগরকোটাল নগরশ্বাএর কাজ করিল।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দিতে কিছু ভয় হইতেছে; কিন্তু মৃত্যু যাহার শিয়রে তাহার আবার ভয় কি? মহারাজ স্বয়ং রাজরাসভ বা রাজগর্দ্দভ বা গর্দ্দভশ্রেষ্ঠ। মহারাজ, আমি কাহার ছেলে হত্যা করিয়াছি? যদি কাহারও ছেলে হত্যা করিতাম তাহা হইলে যাহার ছেলে হারাইয়াছে সে নিশ্চয়ই আপনাকে সংবাদ দিত। অধিকন্তু যে বাক্সে মৃতদেহ আছে, সেই বাক্সটী আপনি একবার পরীক্ষাও করিলেন না। আমার স্ত্রীর কথাতেই বিশ্বাস করিয়া আমাকে শূলে দিবার আদেশ দিলেন। প্রকৃত পক্ষে আমি কাহারও ছেলেকে হত্যা করি নাই। আমি একটী ছাগলছানা হত্যা করিয়া বাক্সের মধ্যে রাখিয়াছিলাম। বাক্স হইতে ছাগলছানার রক্ত গড়াইতেছিল।"

রাজা তৎক্ষণাৎ বাক্সটী আনাইয়া উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন বাস্তবিকই বাক্সের মধ্য ছাগলছানার মৃতদেহ ছিল। রাজা প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তর শ্রবণ করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং রণবীরের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন। শ্যামনগরের রাজা শুনিলেন রণবীর প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তর দিয়াছেন এবং তিনি রামনগরের রাজার বৈবাহিক হইয়াছেন। তখন তিনিও রণবীরের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন।

একদিন দিবাভাগে রণবীর শয্যায় শায়িত ছিলেন এবং দুই রাজকন্যা তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন। রণবীরের অধ্যাপক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন কারণ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন রণবীরই ভাবী রাজা। অধ্যাপক মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া রণবীর অতি সম্ভ্রমের সহিত উঠিয়া অধ্যাপক মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিলেন "গুরুদেব, আজ আমি আপনাকে সেই হাসির কথা বলিব। আমি আপনার বিছানায় শয়ন করিয়াই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তন্দ্রাবস্থায় কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম জানেন? এই আপনি আজ যাহা চাক্ষুষ করিলেন অর্থাৎ আমি স্বপ্নে দেখিতেছিলাম আমি রাজা হইয়াছি এবং রামনগরের রাজকন্যা ও শ্যামনগরের রাজকন্যা আমার পদসেবা করিতেছে। আমি তখন পথের ভিখারী; সেই স্বপ্নের বিষয় চিন্তা করিয়াই হাসিয়াছিলাম, আপনাকে দেখিয়া নহে। তখনি এই কথা প্রকাশ করিলে আমার প্রাণ যাইত; তাই বলি নাই।" অধ্যাপক মহাশয় রণবীরকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এই কথা বলিয়া নাপিত বন্ধু বলিল "তাই বলিতেছিলাম স্ত্রীলোকদিগের সহিত পরামর্শ করা উচিত নহে এবং তাহাদিগকে গোপনীয় কথা বলিবে না। আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি শুন। লোকে গুরুজনদিগকে প্রণাম করিলে তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করেন 'রাজা হও'। অতএব রাজা হওয়া অপেক্ষা অধিক সুখ আর কি থাকিতে পারে? তুমি বর চাও রাজা হইবে; আমি মন্ত্রী হইয়া তোমার রাজ্য সুশাসনে চালাইব; তোমাকে কোনও কষ্ট পাইতে হইবে না।"

তন্তুবায় তাহার স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিত এবং নিতান্ত ভালমানুষ বা বেচারা প্রকৃতি ছিল। সে বলিল "তা'হোক, তবু একবার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" তন্তুবায়পত্নী সকল কথা শুনিয়া বলিল "অমন কাজও

করিও না; শৃগাল, বায়স ও নাপিত ইহারা অত্যন্ত ধূর্ত্ত; সুতরাং ইহাদের সহিত পরামর্শ করা আদৌ উচিত নহে। তবে তোমাকে বলি শুন—

এক নাপিত ও এক কুমার অভিন্নহৃদয় ছিল। একদিন কুমার বলিল "আচ্ছা ভাই নাপিতবন্ধু লোকে যে বলে নাপিত ধূর্ত্ত, তা তোমার ধূর্ত্ততা ত দেখিলাম না।" নাপিত বলিল "আচ্ছা, একদিন দেখাইব। তা উপস্থিত ভাই একটা কথা বলিতেছিলাম কি—আমার ছেলে বলে সে মাটীর টাকা লইয়া খেলিতে ভালবাসে। তা তুমি আমাকে গোটা পঞ্চাশ মাটীর টাকা তৈয়ার করিয়া দিতে পার?" কুমার বলিল "তা আর পারিব না কেন?" নাপিত বলিল "তা কতদিনে পারিবে?" কুমার বলিল "এক সপ্তাহের মধ্যে দিতে পারিব।" ইহার দুই দিন পরে এক বকুলতলায় (যেখানে অনেক ভদ্রলোক একত্র হইয়া সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন) নাপিত কুমারকে বলিল "সেই পঞ্চাশটী টাকা আজ দিতে পারিবে?" কুমার মনে মনে জানিত নাপিত মাটীর টাকার কথা বলিতেছে; সুতরাং সে বলিল "সে টাকা ত আরও পাঁচ দিন পরে দিবার কথা।" পরদিন নাপিত কুমারের নামে ৫০ টাকার দাবী দিয়া আদালতে নালিশ করিল এবং সেই ভদ্রলোকদিগকে সাক্ষী মানিল। সাক্ষীরা সত্য কথাই বলিল। কুমারের মাটীর টাকার কথায় কেহই কর্ণপাত করিলেন না। নাপিতের ডিক্রী হইল। কুমারের পঞ্চাশ টাকা নাই। নাপিত কুমারের ঘটী, বাটী ইত্যাদি অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিল, এমন কি গৃহের চারিদিকের চাল কাটিয়া লইল। কুমার ত অবাক্। সে বাস্তবিকই নাপিতের পঞ্চাশ টাকা ধারে না। কুমার তিন দিন অভিমানে রহিল, পরে অত্যধিক কষ্ট হওয়ায় সে রাত্রিতে নাপিতের বাড়ী গিয়া বলিল "ভাই বন্ধু, এই বন্ধুর কাজ, আমি বাস্তবিক তোমার নিকট হইতে টাকা ধার লই নাই, মাটীর টাকার কথা ছিল মাত্র। ইহা লইয়া তুমি মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করিলে?" তখন নাপিত বলিল "তুমি নাপিতের

ধূর্ত্ততা দেখিতে চাহিয়াছিলে, তাই আমি এরূপ করিলাম। এখন দেখিলে ত নাপিতের ধূর্ত্ততা ?” এই বলিয়া নাপিত কুমারের সমস্ত দ্রব্য ফিরাইয়া দিল।”

তন্তুবায়পত্নী বলিয়া গেল “তা ছাড়া রাজা হওয়ার অনেক বিপদ।

“যদৈব রাজ্যে ক্রিয়তেঽভিষেক স্তদৈব যাতি ব্যসনেষু বুদ্ধিঃ।
ঘটা নৃপানামভিষেককালে সহাম্ভসৈর্ব্বাপদমুদ্গীরন্তি।”

রাজ্যে অভিষেক হইলেই রাজার বুদ্ধি নানা রকম ব্যসনের দিকে ধাবিত হয়। অভিষেকের সময়ে রাজার মস্তকে যে জলরাশি ঢালা হয়, তাহা জল নহে, আপদ রাশি।

অধিকন্তু রাজা হইলেই যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদিতে লিপ্ত হইতে হইবে, তাহাতে রাজার মৃত্যুও হইতে পারে, অতএব ও সব দুশ্চিন্তার আবশ্যকতা কি ? আমার বুদ্ধি শুন। তুমি ত প্রত্যহ একখানি কাপড় বুন, তাহাতে আমাদের সংসার কষ্টে চলে, ভবিষ্যতের জন্য কিছুই থাকে না। যদি তুমি একই সময়ে দুইখানি কাপড় বুনিতে পার, তাহা হইলে একখানির মূল্যে আমাদের সংসার যেমন চলিতেছে সেইরূপই চলিবে; অপরখানির লব্ধ অর্থ আমরা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে পারিব। তাহাতে মনে অশান্তির কারণ থাকিবে না। অতএব তুমি এই বর চাও, যে তোমার পশ্চাদ্দিকে একটী মাথা, দুইটী হাত ও দুইটী পা হউক। তাহাতে তুমি একই সময়ে দুইখানি কাপড় বুনিতে সমর্থ হইবে।”

তন্তুবায় স্ত্রীর কথায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মদৈত্যের নিকটে পূর্ব্বমত বর প্রার্থনা করিল। ব্রহ্মদৈত্য ‘তথাস্তু’ অর্থাৎ তাহাই হউক, বলিয়া অন্তর্হিত হইল। তন্তুবায় আনন্দচিত্তে গৃহে ফিরিতেছিল। গ্রামবাসিগণ ভীত হইয়া তাহাকে রাক্ষস বলিয়া অনুমান করিল এবং পাথর প্রভৃতি দ্বারা প্রহার করাতে তন্তুবায় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

এক সদাগর চারিটী নীতিবিশিষ্ট একখানি কাগজ বিক্রয় করিবার মানসে এক রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া এক লক্ষ মুদ্রা চাহিল। রাজা কৌতূহলবশতঃ এক লক্ষ মুদ্রা দিয়া কাগজখানি ক্রয় করিয়া সুবর্ণ বাক্সে রাখিয়া দিলেন। দৈবযোগে রাজার হঠাৎ মৃত্যুসময় উপস্থিত হইল। তিনি পুত্রকে বলিলেন "সুবর্ণ বাক্সে চারিটী নীতিবিশিষ্ট একখানি কাগজ আছে; আমি সময় পাইলাম না, তুমি উহা পরীক্ষা করিও।" অল্প দিন পরে নূতন রাজা ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে স্বর্গীয় সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া জানিলেন লক্ষহীরা গান গাহিতেছে; কিন্তু এক লক্ষ মুদ্রা অগ্রিম না দিলে লক্ষহীরার নিকটে যাওয়া যায় না। তিনি তৎক্ষণাৎ এক লক্ষ মুদ্রা দিলেন। লক্ষহীরার রূপে ও সঙ্গীতে একান্ত মুগ্ধ হইয়া রাজা তাহাকে প্রত্যহ এক লক্ষ মুদ্রা দিয়া যাইতে লাগিলেন। কলসীর জল গড়াইলে উহা শূন্য হইতে অধিকক্ষণ লাগে না। প্রত্যহ এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হওয়ায় রাজভাণ্ডার অচিরে শূন্য হইল; এমন কি এমন দিন আসিল যখন রাণীর অলঙ্কারাদিও রহিল না। শেষে রাজা দেখিলেন তাঁহার সহস্র মুদ্রা নাই। লক্ষ মুদ্রা লইয়া না গেলে লক্ষহীরার নিকটে যাওয়া চলে না। রাজা অত্যন্ত অনিচ্ছায় ও বিষাদচিত্তে রাজভবনে রহিয়া গেলেন। তখন বাক্সের মধ্যে লক্ষ মুদ্রা মূল্যের উপদেশপূর্ণ কাগজখানির কথা স্মরণপথে আসিলে রাজা মনে মনে ভাবিলেন "বাবা, লক্ষ মুদ্রা মূল্য দিয়া কাগজখানি যদি ক্রয় না করিতেন তবে ঐ মুদ্রা থাকিত এবং উহা দ্বারা অদ্য লক্ষহীরার নিকটে যাওয়া চলিত।" এই ভাবিয়া তিনি উপদেশগুলি পরীক্ষা করিবার মনস্থ করিলেন। তিনি বাক্স হইতে কাগজখানি বাহির করিয়া চারিটী উপদেশ পড়িয়া লইলেন এবং প্রথমটীর পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত হইলেন। ইহা হইতেছে :—

(১) রাত্রি জাগরণে ফললাভ নিশ্চয়ই।

এক প্রহর রাত্রি অতীত হইলে রাজা অসিহস্তে রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে

পরিভ্রমণ করিতে করিতে করুণ ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া শব্দ লক্ষ্য করতঃ সেই দিকে গমন করিলেন এবং দেখিলেন এক দেবী রোদন করিতেছেন। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "কে মা আপনি এবং কেনই বা আপনি রোদন করিতেছেন?" দেবী বলিলেন "আমি রাজলক্ষ্মী, পূর্ব্ব রাজার রাজত্বে আমি অত্যন্ত সুখে ছিলাম। বর্ত্তমান রাজা রূপের মোহে পড়িয়া অত্যন্ত অমিতব্যয়ী হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং আমার এখানে স্থান কোথায়? ইহাই আমার রোদনের কারণ।" রাজা বলিলেন "আমিই বর্ত্তমান রাজা; আমি আপনার নামে শপথ করিতেছি আর কখনও লক্ষহীরার নাম করিব না।" রাজলক্ষ্মী সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "তোমার রাজ্য পূর্ব্বের ন্যায় হইবে এবং আমার বরে তুমি ইতর প্রাণীর কথা বুঝিতে পারিবে।" অল্প দিনের মধ্যে রাজ্যের শ্রী ফিরিয়া আসিল।

রাজা দেখিলেন রাত্রি জাগরণ করিয়া তাঁহার বিশেষ ফললাভ হইল। তখন তিনি দ্বিতীয় উপদেশটী পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা করিলেন। ইহা হইতেছে :—

(২) ঋণ করিয়াও ঘি খাইবে।

রাজা ভাবিলেন তিনি ত প্রত্যহই ঘি খান সুতরাং তাঁহাকে ঋণ করিয়া ঘি খাইতে হইবে না। তিনি সেদিন বিনাঘৃতে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। পাচক রাজার সম্মুখে খাদ্য আনিয়া দিলে তিনি শ্রবণ করিলেন একটী পিপীলিকাপত্নী পিপীলিকাকে বলিতেছে "নাথ, আমার উদরে সন্তান আছে, আমার ঘৃত খাইবার ইচ্ছা হইতেছে; অতএব তুমি আমাকে কিছু ঘৃত দাও।" তাহা শুনিয়া পিপীলিকা বলিল "দুঃখের কথা বলিব কি, রাজার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে? আজ তিনি ঘৃতহীন ব্যঞ্জন খাইতেছেন। মুর্খ রাজা জানেন না ঘৃত শুধু বলকারী খাদ্য নহে, ইহা অপর দ্রব্যকে সহজে পরিপাক

করিবার সাহায্য করে; সুতরাং ঘৃত না খাইলে তিনি অল্পায়ু হইবেন।" রাজা রাজলক্ষ্মীর বরে পিপীলিকা ও তৎপত্নীর কথা বুঝিতে পারিয়া পাচককে কিছু ঘৃত আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। পিপীলিকা তৎক্ষণাৎ কিছু ঘৃত মুখে করিয়া লইয়া পত্নীকে দিল। রাজা পিপীলিকার পত্নীপ্রেমের বিষয় চিন্তা করিয়া মনে মনে হাস্য করিলেন ও ঘৃতের উপকারিতা বুঝিয়া আর কখনও ঘৃতহীন ব্যঞ্জন খান নাই। কিছুদিন পরে তৃতীয় উপদেশটী পরীক্ষা করিবার মানসে রাজা বাক্সটী খুলিয়া দেখিলেন কাগজে লেখা ছিল :—

(৩) আগন্তুককে সম্মান করিবে।

বাক্সটী বন্ধ করিয়া রাজা সিংহাসনে বসিয়া আছেন এমন সময়ে সুন্দর পরিচ্ছদধারী জনৈক আগন্তুক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে অত্যধিক সম্মান প্রদর্শন করিয়া সিংহাসন ছাড়িয়া দিলে আগন্তুক বলিলেন "মহারাজ, নির্জন গৃহে আসুন, আপনার সহিত গোপনীয় কথা আছে।" উভয়ে নির্জন গৃহে প্রবেশ করিলে আগন্তুক সহসা বলিয়া উঠিলেন "মহারাজ, আমি আপনার যম, আপনার আয়ু ফুরাইয়াছে, আপনাকে লইতে আসিয়াছি, শীঘ্র প্রস্তুত হউন।" রাজা বলিলেন "আমি প্রস্তুতই আছি; চলুন।" মৃত্যুপতি রাজার এরূপ ভয়শূন্য বাক্য শ্রবণ করিয়া যারপরনাই প্রীত হইয়া বলিলেন "আমি আপনাকে আরও দেড় শত বৎসর পরমায়ু প্রদান করিলাম; কিন্তু লক্ষ্মীর বরে আপনি যে ইতর প্রাণীর কথা বুঝিতে পারেন তাহা কাহারও নিকটে প্রকাশ করিবেন না। করিলে তদ্দণ্ডেই আপনার মৃত্যু হইবে।" রাজা দেখিলেন তিনি তিনটী উপদেশ দ্বারাই বিশেষ লাভবান হইলেন। অতঃপর তিনি চতুর্থ উপদেশটী পরীক্ষা করিবার মানসে বাক্সটী খুলিলেন ও অতীব বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন কাগজখানি নাই এবং অনেক চেষ্টা করিয়াও চতুর্থ উপদেশটী স্মরণপথে আনিতে পারিলেন না। তখন প্রথম তিনটী

উপদেশ পুনরাবৃত্তি করিবার মনস্থ করিয়া রাজা রাত্রি এক প্রহরের পরে নিজ গোশালার নিকটে বসিয়া রহিলেন। রাণী রাজার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন এবং অন্তরালে রহিলেন। রাজা শুনিতে পাইলেন গাভীগুলি বলিতেছে "মানুষ অত্যন্ত পাপী, নির্দ্দয় ও স্বার্থপর। ভগবান আমাদের বাঁটে দুধ দিয়াছেন, তোমাদের জন্য; কিন্তু মানুষ আমাদিগকে দুই তিন বার করিয়া দোহন করে, তাহাতে তোমরা দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছ। অতএব তোমরা মুখ উচু করিয়া গলার রজ্জু খুলিয়া দুধ খাইয়া যাও।" গাভীদিগের বুদ্ধির বিষয় চিন্তা করিয়া রাজা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহাতে রাণী রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "আবার কি তোমার বুদ্ধিভ্রম ঘটিল? কোন্ প্রণয়িনীর সহিত রসালাপ করিয়া হাস্য করিতেছিলে বল?" রাজা বলিলেন "প্রণয়িনী নহে, গাভীদিগের কথা শুনিয়া হাসিতেছিলাম।" রাণী বলিলেন "গাভীদিগের কি কথা না শুনিলে বিশ্বাস করিতে পারি না।" রাজা বলিলেন "সে কথা প্রকাশ করিলে আমার মৃত্যু হইবে।" রাণী বলিলেন "আমি তোমার ওসব বাজে কথা শুনিতে চাহি না; তোমাকে বলিতেই হইবে।" রাজা বলিলেন "যদি একান্তই শুনিতে চাও, তবে কল্য প্রাতে গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া বলিব।" পরদিন প্রাতে উভয়ে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে রাজা দেখিলেন একটী ছাগ বাবলা গাছের পাতা খাইতেছে, কিন্তু ছাগী পাতাগুলি তাহার আয়ত্তে পাইতেছে না। তখন রাজা শুনিলেন ছাগী ছাগকে বলিতেছে "উপরের ডালটী নোয়াইয়া ধরনা আমি পাতা খাই।" ছাগ বলিল "আর ডালটী যদি আমাকে উপরে তুলিয়া ফেলে, তখন আমার দশা কি হইবে?" ছাগী বলিল "তা হোক, তুমি আমাকে ভালবাস, তুমি ডালটী নোয়াইয়া ধর।" তখন ছাগ ছাগীকে শৃঙ্গ দ্বারা প্রহার করিতে করিতে বলিল" ধেৎ, তোর ভালবাসা, ভালবাসা পৃথিবীতে নাই, যদি থাকে তবে ঘুঘুর বাসায় দেখিতে পাইবে। তুই কি আমাকে বোকা রাজা পাইয়াছিস্? রাজা এত বড় মূর্খ যে নিজের

প্রাণ যাইবে তবু রাণীকে গুপ্তকথা বলিতে আসিয়াছে, জানিস্ শাস্ত্রে আছে (৪) "সর্ব্বদা রাখিবে শাসন আপন পত্নীকে"। হঠাৎ রাজার স্মরণ হইল কাগজের চতুর্থ উপদেশটী তাহাই যাহা তিনি এতদিন স্মরণপথে আনিতে পারিতেছিলেন না। তখন তিনি রাণীকে বেত্রাঘাত করিতে করিতে বলিলেন "আর গুপ্ত কথা শুনিবে ?" রাণী বলিলেন "চল বাড়ী যাই !"

(১০) ঘোড়ার কিস্তিতে ঢাকিবার চেষ্টা করিও না।

যাহা অসম্ভব তাহা সম্ভব করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

(১১) দেবদেবীর প্রতি অসম্মান দেখাইও না।

ভগবৎশক্তি তাঁহাদিগের ভিতরে থাকিতে পারে; সুতরাং তাঁহারাও ভগবৎশক্তিতে সমধিক শক্তিমান। সম্মান দেখাইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু অসম্মান দেখাইলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি এক সঙ্গতিপন্ন ও স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি (যাহার ঈশ্বর বা দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস ছিল না) এক পরিত্যক্ত শিবলিঙ্গের উপরে বসিয়া মূত্রত্যাগ করিয়াছিল। কিছুদিন পরে ঐ ব্যক্তির আর্থিক দুরবস্থা ঘটিয়াছিল এবং ক্ষয়রোগে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। মন খুঁৎখুঁৎ করিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। মুখে আমরা যতই দেখাই না কেন, পূর্ব্ব সংস্কার সহজে যায় না।

(১২) অসৎ উদ্দেশ্যে জীবহিংসা করিও না।

(১৩) নরহত্যা কখনও করিবে না।

মানুষ ভগবানের অতি প্রিয়। তাহাকে হত্যা করিলে তাঁহার মনে কষ্ট দেওয়া হয়, সুতরাং তাঁহার রোষানলে পড়িতে হয়। যে ব্যক্তি নরহত্যা করে, মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা সততই তাহার মনে উদিত হয়, সুতরাং তাহার মনে চির অশান্তি বিরাজমান হয়। নরঘাতকদিগকে অনেক সময়ে পাগল হইতে দেখা যায়।

ব্রুটাস জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সিজারের প্রেতাত্মা ব্রুটাসকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়াছিলেন এবং ব্রুটাস পাগলপ্রায় হইয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"Like Brutus amidst his slumbering host,
Was startled by Caesar's stalwart ghost."

(১৪) অ-আমিকে অযথা ব্যথা দিবে না।

"মোর লাগি ব্যথা নাহি পায় দাসদাসী।"

(১৫) পাপকে সামান্যমাত্রও প্রশ্রয় দিবে না।

সমুদ্রের বাঁধে সূত্রের আকারে সামান্য ছিদ্র হইলে অচিরে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে।

কোনও সময়ে উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাইতে যাইতে এক আরব শীতকালের রাত্রিতে এক পান্থনিবাসে আশ্রয় লইয়াছিল। আরব উটটীকে জানালার গরাদে দীর্ঘ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া নিজে গৃহাভ্যন্তরে রহিল।

অল্পক্ষণ পরে উট তাহার মাথাটী গৃহের ভিতরে প্রবেশ করাইলে, আরব বিরক্ত হইয়া বলিল "আরে ঘৃণিত জীব, বাহিরেই থাক।" উট বলিল "ভাই, বাহিরে বড় শীত, আমি কেবল নাসিকার ছিদ্র দুইটী ভিতরে রাখিয়াছি।" আরব দুর্ব্বলচিত্ত সুতরাং সে কিছুই বলিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে উট সম্মুখের পাদুখানিও গৃহের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিল। তখন আরব বলিল "আর না, তুমি অত্যন্ত ঘৃণিত জীব এবং তোমার গায়ে বড় দুর্গন্ধ, সুতরাং তুমি "নিকাল হিঁয়াসে" বা বাহিরে যাও।" এই কথা শুনিয়া উট সমস্ত দেহটী ভিতরে প্রবেশ করাইয়া আরবকে বলিল "ভাই হে, যদি আমার উপস্থিতি তোমার পক্ষে এতই বিরক্তিকর হয়, তবে তুমি নিজে বাহিরে যাইতে পার।"

হিন্দুধর্ম্ম ছিদ্র দিতে প্রস্তুত নহে বলিয়াই বহু ধাক্কা খাইয়াও এখনও জীবিত আছে।

(১৯) অজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না।

মূর্খকে হিত উপদেশ দিতে গেলে, অনেক সময়ে বিপরীত ফল ফলে; কারণ সে সর্ব্বদাই অজ্ঞানরূপ তিমিরে থাকিতেই ভালবাসে।

এক বৃক্ষে বহু পক্ষী বাসা বাঁধিয়াছিল। হঠাৎ বৃষ্টি আসায় কতিপয় বানর সেই বৃক্ষে আসিয়া আশ্রয় লইল। ঝড়ে ও বৃষ্টিতে বানরদিগের কষ্ট হইতেছিল দেখিয়া সেই বৃক্ষস্থিত এক বৃদ্ধ পক্ষীর দয়া হইল। সে বলিল "ভাই বানরগণ, দেখ আমরা ক্ষুদ্র জীব, আমাদের হাত নাই; তবু দেখ আমরা চঞ্চু দ্বারা বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছি; সুতরাং ঝড়ে ও জলে আমাদিগকে কষ্ট পাইতে হয় না। তোমরা বৃহৎ জীব এবং তোমাদের হাত আছে। তোমরা অনায়াসে ভাল বাসা তৈয়ারী করিতে পার। আমার কথা শুন। অতঃপর তোমরা বাসা নির্ম্মাণ করিবে।" বানরগণ এইরূপ হিত কথা শুনিয়া মনে মনে বলিল "বটে, উপদেশ দেওয়া হইতেছে; থাম বৃষ্টি ছাড়ুক, তারপর দেখাইতেছি।" বৃষ্টি থামিলে বানরগণ পক্ষিগণের সমস্ত বাসা ভাঙ্গিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিল।

হুগলী জেলার কোন সুপরিচালিত টোলের অধ্যাপক মহাশয় ভাললোক। তিনি তিন চারি ঘণ্টা ধরিয়া সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারেন। তিনি জনসাধারণের হিতার্থে বহু কর্ম্ম করিয়া থাকেন। একদিন তাঁহার বাড়ীর নিকটে এক নিরক্ষর কামার এক ব্রাহ্মণকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতেছিল। অধ্যাপক মহাশয় কামারকে হিত উপদেশ দিতে যাওয়ায়, কামার হঠাৎ বাড়ীর ভিতর হইতে একটি বল্লম আনিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের বুকে উহা প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল। ভগবানের অসীম করুণা বল্লমটী অধ্যাপকের

ফুস্‌ফুস্‌ ভেদ করে নাই। ৩।৪ মাস মেডিক্যাল কলেজে থাকিয়া বুকের একখানি পাঁজর দিয়া অধ্যাপক মহাশয় আরোগ্যলাভ করিয়াছেন এবং কামারের জেল হইয়াছিল।

কাহারও ভুল দেখিতে পাইলে, তুমি কখনও রুক্ষ কথায় বলিবে না "তোমার ভুল হইয়াছে"। তুমি তাহার পাশে প্রকৃত আদর্শ ধরিবে। পরে সে ব্যক্তি নিজ ভুল বুঝিতে পারিয়া তোমাকে অনুকরণ করিবে। গ্রীক্ পণ্ডিত সক্রেটীস্‌ কাহাকেও বলিতেন না "তোমার ভুল হইয়াছে।" তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেন, পরে সে ব্যক্তি নিজ ভুল বুঝিতে পারিত। মানুষ নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেই সংশোধনের চেষ্টা করিবে।

(২০) "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্‌।"

অকস্মাৎ কোনও কর্ম্ম কোরোনা কোরোনা।

এক সদাগরকে রাজাদেশে বাণিজ্যার্থে দূর দেশে যাইতে হইয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহার পত্নী সন্তানসম্ভাবিতা ছিল। ষোড়শ বৎসর পরে সদাগর দেশে ফিরিলেন। বেলা দেড়টার সময়ে তিনি নিজ ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাঁহারই শয্যায় তাঁহার পত্নী ঘুমাইতেছে এবং তাহার পাশে এক যুবক শুইয়া আছে। সদাগরের রক্ত গরম হইয়া গেল। তিনি পূর্ব্বে এক সহস্র মুদ্রা দ্বারা একখানি কাগজ ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাতে লেখা ছিল—

"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্‌" এবং তিনি কাগজখানি তাঁহার শয্যাগৃহে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলেন। সেই কাগজখানির পাশে একখানি অসি ঝুলিতেছিল। অসিখানি হাতে লইয়া সদাগর পত্নী ও যুবককে হত্যা করিবার মানসে অসি উত্তোলন করিবা মাত্র কাগজখানিতে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তখন তিনি মনে মনে ভাবিলেন যাত্রাকালীন তাঁহার পত্নী সন্তানসম্ভাবিতা ছিল এবং ষোল বৎসর পরে তিনি দেশে ফিরিয়াছেন। এই যুবক তাঁহার পুত্র

হইলেও হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি অসিখানি রাখিয়া দিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার পত্নীর ঘুম ভাঙ্গিলে তিনি জানিতে পারিলেন সেই যুবক তাঁহারই পুত্র।

শৃগালকে বলিতে শুনা গিয়াছে—

"ভাবিয়া যে করে কাজ সুখ তার হয়।
না ভাবিয়া করিলে কাজ মরণ নিশ্চয়
এত বৃদ্ধ হইয়াছি বাস করি বনে।
গুহায় যে কথা কয় না শুনি শ্রবণে॥"

(২১) পরের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিও না।

যে পরের অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়, অগ্রে তাহারই অনিষ্ট হইয়া থাকে।

কোন ও বনে একটী সরোবর ছিল। উহাতে দুইটী মাত্র ঘাট ছিল। প্রথম ঘাটে একটী গর্ত্ত ছিল, তাহাতে এক ব্যাঘ্র বাস করিত এবং দ্বিতীয় ঘাটে একটী জামগাছ ছিল, তাহাতে এক বানর বাস করিত। ব্যাঘ্র দিনের বেলায় গর্ত্তে থাকিত এবং রাত্রিতে আহারের অন্বেষণে বাহির হইত এবং বানর রাত্রিতে গাছে থাকিত এবং দিনের বেলায় চরিয়া বেড়াইত। ব্যাঘ্র ও বানরের মধ্যে অহিনকুলের ভাব বিদ্যমান ছিল। ব্যাঘ্র বানরের ঘাটে জলপান করিতে পাইত না এবং বানর ব্যাঘ্রের ঘাটে জলপান করিতে পাইত না। একদা এক আসন্নপ্রসবা শৃগালী রাত্রিতে চরিতে চরিতে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলপানের অভিপ্রায়ে সরোবরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শৃগালী দেখিল বানর নিজ ঘাটে রহিয়াছে, বাঘ নাই। সে এই অবসরে বাঘের ঘাটে জলপান করিয়া পলায়ন করিবার মনস্থ করিল; কিন্তু জলপান করিয়া উঠিতে না উঠিতে তাহার প্রসববেদনা উপস্থিত হইল এবং সে সাতটী শাবক প্রসব করিল। তখন শৃগালী ভাবিতে লাগিল "হায় মরিলাম, এখনই বাঘ আসিয়া আমাকে ও শাবক

গুলিকে মারিয়া ফেলিবে ; শিশুসন্তানগুলিকে অন্যত্র লইয়া যাইবারও উপায় নাই ; এক্ষণে কি করি ? যা করেন ভগবান।" এই ভাবিয়া সে শাবক গুলিকে মুখে করিয়া বাঘের গর্ত্তে লইয়া গেল এবং তাহাদিগকে পিছনে রাখিয়া নিজে সম্মুখে বসিয়া রহিল। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে বানর গাছ হইতে শৃগালীর কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল। ভোর হইবামাত্র ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ব্যাঘ্র তাহার ঘাটে নামিতে উদ্যত হইলে, শৃগালী ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া শাবকদিগকে নখরাঘাত করায়, শাবকগুলি চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাতে শৃগালী বলিয়া উঠিল "বাপ্‌রে, বাপ্‌রে, তোদের পেট কে ভরাবে ! আমি এই মাত্র সাতটা বাঘ মারিয়া তো'দিগকে খাওয়াইলাম, আমি তাহার একটুকুও খাই নাই। আবার এখনি একটা রোগা বাঘ দেখিয়া খাব খাব করিতেছিস্।" ব্যাঘ্র এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিল "এ আবার কি ? একি অদ্ভুত জানোয়ার আসিল, যাহার প্রত্যেক শাবক একটা বাঘ খাইয়া আবার খাই খাই করে ! না, হঠাৎ কাছে যাওয়া হইবে না।" এই ভাবিয়া তৃষ্ণার্ত্ত ব্যাঘ্র বানরের ঘাটে গিয়া বলিল "ভাই বানর, আমার ঘাটে কি এক অপূর্ব্ব জানোয়ার আসিয়াছে, যাহার এক এক শাবক এক এক বাঘ খাইয়া আবার খাব খাব করে। দয়া করিয়া তোমার ঘাটে আমাকে একটু জলপান করিতে দাও। আমি জলপান করিয়া অন্য বনে চলিয়া যাইব ; এ বনে আর থাকিব না।" এই কথা শুনিয়া বানর বলিল "অরে ব্যাঘ্রকুলকলঙ্ক ! ওটা শৃগালী। উহাকে সাতটী ছানা প্রসব করিতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তুই এখনি গিয়া শৃগালীকে ও তাহার ছানাগুলিকে নিহত করিয়া আপন ঘাটে জলপান কর্‌গে।" বানরের কথা শুনিয়া শৃগালী মনে মনে ভাবিল "আমি ত বানরের কোনও অনিষ্ট করি নাই, তবে বানর কেন আমার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে ? বানর কোনও কথা না বলিলেই বাঘ ত বানরের ঘাটে জলপান করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইত।

বাঘ যদি বানরের কথা শুনিয়া আমাকে ও সন্তানদিগকে মারিয়া ফেলে তবে ত গেলাম। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।" ব্যাঘ্র বানরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই; অধিকন্তু সে মনে করিল "অপূর্ব্ব জন্তু আমাকে মারিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে আমার ঘাটটীও বানরের আয়ত্তে আসিবে।" ব্যাঘ্রকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বানর বলিল "বোধ হয় তোমার বিশ্বাস হইতেছে না; বল কিসে তোমার বিশ্বাস হইবে। আমি স্থির জানি উহা শৃগালী।" ব্যাঘ্র বলিল "যদি আমার লেজের সহিত তোমার লেজ বন্ধন কর, তবে উভয়ে ঐ জন্তুর নিকটে যাইতে পারি। মরি ত উভয়েই মরিব।"

বানর ব্যাঘ্রের প্রস্তাবে সম্মত হইল। বানরের মুখ ছিল সম্মুখের দিকে এবং ব্যাঘ্রের মুখ ছিল পশ্চাদ্দিকে। এইরূপ অবস্থায় উভয়ে শৃগালীর নিকটে উপস্থিত হইলে শৃগালী পূর্ব্ববৎ শাবকদিগকে আঘাত করিল এবং বলিল "ধন্য তোদের ক্ষিদে। বানরকে ২১টা বাঘের বায়না দিয়াছিলাম। সে সাতটা বাঘের বেশী দিতে পারে নাই। ঐ সাতটার একটুকুও আমি খাই নাই। সবই তোরা খাইয়াছিস্। এখন একটা রোগা বাঘ দেখিয়া খাব খাব করিতেছিস্? আর বানর তোকেই বা কি বলিব? তোকে ২১টা বাঘের বায়না দিয়াছিলাম; তুই সাতটী মাত্র বাঘ দিয়াছিস্, আর পারিস নাই; এক্ষণে একটা রোগা বাঘ আনিতেছিস্; তাও লেজে বেঁধে আন্‌তে লজ্জা বোধ করিতেছিস্ না? ধিক তোকে; তুই নিকটে আয়, তোকে খণ্ড খণ্ড করি।" ব্যাঘ্র শৃগালীর কথা সত্য মনে করিয়া লাফাইয়া পলাইতে লাগিল। ব্যাঘ্রের লেজে আবদ্ধ থাকায় বানর পুনঃ পুনঃ উঠিতে ও পড়িতে লাগিল এবং সেই আঘাতে বানর পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। শৃগালী তথায় নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিল এবং শাবকগুলি কিছু বড় হইলে তাহাদিগকে লইয়া নিজালয়ে গমন করিল।

ভগবৎ কর্ম্ম করিয়া শুক্ল দাগ অর্জ্জন করিবার জন্যই জীবের ভবে আসা। পূর্ব্বকালে নাইট উপাধিধারী বীর নিজ বীরত্ব দেখাইয়া পরোপকারের জন্য

বাহির হইতেন। বর্ত্তমান সময়ে স্কাউট প্রণালী ভগবৎ কর্ম্মের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। অনেকেই মনে করেন "পরোপকার করিতে গেলে অর্থের প্রয়োজন; আমার অর্থ নাই, সুতরাং পরোপকার করিব কি করিয়া?" এরূপ ধারণা ভ্রম।

"কায়েন মনসা বাচা"

অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে পরোপকারই শ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্মযজ্ঞের উপর কোনও যজ্ঞ নাই। পারিশ্রমিক না লইয়া অশিক্ষিত ভ্রাতৃবৃন্দের নৈতিক উন্নতি সাধন করা কত বড় মহৎ কার্য্য! এখন আর এ প্রথা নাই। যে ব্যক্তি চুক্তি করিয়া গীতা পাঠ করিবেন, তাঁহার পাঠ শ্রবণের যোগ্য নহে। পাঠ সমাপনান্তে ভক্ত শ্রোতৃবর্গ ভক্তি ও শক্তি অনুসারে যাহা দিবে, পাঠককে তাহা সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে।

রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালীন এক নকুল যজ্ঞের সমস্ত কক্ষ ভ্রমণ করিয়া বলিতেছিল "এ যজ্ঞ যজ্ঞই নহে।" ইহার দক্ষিণ অংশ সুবর্ণের। রাজা ইহা জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ কৃষ্ণ, আমি এত বড় যজ্ঞ করিলাম, অথচ সামান্য নকুল এরূপ কথা বলিতেছে কেন?" তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "ভাল, নকুলকেই জিজ্ঞাসা করুন।" নকুল বলিতে লাগিল "মহারাজ, এখান হইতে ১৮ ক্রোশ দূরে জয়নগর গ্রামে আমার জন্মস্থান। সেখানে এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ বাস করেন। উঞ্ছবৃত্তিতে সমস্ত বৎসর চলে না বলিয়া ব্রাহ্মণকে ভিক্ষাও করিতে হইত। তাঁহার সংসারে গৃহিণী, কন্যা, পুত্র ও পুত্রবধূ ছিল। চৈত্র মাসে একদিন ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থ বাহির হইয়াছিলেন। সেদিন তিনি অন্য কিছু পান নাই, কেবল কিছু শক্তু বা ছাতু পাইয়াছিলেন। সন্ধ্যার পরে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে ভিক্ষালব্ধ ছাতু শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া উহা শালপাতায়

পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিলেন। লবণ ও লঙ্কার সাহায্যে তাঁহারা স্ব স্ব ভাগ ভোজন করিতে যাইবেন এমন সময়ে এক অতিথি তাঁহাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ যথাসাধ্য ও যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলে অতিথি জানাইলেন তাঁহার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে। তখন ব্রাহ্মণের পরিজনের মধ্যে এক কোলাহল উপস্থিত হইল। প্রত্যেকেই নিজ ভাগ দিবার জন্য ব্যস্ত। অবশেষে ব্রাহ্মণ নিজ ভাগ অতিথিকে দিলেন। অতিথির তাহাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল না। গৃহিণী তাঁহার ভাগ দিলেন। তাহাতেও অতিথির ক্ষুধার শান্তি হয় নাই। ক্রমে কন্যা, পুত্র ও পুত্রবধূও নিজ নিজ ভাগ দিলেন। তাহাতে অতিথি সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিলেন। গৃহিণী উচ্ছিষ্ট পাতাগুলি আস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দিলেন। দৈবযোগে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। বায়ুবশে পত্রসংলগ্ন ছাতু আমার দক্ষিণ অংশে আসিয়া লাগিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ ঐ অংশ সুবর্ণ হইয়া গেল। বাম অংশে ছাতু পড়ে নাই, সুতরাং ঐ অংশ সুবর্ণ হয় নাই। ঐরূপ কদাকার হওয়ায় আমি বৈকুণ্ঠে গিয়া শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলাম "প্রভো, আমার দক্ষিণ অংশ কেনই বা সোণা হইয়া গেল, কবে বা কি করিলে বাম অংশও সোণা হইবে?" শ্রীভগবান বলিলেন "অতিথিকে ভোজন করাইবার জন্য ব্রাহ্মণের প্রত্যেক পরিজনকে ৪৮ ঘণ্টা ধরিয়া উপবাস করিতে হইয়াছিল; তথাপি কাহারও মনে হয় নাই অতিথি আসিয়া তাঁহার ভাগ খাইয়া ফেলায় তাঁহার অনশনে কষ্ট হইয়াছিল; বরং ভাগ্যে আর পাঁচ মিনিট পরে অর্থাৎ তাঁহাদের ভোজন শেষ হইয়া গেলে অতিথি আসিয়া উপস্থিত হন নাই এই চিন্তায় এবং কৃতজ্ঞতায় তাঁহারা সকলে আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই একাহারী অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা পরে প্রতি সন্ধ্যায় ইঁহারা ভোজন করেন। সেদিন ইঁহাদের আহার জুটিল না, আবার পরদিন সন্ধ্যায় ইঁহারা আহার করিতে পাইবেন। ৪৮ ঘণ্টা অনশনে থাকা বড় সহজ কথা নহে। জঠর জ্বালা কম জ্বালা নহে। এই নিমিত্ত এই ক্ষেত্রটী অতি

পবিত্র হইয়াছে এবং এই পবিত্র ক্ষেত্রের ছাতু তোমার দক্ষিণ অংশে লাগায় উহা সোণা হইয়াছে। এতাদৃশ পবিত্র ক্ষেত্রের হাওয়া যখন তোমার বাম অংশে লাগিবে তখন ঐ অংশও সোণা হইবে।” তা মহারাজ, আপনার বিরাট যজ্ঞক্ষেত্রের প্রত্যেক কক্ষে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু কই মহারাজ, আমার বাম দিক ত এখনও সোণা হইল না। অতএব আমার মতে সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের যজ্ঞের তুলনায় আপনার আড়ম্বরপূর্ণ রাজসূয় যজ্ঞ কিছুই নহে।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগের দ্বারা ব্রহ্মকে বা আত্মাকে জানা যাইতে পারে। জ্ঞান অসীম এবং ভক্তি বড়ই অস্ফুট। ভক্তকে ‘তৃণাদপি সুনীচেন’ ভাব ধারণ করিতে হইবে। অহং ভাব একেবারে ত্যাগ না করিলে ভক্ত হওয়া যায় না। পূর্ব্বকথিত বৃত্তস্থিত চিহ্নিত বিন্দুকেও ভুলিতে হইবে।

“সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” ইহা বড়ই কঠিন। ব্রজগোপীগণ ও প্রহ্লাদ ব্যতিরেকে আর কাহারও এভাব দেখা যায় না। কর্ম্মই সহজসাধ্য। সত্যকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করিয়া গেলে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা মোক্ষ অনিবার্য্য। তাহা হইলেই মানুষের সমস্ত দাগ বা পথ শুক্ল হইয়া যাইবে। শুক্লপথই অনাবৃত্তি এবং কৃষ্ণপথ পুনর্জ্জন্মের কারণ।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে কর্ম্মই মূল। কর্ম্মে সৃষ্টি, কর্ম্মে স্থিতি এবং কর্ম্মে লয়। এই কর্ম্মকে যিনি অবহেলা করিবেন, তাঁহার পতন অনিবার্য্য অর্থাৎ তাঁহার চির দুঃখ। যিনি সর্ব্বদা কর্ম্ম করিবেন, তিনি ভগবানের কৃপায় আনন্দের সহিত পেট পূরিয়া খাইতে পাইবেন।

“উদ্যোগিনাং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।”

এ হেন কর্ম্মকে ঘৃণা করা আদৌ উচিত নহে। কেহ ভাঁত রাধে, কেহ চামড়ার কাজ করে বা কেহ রিক্সা টানে বলিয়া তাঁহাদিগকে ঘৃণা করা উচিত নহে। তাঁহার ভিতর দেখিয়া তাঁহাকে বিচার করিতে হইবে। যদি তাঁহার

হৃদয় বা প্রাণ থাকে এবং তাঁহার ভিতর বাহির সমান থাকে বা তিনি সত্য বলিতে সাহসী হন, তবে তিনি যে জাতিই হউন না কেন বা তিনি যে কাজই করুন না কেন, তিনি মানব, তিনি প্রণম্য।

এক ব্রাহ্মণ অনশনে কষ্ট পাইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার মানসে দড়ি লইয়া এক বৃক্ষে উঠিয়াছিল। সেই বৃক্ষে এক ব্রহ্মদৈত্য ছিল। সে বলিল "ব্রাহ্মণ, কি কারণে এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতে যাইতেছ?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "জঠর জ্বালা আর সহ্য করিতে পারি না। কেহ ভিক্ষা দিতে চায় না অধিকন্তু গৃহস্থ তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দেয়।" ব্রহ্মদৈত্য বলিল "তুমি লোক চিন না। গরুর নিকটে ভিক্ষা চাহিলে কি ভিক্ষা পাইবে? মানুষের নিকটে ভিক্ষা চাহিলে তবে ত ভিক্ষা পাইবে। আমি তোমাকে একটী কাচ দিতেছি। ইহা চোখের সামনে ধরিলেই তুমি মানুষ চিনিতে পারিবে। যাহাকে মানুষ দেখাইবে তাহার নিকটে ভিক্ষা চাহিও ভিক্ষা পাইবে।" ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদৈত্যপ্রদত্ত কাচটী লইয়া হাটে গেলেন। তিনি নগ্নচক্ষে হাটে অগণিত মানুষ দেখিতে পাইলেন। পরে কাচটী চোখের সম্মুখে ধরিতেই তিনি দেখিলেন বানর, কুকুর, শৃগাল, গরু প্রভৃতি দ্বারা হাট পরিপূর্ণ। অল্পক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন এক বটবৃক্ষের তলায় একটী মনুষ্য জুতা সেলাই করিতেছে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে কতকগুলি ইতর প্রাণী বসিয়া আছে। তিনি পূর্ব্বোক্ত মুচির নিকটে উপস্থিত হইলে মুচি বলিল "কি ব্রাহ্মণঠাকুর জুতা চাই নাকি?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "না।" মুচি বলিল "তবে কি প্রয়োজন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "প্রয়োজন আছে পরে বলিব; তুমি আগে খরিদ্দার বিদায় কর।" মুচি সেদিন আড়াই টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিল। সকল খরিদ্দার চলিয়া গেলে ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমি তিন দিন অভুক্ত আছি; তোমার নিকটে ভিক্ষা চাহিতেছি; আমাকে খাইতে দাও।" মুচি বলিল "আমি মুচি, আমি তোমাকে খাইতে দিব?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "ভাই আমি জানিতে পারিয়াছি এই হাটের

মধ্যে তুমিই মানুষ আছ; তোমাকে ভিক্ষা দিতেই হইবে।" মুচি ব্রাহ্মণকে দুইটী টাকা দিয়া বলিল "বুঝিলাম তুমি আমা অপেক্ষাও দীন। যাহা হউক আমি দেখিতেছি তোমার জন্য কিছু করিতে পারি কিনা।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাজা মুচিকে একজোড়া জুতা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিলেন। রাজা অতীব সন্তুষ্ট হইয়া মুচিকে পাঁচটী টাকা দিয়া বলিলেন "কি বক্‌সিস্‌ চাও।" মুচি বলিল "হুজুর, আমি নিজের জন্য কিছুই চাই না। আমি ভগবানের কৃপায় পরিশ্রম করিতে পারি, সুতরাং আমার কোনও অভাব নাই। এক গরীব ব্রাহ্মণকে এক পাত অন্ন দেন ইহাই আমার প্রার্থনা।" রাজা বলিলেন "পরশু ব্রাহ্মণকে লইয়া আসিবে।" মুচি ব্রাহ্মণের বাড়ী গিয়া তাহাকে দুইটী টাকা দিয়া বলিল "উহাতে নূতন বস্ত্র ক্রয় করিবেন এবং আমি কল্য আপনাকে একজোড়া জুতা প্রস্তুত করিয়া দিব। পরশু আমি আপনাকে রাজার নিকটে লইয়া যাইব। আপনার একটী চাকুরীর জন্য রাজাকে অনুরোধ করিয়াছি।" যথাসময়ে মুচি ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল "মহারাজ, সেদিন এই গরীব ব্রাহ্মণের জন্য আপনাকে বলিয়াছিলাম।" রাজা ব্রাহ্মণকে বলিলেন "ব্রাহ্মণ লেখা পড়া জান?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "লেখা পড়া শিখি নাই।" রাজা বলিলেন "তবে তুমি কি কাজ করিতে পারিবে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমি নগদ্রীর কাজ করিতে পারিব।" রাজা ব্রাহ্মণকে মাসিক ১০ টাকা মাহিনার নগদ্রীর কাজে নিযুক্ত করিলেন।

একদিন মন্ত্রী যথাসময়ে রাজকাছারীতে উপস্থিত না হইলে রাজা বলিলেন "ব্রাহ্মণ, মন্ত্রীকে ডাকিয়া আন।" ব্রাহ্মণ মন্ত্রীকে ডাকিতে গেলেন। হঠাৎ ব্রাহ্মণের মনে হইল দেখিতে হইবে মন্ত্রী কি প্রকারের জীব। তখন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদৈত্যপ্রদত্ত কাচখানি নিজের চোখের সাম্‌নে ধরিলেন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন

এক বানর লাফাইয়া লাফাইয়া আসিতেছে। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন "আসুন বানর-মহাশয়, রাজা আপনাকে ডাকিতেছেন।" এরূপ সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী যারপরনাই বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া মনে ভাবিলেন রাজার নিকটে বসিয়া থাকায় বেটা ব্রাহ্মণের স্পর্দ্ধা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে; আচ্ছা ব্রাহ্মণকে শিক্ষা দিতে হইবে।

অন্য একদিন সেনাপতিকে ডাকিতে গিয়া ব্রাহ্মণ কাচের সাহায্যে দেখিলেন এক গরু বসিয়া আছে। তাঁহাকে গরু-মহাশয় বলাতে তাঁহারও রাগ হইল। সদাগরকে শৃগাল দেখাইতেছিল এবং কোটালকে কুকুর দেখাইতেছিল। তাঁহাদিগকেও ঐরূপ ভাষা প্রয়োগ করাতে, তাঁহাদিগেরও ক্রোধ হইয়াছিল। পরে সকল কর্ম্মচারীই ধর্ম্মঘট করিয়া ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে দরখাস্ত দিয়া কার্য্যে ইস্তফা দিলেন। রাজা ব্রাহ্মণকে বলিলেন "ব্রাহ্মণ, তুমি মন্ত্রীকে বানর বলিয়াছ?" এই সময়ে এক রাজপুত্র একটী বানর লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ রাজাকে বলিলেন "হুজুর আপনি এই জীবটীকে কি বলিবেন?" রাজা বলিলেন "বানর বলিব।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "তা'হলে মহারাজ, আমার দোষ কি?" এই বলিয়া তিনি রাজাকে সেই কাচটী দিয়া তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে দেখিতে অনুরোধ করিলেন।

রাজা কাচের সাহায্যে মন্ত্রীকে বানর, সেনাপতিকে গরু, সদাগরকে শৃগাল ও কোটালকে কুকুর দেখিতে পাইলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন "তুমি এ কাচ কোথায় পাইলে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "মহারাজ, এক ব্রহ্মদৈত্য আমাকে এই কাচ দিয়াছে।" রাজা কাচ দিয়া ব্রাহ্মণকে দেখিয়া লইলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে মানুষ দেখিলেন। তখন তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন "ব্রাহ্মণ, কাচ দিয়া আমাকে দেখ দেখি।" ব্রাহ্মণ রাজাকে মানুষ দেখিয়াছিলেন। তখন রাজা বলিলেন "ব্রাহ্মণ, তবে আমার উপায় কি হইবে? এই সব লোক লইয়া

রাজ্য চালাইলে ন্যায়বিচার ত হইবে না।" রাজা সকল কর্ম্মচারীকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া কাচের সাহায্যে প্রকৃত মানুষ বাছিয়া লইয়া নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন।

এই কাচ হইতেছে প্রকৃত জ্ঞান বা সূক্ষ্মবুদ্ধি। হাত পা থাকিলেই মানুষ হয় না। অনেক লোককে বানর, গরু, শৃগাল, কুকুর প্রভৃতির বৃত্তি অবলম্বন করিতে দেখা যায়। হৃদয় লইয়া সত্য পথ অবলম্বন না করিলে মানুষ হওয়া যায় না।

মুচি মুচি হইলে কি হয়, তাহার হৃদয় ছিল। সে প্রকৃত পক্ষে ভগবৎ কর্ম্ম করিত।

কর্ম্মকে অবহেলা করায় ভারতবাসীর বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের লোকের বর্ত্তমান অধঃপতন ঘটিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ শিক্ষিতা এবং নানারূপ শিল্পকার্য্য করিয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের লোকদিগের স্ত্রীশিক্ষার উপর তাদৃশী আস্থা নাই। এজন্য পশ্চিমবঙ্গের স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই অশিক্ষিতা। গৃহকর্ম্মের পরে তাঁহারা যেটুকু সময় পান, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, বাজে গল্প, তাসখেলা ইত্যাদি দ্বারা অতিবাহিত করিয়া থাকেন। একজন পুরুষ মানুষ হয়ত উপার্জ্জন করিয়া মাসিক ৫০৲ হইতে ১০০৲ টাকা আনয়ন করেন। তাঁহার এই উপার্জ্জনের উপর হয়ত তিনটী বিধবা, দুইটী সধবা স্ত্রীলোক, দুইটী অপগণ্ড ভাগিনেয় ও কয়েকটী বালকবালিকার ভরণপোষণ নির্ভর করে। অতগুলি লোকের ভরণপোষণ করিতে হয় বলিয়া ভদ্রলোকটীকে অতি কষ্টে থাকিতে হয়, তাহাতে তাঁহার অল্পায়ু হইবারই কথা। সহসা ঐ উপার্জ্জনকারী পুরুষের মৃত্যু হইলে নির্ভরকারিগণের কিরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয় তাহা পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা অবিদিত নহেন। ভিক্ষা দ্বারা মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়াছে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। পরিজনদিগের কেহ রন্ধন করিয়া, কেহ বা দাসীবৃত্তি

অবলম্বন করিয়া, আবার কেহ বা ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা উদরের জ্বালা নিবারণ করেন। পূর্ব্ববঙ্গের স্ত্রীলোকদিগের মত কর্ম্ম করিতে শিখিলে তাঁহাদিগকে ঐরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয় না। যুবকগণ বি-এ, এম্-এ, পাশ করিয়া 'হা চাকুরি হা চাকুরি' করিবেন সেও ভাল, তবু হাঁটুর কাপড় তুলিয়া দাঁড়ী পাল্লা ধরিয়া ব্যবসাকার্য্য করিতে ইচ্ছুক নহেন, কারণ তাঁহারা এরূপ কর্ম্মকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন।

গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। যাঁহারা কর্ম্মকে অবহেলা করিয়া জ্ঞান ও ভক্তি সাধনের পথ ভাবিয়া তপস্যা করিতে বনে যান তাঁহারা 'ইতোনষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ' হন অর্থাৎ তাঁহাদের একূল ওকূল দুকূল নষ্ট হয়। তাঁহারা ভগবানের বিরুদ্ধে পাপাচরণ করেন, কারণ প্রজাসৃষ্টিই ভগবানের ইচ্ছা। যদি সকলেই সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যায়, তবে ভগবানের রাজ্য চলিবে কি করিয়া? গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া সত্যকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করিয়া গেলে মানব চিরশান্তি প্রাপ্ত হয়। ভগবৎ কর্ম্ম করিলে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্যদেশের লোকেরা মহাকর্ম্মী এজন্য তাঁহাদের এত উন্নতি। ইঁহারা কখনও আলস্যে সময় অতিবাহিত করেন না।

ইঁহাদের কর্ম্মের মূলে ধর্ম্ম আছে। যে কর্ম্মের মূলে ধর্ম্ম থাকে না, তাহা কখনও সুসিদ্ধ হইতে পারে না বা টিকিতে পারে না।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটনের অধীনে একটী কর্ম্ম খালি হইয়াছিল। দুইজন প্রার্থীর মধ্যে একজন তাঁহার বন্ধুপুত্র। সকলেই মনে করিয়াছিলেন তাঁহার বন্ধুপুত্রই ঐ পদ প্রাপ্ত হইবেন; কিন্তু তাহা হয় নাই। ওয়াশিংটন অপর লোককে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছি আমেরিকায় বাস্ গাড়ীতে টিকিট বিক্রয়কারী (conductor) থাকে না। যাত্রিগণ বাসগাড়ীস্থিত বাক্সে ভাড়া ফেলিয়া দিয়া নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়া যান। যদিও তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে

রাজসকর্ত্তা, ভারতবাসিগণ তামসকর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছেন। পঞ্চাশ টাকা মূল্যের একখণ্ড জমির জন্য দুইজন ব্রাহ্মণ আদালতের আশ্রয় লইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন এরূপ ঘটনা আমরা চোখের সাম্‌নে অহরহঃ দেখিতেছি।

ব্রাহ্মণগণ উচ্চশ্রেণীর; তাঁহাদিগের নীচতা অমার্জ্জনীয়। অগ্রে তমোভাব হইতে রজোভাবে উঠিতে হইবে, তবে রজোভাব হইতে সত্ত্বভাবে উঠিতে পারা যাইবে। ব্রাহ্মণগণ সমাজের নেতা। তাঁহারা অগ্রে স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া নিজদিগকে উন্নত করিতে না পারিলে সাধারণ লোকদিগকে কে উন্নত করিবে? দেশের লোকের সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতির দিকে দৃষ্টি নাই। রাজভাষা ত শিখিতেই হইবে, অধিকন্তু সংস্কৃত শিক্ষার অধিক উন্নতি আবশ্যক। অধিকসংখ্যক টোলের প্রতিষ্ঠান আবশ্যক এবং অধ্যাপক মহাশয়গণ যাহাতে অধিক পরিমাণে বৃত্তি পান তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

স্বীকার করিতে হইবে বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণগণ অধঃপতিত হইয়াছেন এবং এই অজুহাতে সাধারণ লোকের তাঁহাদিগের উপর শ্রদ্ধা একেবারে কমিয়া গিয়াছে। অনেকেরই ধারণা পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপর ছিলেন, কেননা তাঁহারা নিজেদের বেলায় দশ দিন অশৌচকাল রাখিয়া অপরের (শূদ্রদিগের) জন্য ত্রিশ দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং শূদ্রদিগকে বেদে অধিকার দেন নাই।

অশৌচ শব্দে শারীরিক অশুদ্ধতা অপেক্ষা মানসিক অশুদ্ধতাই বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তি প্রকৃত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আবার অশৌচ কোথায়? তিনি সর্ব্বদাই এবং সর্ব্ব অবস্থায় শুচি বা পবিত্র। সুতরাং তাঁহার পক্ষে অশৌচকাল শূন্য দিন। যিনি তাঁহা অপেক্ষা কিছু কম জ্ঞানী ছিলেন, তাঁহার অশৌচকাল এক দিন; ইত্যাদি। আবার যে ব্রাহ্মণ মাত্র জাতিতে ব্রাহ্মণ, যাঁহার জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না, শূদ্রের ন্যায় তাঁহার অশৌচকাল ত্রিশ দিন। এইরূপে গড় করিয়া সাধারণ

ব্রাহ্মণের অশৌচকাল দশ দিন দাঁড়াইয়াছিল। তখনকার শূদ্রদিগের অশৌচকাল ত্রিশ দিন থাকায় তাঁহারা অসন্তুষ্ট ছিলেন এমন কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না, বরং তাঁহারা তজ্জন্য ব্রাহ্মণদিগের নিকটে কৃতজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। যাঁহার জ্ঞান যত উচ্চে ছিল, তাঁহার অশৌচকাল তত কম ছিল। তখনকার শূদ্রেরা অশিক্ষিতই ছিলেন। আবার যাঁহার জ্ঞান যত বেশী, তাঁহার মোহ তত কম। অশৌচের চিহ্ন মৃত ব্যক্তির স্মরণের জন্যই বলিয়া মনে হয় জ্ঞানী ব্যক্তিরা মৃতের জন্য শোক করিতে ইচ্ছা করেন না। স্ত্রীলোক ও অশিক্ষিত ব্যক্তিরাই মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে বহু দিন ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকে। এইজন্যই শূদ্রদিগের জন্য ত্রিশ দিন অশৌচকাল নির্দ্দিষ্ট ছিল।

শূদ্রদিগকে বেদে অধিকার দেওয়া হয় নাই, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক্ষণে সদাশয় ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধিকারে মুদ্রিত পুস্তকের অভাব নাই। ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক মনুষ্যই বেদ, গীতা ইত্যাদি পাঠ করিতে পারেন; কিন্তু কই কয়জন শূদ্র বেদপাঠ করিতে অগ্রসর হন? এখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হস্তে বেদ, গীতা ইত্যাদির কিরূপ কদর হইয়াছে তাহা জানিতে কাহারও বাকি নাই। তখনকার অশিক্ষিত শূদ্রদিগকে বেদ ইত্যাদিতে অধিকার দিলে, উহাদের কদর কিরূপ হইত, তাহা অনুমান করা শক্ত নহে। গুহক চণ্ডালকেও রামচন্দ্র কোল দিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও রাজর্ষি হইয়াছিলেন। গুণে বড় হওয়া প্রথা তখনও ছিল। ব্রাহ্মণগণ রাজাদিগের গুরু ছিলেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অশেষ প্রকার সুখভোগ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা আতপ চাউল ও কাঁচকলা খাইয়া আমাদিগকে যে দান দিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগের নিকটে আমাদিগের চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। চিকিৎসা শাস্ত্র বলুন, জ্যোতিষ শাস্ত্র বলুন, আর যে শাস্ত্রই বলুন, সবই ব্রাহ্মণদিগের দান। তাঁহাদিগের দান

লইয়া অনেকেই নাড়াচাড়া করিয়া খাইতেছেন। এহেন নিঃস্বার্থ ব্রাহ্মণদিগের উপর অযথা দোষারোপ করা গুরুদ্রোহিতার লক্ষণ।

যদি প্রত্যেক গৃহে প্রত্যেক নরনারী গীতার প্রকৃত চর্চ্চা করেন, তবেই বর্ত্তমান দারুণ তমোভাব অপসারিত হইবে, নচেৎ নহে। বহু ধাক্কা খাইয়াও হিন্দুধর্ম্ম এখনও টিকিয়া আছে। যেহেতু ইহা সনাতন ধর্ম্ম, ইহা চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সত্যযুগ হইতে বরাবরই দেখা গিয়াছে অধর্ম্মের সহিত যুদ্ধে ধর্ম্মেরই জয় হইয়াছে। এই ঘোর কলিকালে অজ্ঞানের সহিত যুদ্ধে জ্ঞানের জয়লাভ হইবে না কি? গীতার দুর্য্যোধন অজ্ঞান এবং যুধিষ্ঠির জ্ঞান। প্রত্যেক মনুষ্যের শরীরের ভিতরে প্রতি মুহূর্ত্তে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইতেছে; আত্মার সহিত ষড়রিপুর বা ভগবানের সহিত শয়তানের যুদ্ধ হইতেছে।

মনে রাখিতে হইবে খাওয়া এবং শোওয়াই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

"কেবা আমি কিবা কার্য্য করিতে সাধন,
কোথা হ'তে ক'রেছি এভবে আগমন,
ভুলেছি মায়াতে নাহি স্মরণ,
এ ঘোর পাথারে কিসে তরিব না জানি।
বৃথা জনম ল'য়ে এলাম ধরণী॥

মনুষ্য পদবাচ্য প্রত্যেক জীবকে ইহা চিন্তা করিতে হইবে। চিহ্নিত বিন্দুকে আঁকড়াইতে গেলেই জীব সম্মুখে ঘোর অন্ধকার দেখিতে পাইবে এবং উদ্দেশ্য হইতে বহু পশ্চাতে হটিয়া আসিবে। বিষ্ণুপ্রীতির জন্য বা জনসাধারণের জন্য কর্ম্ম করিলেই অর্থাৎ চিহ্নিত বিন্দু ব্যতীত বৃত্তমধ্যস্থিত বিন্দুসকলকে ধরিয়া থাকিলেই হৃদয় প্রশস্ত হইবে, তমের নাশ হইবে;

তমের নাশ হইলেই আত্মার প্রকাশ হইবে। তবেই জীব নিজ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে। নিজ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেই জীব উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবে।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" গীতার এই শক্তি হৃদয়ে উদ্দীপিত হইলে অর্থাৎ সত্যকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, মারামারি, কাটাকাটি, হিংসাবৃত্তি ইত্যাদি কিছুই থাকিবে না; জীব বিমল আনন্দ অনুভব করিতে থাকিবে এবং তাহা হইলে ভিতরে শান্তি আসিয়া জুটিবে। ভিতরে শান্তি না হইলে বাহিরে শান্তির আশা করা বৃথা।

অতএব কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করতঃ বিশুদ্ধ ভগবৎ কর্ম্ম করিয়া গেলে ভিতরেও শান্তি এবং বাহিরেও শান্তি। তখন সর্ব্বত্র শান্তি। তখনই হৃদয়ে রাম-রাজত্ব অনুভূত হইবে। শুধু চীৎকারে কি হইবে?

প্রথম অধ্যায়।

অর্জ্জুন বিষাদযোগ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন "হে সঞ্জয়! পবিত্র কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধনাদি আমার পুত্রগণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণ যুদ্ধার্থ মিলিত হইয়া কি করিতে আরম্ভ করিল, তাহা আমাকে বল।"

তদুত্তরে সঞ্জয় ব্যাসপ্রসাদে দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন "হে মহারাজ, কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্য যুদ্ধার্থ মিলিতে হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবপক্ষীয় রথী, সৈন্য ও সারথি অবলোকন করিয়া ভীত হইয়া অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্যের সমীপে গমন করতঃ তাঁহাকে বলিলেন 'হে গুরো, আমার বোধ হইতেছে ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত আমাদিগের সেনা প্রচুর নহে, কিন্তু মধ্যম পাণ্ডব ভীম কর্ত্তৃক রক্ষিত বিপক্ষ সেনা প্রচুর, সুতরাং আমাদিগের সৈন্য বিপক্ষ সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব ব্যূহপ্রবেশ পথে আপনারা স্ব স্ব বিভাগানুসারে অবস্থান করতঃ প্রধান সেনাপতি ভীষ্মকেই রক্ষা করুন; কারণ সেনাপতির নিধনে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।'

দুর্য্যোধনের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম মনে করিলেন দুর্য্যোধন তাঁহাকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া ভীত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার ভীতি অপনোদন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। তাহা শুনিয়া উভয় পক্ষের মহারথিগণ আপন আপনি শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তখন সহসা রণভেরী বাজিয়া উঠিল। সেই তুমুল ধ্বনি আকাশ ও পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া দুর্য্যোধনাদির হৃদয়ে আঘাত করিল।"

দুর্য্যোধনের পক্ষে ভীষ্মপ্রমুখ মহারথী এবং এগার অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল এবং যুধিষ্ঠিরের পক্ষে কয়েকজন রথী ও মাত্র সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল, তাহাতে কৌরব পক্ষেরই জয়ের সম্ভাবনা অধিক থাকা সত্ত্বেও দুর্য্যোধনের ভীতির কারণ হইতেছে এই যে, দুর্য্যোধন প্রথমেই অর্জ্জুনের রথে দর্পহারী ও পাপনিধনকারী শ্রীকৃষ্ণের মোহনমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তাঁহার মাতৃবাক্য মনে পড়িয়া গেল। তিনি মনে মনে জানিতেন তিনি যুধিষ্ঠিরকে অন্যায়পূর্ব্বক" সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, সুতরাং তিনি মহাপাপী। তিনি মাতৃমুখে শুনিয়াছিলেন যেখানে কৃষ্ণ সেইখানেই ধর্ম্ম এবং যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়। সেই ধর্ম্মের আধার শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুনের রথে সারথিরূপে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। নচেৎ তিনি অর্জ্জুনকে বা পাণ্ডব-সৈন্যগণকে গ্রাহ্যই করিতেন না। কৃষ্ণদর্শনে দুর্য্যোধনের হৃদয়ে অশান্তি বা উদ্বেগের আবির্ভাব হইয়াছিল।

"অর্জ্জুনের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ এমত স্থানে রথ স্থাপন করিলেন যেথান হইতে অর্জ্জুন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। তিনি কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য্য এবং আত্মীয় কুটুম্বদিগকে তাঁহার বিপক্ষে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান দেখিয়া অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে নিম্নলিখিত কারণে তাঁহার এ যুদ্ধ করা উচিত নহে :—

(১) পিতামহ ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণ ও আত্মীয়গণকে নিহত করিলে তাঁহার পাপ হইবে।

(২) যুদ্ধে জয়ে বা পরাজয়ে তাঁহার কোনও লাভ হইবে না।

(৩) যুদ্ধে প্রাণিহত্যা করিয়া তিনি সুখী হইতে পারিবেন না।

তিনি প্রতিহিংসাবিমুখ নিরস্ত্র থাকিলে যদি সশস্ত্র কৌরবগণ তাঁহাকে নিহত করেন, তাহাও তাঁহার পক্ষে অধিকতর হিতকর হইবে। এইরূপ বলিয়া অর্জ্জুন শোকে একান্ত আকুল হইয়া শর ও ধনুঃ পরিত্যাগপূর্ব্বক রথের উপরে বসিয়া পড়িলেন।"

প্রকৃতপক্ষে প্রথম অধ্যায় গীতার অন্তর্ভুক্ত নহে কারণ ইহাতে শ্রীভগবানের উক্তি নাই। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক হইতেই শ্রীভগবানের উক্তি আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না। প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুন যুদ্ধ না করিবার কারণ দর্শাইলেন, তাহাতে অর্জ্জুন যাহার জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহার জন্য শোক করিতেছিলেন; ইহাই গীতার ভিত্তি বা বীজ হইল। এইজন্য প্রথম অধ্যায়কে গীতার অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিলে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে হইবে, কারণ শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ ভগবান্।

অনেকের মতে ধৃতরাষ্ট্রের 'ধর্ম্মক্ষেত্র' শব্দটী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে স্থানের প্রভাবে দুর্য্যোধনের মতি পরিবর্ত্তিত হইল কিনা ইহা অবগত হওয়া; কিন্তু ইহাও দেখিতে হইবে ক্ষত্রিয় সম্মুখসমরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে পাপ অর্জ্জন করে। দুর্য্যোধন পাপপঙ্কে নিমগ্ন হউক এইরূপ ইচ্ছা ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় জ্ঞানী-ব্যক্তির মনে উদিত হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।

আবার কেহ কেহ বলেন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধই হয় নাই বা যদিও হইয়া থাকে এই যুদ্ধস্থলে শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘ বক্তৃতা দিতেছিলেন ইহা সম্ভবপর নহে। গীতা কেবল রূপক মাত্র। যুদ্ধ হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন এই সংবাদ আমরা পাইয়াছি। যুদ্ধ হয় নাই বা যুদ্ধস্থলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দেন নাই ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক। যুদ্ধ হইয়াছিল এবং যুদ্ধস্থলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন ইহা স্বীকার করিয়া তাহা হইতে সাধারণ সারমর্ম্ম সংগ্রহ করিতে দোষ কি? একেবারে উড়াইয়া দেওয়া

কষ্টকল্পনা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? সাদাসিদে ভাব গ্রহণ করাই ভাল। জল মানে জলই ভাল, জল মানে সলিল করিতে গেলেই জটিল হইয়া যায়।

গীতার শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা, অর্জ্জুন আত্মা; যুধিষ্ঠির জ্ঞান, দুর্য্যোধন অজ্ঞান। পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ, আত্মা অল্পজ্ঞ। কুরুক্ষেত্র মনুষ্যের কর্ম্মক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে সর্ব্বদা কুরু কুরু অর্থাৎ কর্ম্ম বা ভগবৎ কর্ম্ম করিতে হইবে। তাহা হইলে অজ্ঞান প্রাধান্যলাভ করিতে পাইবে না। আমাদের শরীরের মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে যুদ্ধ হইতেছে। এই যুদ্ধে জয়ী হইতে গেলে (কৃষ্ণের বা) সদ্ গুরুর আবশ্যক। পেশাদার গুরু থাকা আর না থাকা দুইই সমান।

ছচল্লিশ শ্লোকে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাংখ্যযোগ।

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মরিয়া যাইবেন এই আশঙ্কায় অর্জ্জুন অধীর হইয়াছেন, সুতরাং তিনি প্রথমেই অর্জ্জুনকে জ্ঞানী হইবার জন্য উপদেশ দিবার চেষ্টা করিলেন, কারণ জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও কি জীবিত, কি মৃত কাহারও জন্য শোক করেন না বা শোক করিতে ইচ্ছা করেন না। অর্জ্জুন এখানে জীবিতের জন্য শোক করিতেছেন কারণ ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি এখনও মরেন নাই।

রাম-নির্ব্বাসন সংবাদ শ্রবণে কৌশল্যা বিলাপ করিতে করিতে শেষে দশরথকে বলিয়াছিলেন—

"ন খল্বহং নৃপ ত্বাং দোষতো
ব্রবীম্যনীশ্বরং হীশ্বরদেশিতং জগৎ।
দশা কৃতান্তোপতেহয় মাবিলা
কিমত্রং শক্যং পুরুষেণ চেষ্টিতুম্॥" রামায়ণং

হে মহারাজ রাম-নির্ব্বাসন নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে আমি আপনাকে তিরস্কার করিয়া বহু অকথ্য বাক্য বলিয়াছি, তাহাতে আমার অপরাধই হইয়াছে। ওরূপ তিরস্কার করা ঠিক হয় নাই, কারণ নশ্বর পৃথিবীর সমস্ত ব্যাপারই ভগবান কর্ত্তৃক শাসিত ও নির্দ্দিষ্ট। ভবিষ্যৎ নিয়তি কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত বলিয়া ইহা অত্যন্ত অস্বচ্ছ, সুতরাং দুজ্ঞেয়। এখানে মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে সমর্থ হয় না। রাম-নির্ব্বাসন নিয়তি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং হইবেই হইবে, কৈকেয়ী কেবল উপলক্ষ মাত্র।

মৃতের জন্যও শোক করা উচিত নহে। কারণ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে, নচেৎ ধরণীতে জীবের স্থান কুলাইবে না।

"যাবজ্জননং তাবন্মরণং,
তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতর-দোষঃ,
কথমিহ মানব, তব সন্তোষঃ॥" মোহমুদ্গরং।

জন্ম হইলেই মৃত্যু এবং মৃত্যু হইলেই জন্ম; ইহা ত প্রকৃতির চিরন্তনী প্রথা। যাহা অবশ্যম্ভাবী এবং যাহার উপরে মনুষ্যের হাত নাই, তাহার জন্য আবার শোক কি? চিরমঙ্গলময় ভগবান সবই ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন; জীবসকল উপলক্ষ মাত্র।

কোনও টোলে কতিপয় ছাত্র অধ্যয়ন করিত। কিছুদিন পরে একটী নূতন ছাত্র আসিয়া ভর্ত্তি হইল। ইহার স্বভাব অতি নির্ম্মল এবং ছাত্রটী অতিশয় মেধাবী। কেহই এই ছাত্রটীকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। দৈবযোগে অধ্যাপক মহাশয়ের একমাত্র পুত্র বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিল। অধ্যাপক মহাশয়, তদীয় পত্নী এবং নূতন ছাত্রটী ব্যতীত অপর ছাত্রগণ অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। নূতন ছাত্রটীকে নির্ব্বিকারচিত্ত দেখিয়া ছাত্রগণ বলিল "পাঠে ভাল হইলে কি হয়, তোমার হৃদয় নাই, নচেৎ অধ্যাপক মহাশয়ের পুত্রের অকালমৃত্যুতে সকলেরই শোক হইল আর তোমার হইল না?" ছাত্রটী উত্তর করিল "আমাদিগের পরিবারস্থ কোনও লোকই মৃতের জন্য শোক করেন না, সুতরাং আমিও করি না।" অধ্যাপক মহাশয়ের কর্ণে ইহা আসিলে, তিনি কৌতূহলপরবশ হইয়া ছাত্রের পিতার নাম, ধাম ইত্যাদি জানিয়া লইয়া সন্ধ্যার পরে ছাত্রটীর পিতার বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহার পিতাকে বলিলেন "মহাশয়, আমি বিদেশী লোক, অনুগ্রহ করিয়া যদি

একটু স্থান দেন।" ছাত্রের পিতা তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার নাম ও ধাম শুধাইলেন। অধ্যাপক-মহাশয় ধাম বলিলেন কিন্তু প্রকৃত নাম গোপন করিয়া অন্য নামে পরিচিত হইলেন। তাহাতে গৃহস্থ বলিলেন "আপনি আপনার গ্রামের অমুক অধ্যাপক ও তাঁহার অমুক ছাত্রকে (তাঁহার পুত্র) চিনেন?" অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন "অধ্যাপক মহাশয়ের টোলের নিকটেই আমার বাড়ী; সুতরাং আমি আপনার পুত্রকে এবং তাহার অধ্যাপক মহাশয়কে চিনি, কিন্তু বলিতে কি মহাশয়, আপনার পুত্র গতকল্য বিসূচিকা রোগে মারা গিয়াছে। আহা ছেলেটী অত্যন্ত মেধাবী ও সর্ব্বজনপ্রিয় ছিল!"

ছাত্রের পিতা পুত্রের মৃত্যুসংবাদে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা বলিলেন "মহাশয়, সন্ধ্যার সময়ে পক্ষিগণ পিতাপুত্র ইত্যাদি সম্বন্ধ ভাবিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করতঃ বৃক্ষে রাত্রি যাপন করে, প্রভাত হইলে সমস্ত সম্বন্ধ বা মায়া ত্যাগ করতঃ আহারের অন্বেষণে কে কোথায় প্রস্থান করে। পক্ষিগণের পক্ষে বার ঘণ্টা যাহা মানুষের পক্ষে এক জন্ম তাহা। আমাদের পিতাপুত্র সম্বন্ধও ঐরূপ অলীক! তাহাদের মহাপ্রস্থানে আবার শোক কি?"

রাত্রি এক প্রহরের সময়ে ছাত্রের মাতা খাবার দিতে আসিলে অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন "আপনি কি ছাত্রটীর গর্ভধারিণী?" মাতা বলিলেন "হাঁ বাছা।" অধ্যাপক মহাশয় পুনরায় বলিলেন "আহা ছাত্রটীর কি সুন্দর স্বভাব ছিল! আপনার শোক করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।" মাতা উদ্বেগের কোনও চিহ্ন না দেখাইলে, অধ্যাপক মহাশয় কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতা বলিলেন "বাছা, মনে কর আমার বাক্সে পাঁচ শত টাকা আছে। আমার এক প্রতিবেশী এক শত টাকা গচ্ছিত রাখিয়া বলিলেন তিনি এক মাস পরে

তীর্থযাত্রা হইতে ফিরিয়া টাকাটী লইবেন। আমি আমার পাঁচ শত টাকার সহিত ঐ এক শত টাকা সেই বাক্সে রাখিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রতিবেশী তাঁহার টাকাটী চাহিলেন। এক্ষণে সমস্ত অর্থাৎ ছয় শত টাকাই আমার ভাবিয়া যদি আমি প্রতিবেশীকে তাঁহার গচ্ছিত এক শত টাকা দিতে সামান্য মাত্র কুণ্ঠিত হই, তবে আমার তুল্য নির্ব্বোধ আর কে থাকিবে? পুত্র বলুন, আর কন্যা বলুন, সবই ভগবানের দান, ধর্ম্মের জন্য। ভগবান নিজে পালন করেন না। পিতা ও মাতার বক্ষে মায়া দিয়া তিনি জীবগণকে পালন করাইয়া লন। এইগুলি তাঁহার গচ্ছিত দ্রব্য; যখন তাঁহার প্রয়োজন হয় তখন তিনি ঐগুলি ফিরাইয়া লন। জীব কর্ম্মবশে নির্দ্দিষ্ট দিবসে নিজালয়ে গমন করিবে। অতএব যাহার উপরে আমাদিগের হাত নাই, তাহার অবর্ত্তমানে আবার শোক কি?"

ভোজন শেষ হইলে ছাত্রের বনিতা উচ্ছিষ্ট পাত্র লইয়া যাইতেছে দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় তাহাকে বলিলেন "তুমিই বোধ হয় মৃতছাত্রটীর সহধর্ম্মিণী? আহা ভগবান তোমাকে এই নবীন বয়সে বৈধব্য যন্ত্রণা দিলেন! ইহাতে আমি ভগবানকে মঙ্গলময় ও ন্যায়বিচারক কি করিয়া বলিতে পারি?" ছাত্রের স্ত্রীও শোকের কোনও চিহ্ন দেখাইল না দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন "তোমাদের সকলেরই হৃদয় পাষাণ দেখিতেছি; তুমিও কোনও শোক দেখাইলে না? তোমার জীবন আর কিসের জন্য?" তাহাতে রমণী বলিল "মহাশয়, আপনার সহিত আমি একমত হইতে পারিলাম না। অহরহঃ দেখা যায় নদীতে প্রবল বন্যা আসিলে নদীতীরস্থ কাষ্ঠসমূহ নদীতে ভাসিতে থাকে। দৈবযোগে দুইখানি কাষ্ঠ সংযুক্ত হইয়া একত্রীভূত হইয়া দুই ক্রোশ ভাসিয়া গিয়া পরে স্রোতের প্রভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথকভাবে চলিয়া যায়। হয়ত ঐ কাষ্ঠ দুইখানি আবার মহাসাগরে মিলিত হইবে। আমার স্বামী ও আমি প্রথমে

অপরিচিত ছিলাম, পরে বিবাহযোগে বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়া উভয়ে একত্র কিছুদিন বসবাস করিলাম, পরে তিনি অগ্রে মহাপ্রস্থান করিলেন। আমিও আবার যথা সময়ে তাঁহার সহিত মিলিত হইব; ইহাতে আবার শোক কি?"

অধ্যাপক মহাশয় তখন মনে মনে ভাবিলেন "ইহারা শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, আমি এত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার কিঞ্চিৎও লাভ করিতে পারি নাই।" গৃহত্যাগ করিবার সময়ে অধ্যাপক-মহাশয় ছাত্রের পিতাকে বলিলেন "মহাশয়, প্রকৃতপক্ষে আমারই পুত্র মরিয়াছে; আপনার পুত্র মরে নাই। আমিই আপনার পুত্রের অধ্যাপক।"

কোনও জ্ঞানী ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র মারা যাওয়ায় ব্রাহ্মণী শোকে অধীরা হইয়া পড়িয়াছিলেন; ব্রাহ্মণ কিন্তু নির্ব্বিকার ছিলেন। ব্রাহ্মণী তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "আপনার হৃদয় নিশ্চয় পাষাণে নির্ম্মিত নচেৎ একমাত্র পুত্র মারা গেল আর আপনি দুঃখ বোধ করিলেন না।" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন "দেখ, গত রাত্রিতে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম আমার সাত পুত্র হইয়াছে; তাহারা কেহ জজ, কেহ ম্যাজিষ্ট্রেট, কেহ মুন্সিফ, কেহ উকিল, কেহ ডাক্তার, কেহ ইঞ্জিনিয়ার, কেহ ডেপুটী হইয়াছে। আমি উহাদিগকে লইয়া যারপর নাই আনন্দে ভাসিতেছিলাম; প্রভাত হওয়ায় আমি তাহাদিগকে আর দেখিতে পাইতেছি না, অথচ আমি তাহাদের প্রত্যেকের আকৃতি বেশ স্মরণ করিতে পারিতেছি। এক্ষণে আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না সেই এক পুত্রের জন্য শোক করিব, না এই সাত পুত্রের জন্য শোক করিব। আমি কল্য যে কাজ করিয়াছি বা যে সুখ অনুভব করিয়াছি, অদ্য তাহা আমার নিকটে স্বপ্ন বোধ হয়। সত্য মিথ্যা সবই মনের কাছে।"

"The mind is its own place and in itself
Can make a hell heaven and a heav'n hell." Milton.

এই জন্যই পণ্ডিতগণ মৃতের জন্য শোক করেন না।

"নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্।
আপৎকালে ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ ॥"

সঞ্জয় বলিয়া গেলেন "শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন—অর্জ্জুন যে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মরিয়া যাইবেন ভাবিয়া শোক করিতেছেন, ইহা অতীব ভ্রমাত্মক, কারণ কেহ কখনও মরে নাই বা মরিবে না। শৈশব, যৌবন ও জরা দেহের বিভিন্ন অবস্থামাত্র; মৃত্যুও সেইরূপ দেহের একটী অবস্থা মাত্র। রাম বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনাবস্থায় উপনীত হইলে, রামের দেহের কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটে কিন্তু রাম যাহা ছিল তাহাই রহিল; আবার বৃদ্ধাবস্থায় উপস্থিত হইলেও সে সেই রামই রহিল, পরে রামের মৃত্যু হইলে তাহার দেহ নড়েনা এইমাত্র কিন্তু রাম রামই রহিল, অর্থাৎ দেহের মৃত্যু হইল বটে কিন্তু যাহার দেহ বা দেহীর কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটিল না। দেহ মরিতে পারে কিন্তু দেহী আদৌ মরে না।

বস্ত্র জীর্ণ হইলে আমরা যেমন সেখানি পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করি, এক মুহূর্ত্তের জন্যও উলঙ্গ থাকি না, সেইরূপ দেহ জীর্ণ বা অকর্ম্মণ্য হইয়া গেলে, দেহী সেই জীর্ণ দেহটী ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্য একটী নূতন ও কর্ম্মঠ দেহ ধারণ করিয়া থাকে। এইরূপে দেহী ক্রমাগত দেহ পরিবর্ত্তন করিতেছে।

মৃত্যু অর্থে যদি নাশ হয়, তবে দেহেরই বা মৃত্যু কোথায়? এক কলসী জলে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। সাধারণ লোকে জলের নাশ হইল মনে করে; যদি ঐ বাষ্প ধরিয়া রাখা যায় এবং বাষ্পের

চারিদিকে বরফ ধরা যায়, তবে বাষ্প গলিয়া পুনরায় জলে পরিণত হয়। তাহা হইলে জলের নাশ ত হইল না। জল হইতে বাষ্প এবং বাষ্প হইতে পুনরায় জল হইল। জলে উত্তাপ প্রয়োগ করাতে জলের মাত্র বিকার বা অবস্থান্তর পরিলক্ষিত হইল। কেহ কোনও পদার্থ সৃজন করিতে পারে না আবার ধ্বংস করিতে পারে না। সৃষ্টির আদিতে যাহা ছিল এখনও তাহা আছে এবং ধ্বংসের পরেও তাহাই থাকিবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং ধ্বংসের পরে সেগুলি বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে এই মাত্র। দেহের যে অবস্থায় দেহী থাকে সেই অবস্থার বিকার হয় মাত্র। আত্মা দেহত্যাগ করিলে দেহ ক্ষিত্যপ্‌তেজঃ-মরুৎব্যোমে মিশিয়া যায়। দেহের বিকার ঘটে কিন্তু দেহীর বিন্দুমাত্র বিকার ঘটে না।

দেহী আদৌ মরে না; এই দেহী বা আত্মা উৎপত্তিনাশহীন এবং সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন। কেহই ইঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। শস্ত্রসকল ইঁহাকে ছেদন করিতে, অগ্নি ইঁহাকে দহন করিতে, জল ইঁহাকে ভিজাইতে, বায়ু ইঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল ও অনাদি। ব্রহ্মের ন্যায় ইনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের, মনের এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর।

অতএব অর্জ্জুনের ভীষ্মদ্রোণাদির কেন, কোনও প্রাণীরই জন্য অনুশোচনা করা উচিত নহে। ভূতগণ আদিতে অব্যক্ত ছিল, মধ্যাবস্থায় ব্যক্ত থাকে আবার নিধনেও অব্যক্ত থাকিবে। প্রকৃতি যেমন সৃষ্টির পূর্ব্বে ও ধ্বংসের পরে অনুদ্দাম অবস্থায় থাকে, সৃষ্টির আদি হইতে ধ্বংস পর্য্যন্ত শৃঙ্খলাবস্থায় থাকিয়া কার্য্য করে, জীবগণও সেইরূপ জন্মের পূর্ব্বে ও মৃত্যুর পরে অপ্রকাশিত থাকে এবং জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রকাশিত থাকে অর্থাৎ পরস্পরের সহিত পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন করে। এই সম্বন্ধ ক্ষণস্থায়ী, অতএব অলীক। সুতরাং কেহ কাহারও জন্য শোক বা বিলাপ করিবে না।

যেহেতু অর্জ্জুনের জাতিধর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম উভয়ই যুদ্ধ করা, যুদ্ধ না করিলে তাঁহার পাপ হইবে এবং করিলে পুণ্য হইবে। যুদ্ধে জয়লাভ করিলে তিনি (বা তাঁহার অগ্রজ) রাজ্যলাভ করিবেন এবং পরাজয় হইলে বা নিধনপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্বর্গলাভ হইবে। ধর্ম্ম্যযুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়েরাই লাভ করিয়া থাকেন। অর্জ্জুন ঈদৃশ ধর্ম্ম্যযুদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া ভাগ্যবান বা সুখী হইবেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের যুদ্ধ না করিবার তিনটী কারণ খণ্ডাইয়া দিলেন।

পাছে অর্জ্জুনের ইহাতেও জ্ঞান না হয় এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া সাধারণভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, অর্জ্জুন যে কৃপাপরবশ হইয়া যুদ্ধ করিবেন না, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণ তাহা না ভাবিয়া তিনি ভয়ে যুদ্ধ করিতেছেন না এই ভাব লইয়া তাঁহার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া তাঁহার প্রতি অনেক অকথ্য বা কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। অতএব সব দিক দিয়া দেখিতে গেলে অর্জ্জুনের যুদ্ধ করা একান্ত কর্ত্তব্য, শ্রীকৃষ্ণ ইহাই প্রতিপন্ন করিলেন।

পরে অর্জ্জুন আত্মা বা আত্মজ্ঞানের বিষয় জানিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"জ্ঞানিগণ কোনও কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া ভগবৎকর্ম্ম বা কর্ত্তব্যবোধে কার্য্য করিয়া থাকেন, কারণ ফলকামনা করিয়া কার্য্য করিলে মনে উদ্বেগ জন্মে, উদ্বেগই অশান্তি বা পাপের কারণ এবং পাপমনে কার্য্য করিলে কার্য্যসিদ্ধির বিঘ্ন ঘটে; অধিকন্তু ফল মানুষের আয়ত্তে থাকে না।"

জ্ঞান, ভক্তি, তর্ক ও মীমাংসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রক্রিয়াগুলি মানুষের আয়ত্তে থাকে কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মীমাংসা হইয়া গিয়া প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ হইল ফল দৃষ্ট হউক আর অদৃষ্ট হউক আপনা আপনি (automatically) আসিবে, তখন

আর উহা তাহার হাতে থাকে না। চিহ্নিত বিন্দু ব্যতিরেকে যে সব কর্ম্ম সেইগুলি ভগবৎকর্ম্ম বা নিষ্কাম কর্ম্ম।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "এই নিষ্কাম কর্ম্ম কখনও বিফল হয় না এবং ইহাতে প্রত্যবায়ও নাই।"

আমি হয়ত পুত্রকামনায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করিলাম ; ইহাতে দেবতাদিগের প্রীত্যর্থ বহুবিধ দ্রব্যের ও মন্ত্রের প্রয়োজন হয়। যদি কোনও কারণে দ্রব্যের ত্রুটি হয় কিম্বা (যাহা সাধারণতঃ হয়) পুরোহিতের দোষে মন্ত্রোচ্চারণ অশুদ্ধ হয়, তবে কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবে, পুত্র জন্মিবে না, সুতরাং সকাম কর্ম্মটী বিফল হইল এবং এই কর্ম্মে প্রত্যবায় ঘটিল কিন্তু বিষ্ণুপ্রীতির নিমিত্ত কর্ম্ম করিলে দেবতারা রুষ্ট হন না, এবং মনে কোনরূপ উদ্বেগও আসে না।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "আসক্তি রহিত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে কর্ম্মটী সুসিদ্ধ হয় ও সেই কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া মানুষ কর্ম্মবন্ধ বা পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। তবে সকাম কর্ম্ম আরম্ভ না করিয়া কেহ একেবারে নিষ্কাম করিতে শিখে না। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ দুঃখ উপস্থিত হইলে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন না এবং ফলের জন্য আকাঙ্ক্ষাও করে না। তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে মমতাশূন্য এবং শুভ বা অশুভ প্রাপ্তিতে তাঁহাদের সন্তোষ বা দ্বেষ হয় না। তাঁহারা অপ্রাপ্তব্য বিষয় পাইবার বাঞ্ছা করেন না এবং ভগবৎ কৃপায় যাহা লব্ধ হইয়াছে তাহা ত্যাগ করেন না বা তাহার রক্ষার জন্য যত্নবান হন না। কূর্ম্ম যেমন হস্তপদাদি নিজ অঙ্গের মধ্যে সঙ্কুচিত রাখে, তাঁহারা সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বদা প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাতেই লীন রাখিয়া চিত্তের বিক্ষোভ-সম্পাদক ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হন না বরং ইন্দ্রিয়গণকে নিজ বশে রাখেন। যেমন বহু নদনদী জলে সম্যক্‌রূপে পরিপূর্ণ হইয়াও সমুদ্র স্ফীত না হইয়া স্বীয়

মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত রাখে অর্থাৎ তাহাতেই অন্যান্য জলধারা প্রবেশ করে বা বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ বিষয়ভোগে বিকারহীন ব্যক্তিতে কামনাসকল প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যায় পরন্তু তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি মোক্ষের অধিকারী। ভোগবিলাসী ব্যক্তি কখনও শান্তি বা মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয় না। বিষয় ধ্যান করিতে করিতে পুরুষের সেই সকল বিষয়ে আসক্তি জন্মে; আসক্তি হইতে কামনা উদ্ভূত হয়। কামনা কোনও রূপে প্রতিহত হইলে বিরক্তি বা ক্রোধ জন্মে। ক্রোধ হইতে মোহ বা বিবেক-শূন্যতা, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম, স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিভ্রংশ জন্মে এবং বুদ্ধিনাশ হইলে মনুষ্য নষ্ট হয় অর্থাৎ জীবন্মৃত অবস্থায় মৃততুল্য হইয়া কালাতিপাত করে। বুধগণ বিষয়ভোগকারী ইন্দ্রিয়গণকে আত্মবশীভূত করিয়া ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা বিষয়সকল ভোগ করিয়াও আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন; আত্মপ্রসাদ জন্মিলে সকল দুঃখের অবসান বা শান্তি আসে।"

আত্মার পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিলে শুক্লদাগ অর্জ্জিত হয় এবং শুক্ল দাগই বা শুক্ল-পথই চিরশান্তি বা মোক্ষের উপায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "অজ্ঞানাচ্ছন্ন প্রাণিগণের পক্ষে যাহা নিদ্রাস্বরূপ, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতে জাগরিত থাকেন এবং সাধারণ ব্যক্তিরা যাহাতে জাগরিত থাকে আত্মদর্শী মনুষ্যের পক্ষে তাহা নিশাস্বরূপ।"

সম্পূর্ণ তমোভাবাপন্ন অজ্ঞ ব্যক্তি সত্বভাবাপন্ন জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক তত্ত্বজ্ঞান প্রদত্ত হইলেও উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া চিরতিমিরে থাকিয়া নেত্র মুদ্রিত করিয়া থাকিতে ভালবাসে কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদাই তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু হইয়া চক্ষু প্রসারিত করিয়া থাকেন; সুতরাং একের পক্ষে যাহা নিশা, অপরের পক্ষে তাহা দিবা। আবার অজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই অস্থায়ী বিষয়ভোগে লালায়িত থাকে কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি অসার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে অনাসক্ত থাকিয়া সর্ব্বদা ভগবৎপদে

(বা আত্মাতে) মতি রাখিয়া অপার তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন, সুতরাং একের পক্ষে যাহা দিবা, অপরের পক্ষে তাহা নিশা।

"আত্মজ্ঞান লাভ হইলে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ সংসারে মোহপ্রাপ্ত হন না এবং মৃত্যুকালেও এই অবস্থায় থাকিয়া ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন।"

আত্মদর্শন হইলে অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে না; জীবের সমস্ত পথই শুক্ল হইয়া যায়; তখন জীব দেহান্তে ব্রহ্মে সাযুজ্য লাভ করে।

বায়াত্তর শ্লোকে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ম্মযোগ।

সঞ্জয় বলিয়া গেলেন "যখন কর্ম্ম করিতেই হইবে, তখন অর্জ্জুন সাংখ্য বা আত্মযোগ ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ জানিতে চাহিলে

"সাংখ্যযোগ বা আত্মযোগ বা আত্মজ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ প্রকৃতপক্ষে পৃথক নহে, কারণ জ্ঞান ভিন্ন কর্ম্ম হয় না এবং কর্ম্ম না করিলে জ্ঞানের উন্নতি হয় না। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম ওতপ্রেতভাবে জড়িত। এজগতে সকলেই অধিকারবিশেষে কার্য্য করিয়া থাকে। কর্ম্মযোগ নিম্নস্তরের এবং আত্মযোগ উচ্চস্তরের। কর্ম্মযোগে অধিকার না হইলে আত্মযোগে অধিকার জন্মে না। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে না শিখিলে আত্মজ্ঞান আসে না; আবার সকাম কর্ম্ম আরম্ভ না করিয়া কেহ একেবারে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কেবল সন্ন্যাসেই বা কর্ম্মত্যাগেই সিদ্ধিলাভ বা মোক্ষ হয় না। প্রকৃত কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব, কারণ কোন অবস্থায়ই জ্ঞানী বা অজ্ঞ কোন ব্যক্তিই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। রাগ দ্বেষাদি প্রকৃতিজাত গুণসকল সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম্ম করাইয়া থাকে। দেখা যায় অনেকে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল স্মরণ করিয়া থাকেন। ইঁহারা ভণ্ড নামে অভিহিত। কিন্তু যিনি মন দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ দ্বারা কর্ম্ম করেন, সেই ফলকামনাবিরহিত ব্যক্তিই প্রশংসাযোগ্য। বিষ্ণুপ্রীতির নিমিত্ত বা জনসাধারণের নিমিত্ত কর্ম্মই কর্ম্ম, ইহাতে

পুনর্জন্ম হয় না ; অন্য কর্ম্মসকল পুনর্জন্ম বা বন্ধনের কারণ হয়। কর্ম্মই সকলের মূল। কর্ম্মে সৃষ্টি, কর্ম্মে স্থিতি ও কর্ম্মে লয়। কর্ম্ম দ্বারাই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উচ্ছৃঙ্খল অণুরাশি হইতে বর্ত্তমান শৃঙ্খলাবস্থায় পরিণত হইয়াছে। পরব্রহ্ম (ভগবান কৃষ্ণ) হইতে ব্রহ্ম প্রকাশিত হইয়াছে, ব্রহ্ম হইতে বেদ উদ্ভূত হইয়াছে, বেদ হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি এবং অন্ন হইতে শুক্রশোণিতরূপে পরিণত হইয়া প্রাণিগণ উৎপন্ন হয় ; সুতরাং প্রাণিগণের মূলে পরব্রহ্ম আছেন। প্রত্যেক মনুষ্যপদবাচ্য ব্যক্তিরই এই প্রবর্ত্তিত চক্রের অনুবর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য। সমস্ত পদার্থই ভগবান সৃজন করিয়াছেন ; সুতরাং যাবতীয় পদার্থই ভগবানের। যে ব্যক্তি ভগবানকে (বা দেবতাদিগকে) খাদ্যদ্রব্য নিবেদন না করিয়া ভোজন করে সেই চৌর। ফলকামনা না করিয়া কর্ম্ম করিলে বা জনসাধারণের হিতার্থে কর্ম্ম করিয়া গেলে পুরুষ মোক্ষলাভ করিতে পারে।

কর্ম্ম তিন প্রকার—কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম। কর্ম্ম অর্থে সুকর্ম্ম বা ভগবৎকর্ম্ম বুঝিতে হইবে। কর্ম্মদ্বারাই মোক্ষলাভ করা যায়। জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্ম দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। মানুষ রাগদ্বেষাদি বা কামাদি ষড়রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া বিকর্ম্ম করিয়া ফেলে ; যেহেতু বিকর্ম্মই মোক্ষের অন্তরায়, ষড়রিপু মুমুক্ষুর একান্ত বিরোধী। এই ষড়রিপুই মোক্ষলাভের উপায় জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে ধূম দ্বারা অগ্নির ন্যায় সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া মানুষকে পশুবৎ করিয়া রাখে। দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা। অতএব মোক্ষলাভ করিতে গেলে প্রথমেই ষড়রিপুকে জয় করিতে হইবে, ষড়রিপু জয় করিতে হইলে আত্মা কি জানিতে হইবে বা আত্মদর্শনের প্রয়োজন। সুখী হইতে হইলে বা চিরশান্তি প্রাপ্ত হইতে হইলে

অর্জ্জুনের বুদ্ধির অতীত আত্মাকে অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। যে মুহূর্ত্তে অর্জ্জুন আত্মাকে অবগত হইবেন সেই মুহূর্ত্তেই অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না; কারণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ অধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের যুদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এযুদ্ধে ফল কি হইবে তাহা চিন্তা করা অর্জ্জুনের উচিত নহে।”

ভৃগুমুনি ভরদ্বাজকে ভারতবর্ষ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন “কর্ম্মভূমিরিয়ম্” অর্থাৎ ভারতবর্ষই কর্ম্ম করিবার বা নিষ্কাম ভগবৎকর্ম্ম করিবার স্থান। ভগবানে কর্ম্মফল উৎসর্গ করিয়া কার্য্য করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায় এবং ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ করিতে হইলে চিহ্নিত বিন্দুর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে এবং চিহ্নিত বিন্দুর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিতে হইলে কামাদি ষড়রিপুকে প্রথমেই জয় করিতে হইবে এবং কামাদি ষড়রিপুকে জয় করিতে হইলে সত্যকে আশ্রয় করিতে হইবে। কামাদি ষড়রিপু একমাত্র সত্যের নিকটে পরাজিত, আর কাহারও নিকটে নহে।

কর্ম্মকে অবহেলা করিলেই বিপদ। যে দেশ ও যে জাতি এই কর্ম্মে বা ভগবৎকর্ম্মে যত অগ্রসর, সেই দেশ ও সেই জাতির তত উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন রোম তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। জুলিয়ান সিজারের সময়ে বৃটেন্ প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া রোম করের ষষ্ঠাংশ স্বদেশে আনিত এবং অবশিষ্ট সেই সকল দেশের কল্যাণে ব্যয়িত হইত। ইহাই ছিল ভগবৎকর্ম্ম। তখন রোমের জয়ধ্বনিতে পৃথিবী কাঁপিত। পাঁচ শত বৎসর পরে উল্টা ব্যবস্থা হইল। রোম তখন বিলাসিতার ও স্বার্থপরতার চরম সীমায় উঠিয়াছিল। ভগবৎকর্ম্মে অবহেলা করায় রোম যে জাতি তাহার পদের যোগ্য ছিল না, সেই জাতির পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির কর্ম্মে যথেষ্ট উৎসাহ আছে। ইঁহাদের কর্ম্মের মূলে ধর্ম্ম আছে। তাই তাঁহারা সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। ইংরাজরাজের অধিকারে সূর্য্য অস্ত যায় না। কর্ম্মকে অবহেলা করায় ভারতবাসিগণের বর্ত্তমান দুরবস্থা। সাত্ত্বিকভাব অবলম্বন করিয়া যতদিন না তাঁহারা ভগবৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন, ততদিন তাঁহারা এই অবস্থায় থাকিবেন।

তেতাল্লিশ শ্লোকে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

জ্ঞানযোগ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"ইহজগতে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছুই নাই। জ্ঞান ভিন্ন কোন কর্ম্মই হইবার উপায় নাই। জ্ঞানের সাহায্যে কোন্‌টী সুকর্ম্ম আর কোন্‌টী কুকর্ম্ম তাহা জানিতে হইবে; পরে কর্ম্মযোগানুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যথাকালে সেই আত্মজ্ঞান স্বীয় অন্তঃকরণেই লাভ করিয়া থাকেন। গুরূপদেশ ভিন্ন কেবল পুস্তক পাঠে এই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় না। গুরু ভিন্ন সংশয় ছেদন কে করিবে? প্রণিপাত, প্রশ্ন ও যোগ দ্বারা গুরুকৃপা লাভ করা যায়।

যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসমূহ ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা সমুদায় কর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া যায়। জ্ঞানরূপ পোত দ্বারা মহাপাপী পাপরূপ সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে। জ্ঞানেতেই কর্ম্মের সমাপ্তি হয়।

ভগবৎকর্ম্ম বা নিষ্কাম কর্ম্মই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। ভগবানকে উপলব্ধি করিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন। সকাম বা নিষ্কাম যেভাবেই হউক যে ভগবানকে যেভাবে ভজনা করে, ভগবান তাহাকে সেই ভাবেই কৃপা করিয়া থাকেন। কর্ম্মফলপ্রার্থী ব্যক্তিগণ ভগবানকে ইন্দ্রাদি দেবতারূপে ভজনা করিয়া থাকে। অনেক সময়ে তাহারা ফল শীঘ্র শীঘ্র পাইয়া থাকে। ফল-কামনাশূন্য জ্ঞানিগণ ভগবানকেই ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ফল কিছু বিলম্বে পাইয়া থাকেন, কিন্তু পাইলে ফল চিরস্থায়ী হইয়া যায়। জ্ঞানের দ্বারাই কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগ হয়। অজ্ঞান জ্ঞানকে সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া রাখে

বলিয়া জীব অহরহঃ দুঃখ পায়। গুরুর কৃপায় জ্ঞান মার্জ্জিত হইয়া অধিকতর শাণিত হইলেই, অজ্ঞান অপসারিত হইয়া যায়, তখনই জীব অজ্ঞানকে ছেদন করিয়া স্বপ্রকাশ হইতে সমর্থ হয়। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি হৃদয়স্থিত অজ্ঞান-সম্ভূত সংশয়কে জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া যুদ্ধরূপ কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান কর অর্থাৎ তুমি যুদ্ধ কর বা যুদ্ধ করিব না একথাটী বলিও না।"

জ্ঞানের পরে অনুভূতি, তৎপরে তর্ক, তৎপরে মীমাংসা। এই শেষ প্রক্রিয়ায় জ্ঞান যাহা বলে মন তাহাই মানিয়া লইয়া হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সেইরূপ করিতে আদেশ প্রদান করে; তৎপরে বা শেষে ফল দৃষ্ট বা অদৃষ্ট আসিয়া জুটে।

পুস্তকে লিখিত 'কুহু' শব্দ পড়িয়া কোকিলের ন্যায় 'কুহু' ডাকা যায় না। হাতে কলমে শিখাইবার জন্য একজন লোকের আবশ্যক। যখন আমার 'কুহু' ডাকায় গাছের কোকিল সাড়া দিবে তখন বুঝিতে হইবে আমার 'কুহু' ডাক সাধা ঠিক হইয়াছে।

তেতাল্লিশ শ্লোকে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ।

সঞ্জয় কহিলেন "কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মে প্রবৃত্তি এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ ইহা অর্জ্জুন জানিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—"কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষদায়ক, পরন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কর্ম্মযোগই উৎকৃষ্টতর। বিষয়ভোগের স্পৃহা অন্তরে পোষণ করিয়া বহিরিন্দ্রিয়গুলি রুদ্ধ করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনি, যিনি অনুরাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক এবং ফলকামনা ত্যাগ করিয়া যজ্ঞার্থ বা ঈশ্বরারাধনার্থে কর্ম্ম করেন, যিনি বিশুদ্ধচিত্ত, সংযতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্ব-ভূতের আত্মা যাহার আত্মা, যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি করিয়াও 'ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্ত্তিত আছে, আমি কিছুই করি না' ইহা মনে করেন, যাঁহার বুদ্ধি ভগবানেই দৃঢ়সংলগ্ন, ভগবানই যাঁহার পরমা গতি, যিনি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে, গাভী, হস্তী ও কুকুরে সমদর্শী, যিনি ভগবানকেই যজ্ঞ ও তপস্যা সকলের ভোক্তা, সর্ব্বলোকের মহান্ ঈশ্বর এবং সর্ব্বজীবের নিরপেক্ষ সুহৃদ্ মনে করেন।" এবম্ভূত সন্ন্যাসী সর্ব্বদা জীবন্মুক্ত। কর্ম্মযোগ অভ্যাস না করিলে এবম্ভূত সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।

কামাদি ষড়রিপু জয় করিয়া যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই মোক্ষের অধিকারী।"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অভ্যাসযোগ।

সঞ্জয় কহিলেন "হে মহারাজ, অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতে লাগিলেন 'যিনি কর্ম্মফলের অপেক্ষা না করিয়া অবশ্যকর্ম্ম বা ভগবৎকর্ম্ম বলিয়া বিহিত কর্ম্ম করেন তিনি সন্ন্যাসীও বটেন এবং কর্ম্মযোগীও বটেন। ফলকামনা ত্যাগ না করিয়া যোগ অনুষ্ঠান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যোগী বা সন্ন্যাসী ষড়রিপুর পরামর্শমত কার্য্য করিয়া আত্মাকে কখনও অধঃপাতিত করেন না অর্থাৎ তিনি কখনও সত্য হইতে বিচলিত হয়েন না। তাঁহার নিকটে শীত ও গ্রীষ্ম, নীচ ও উচ্চ, সুখ ও দুঃখ, মান ও অপমান, লোষ্ট্র ও কাঞ্চন সমান। তাঁহার নিকটে সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষপাত্র, সাধু ও পাপিষ্ঠ এ সকলে প্রশংসনীয়।

যোগস্থ হইবার পূর্ব্বে যোগারূঢ় ব্যক্তি সর্ব্বদা নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া একাকী দেহ ও চিত্ত সংযত করিয়া আকাঙ্ক্ষা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক চঞ্চল মনকে স্থির করিবেন। তিনি পবিত্র স্থানে কুশের উপরে ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া মস্তক ও গ্রীবাদেশ সরল ও স্থির রাখিয়া স্বয়ং নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া এবং অন্যদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া প্রশান্ত ও নির্ভীক চিত্তে মনকে একাগ্র করিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য সংযত করিয়া ভগবচ্চিত্ত ও ভগবৎপরায়ণ হইয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করিবেন। তাঁহাকে নিয়মিত আহার ও বিহার করিতে হইবে এবং নিয়মিতরূপে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকিতে হইবে।

যখন চিত্ত বিশেষরূপে সংযত হইয়া আত্মাতে নিশ্চলভাবে অবস্থিত করে তখনই সর্ব্বপ্রকার কামনা হইতে নিস্পৃহ ব্যক্তিকে যোগসিদ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে এবং তখনই বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা আত্মদর্শন লাভ হইবে। আত্মদর্শন হইলে পার্থিব পদার্থে আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

যোগারূঢ় ব্যক্তি ভয় পাইলেই সর্ব্বনাশ! কারণ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য। তবে অভ্যাস ও বিষয়-বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত সংযত করিতে পারিলে এক জন্মে না হউক দুই চারি জন্মের চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে, কারণ তিনি পূর্ব্বদেহজাত জ্ঞান লাভ করায় তাহাই পরজন্মে মোক্ষ বিষয়ে অধিকতর অভ্যাস জন্মাইয়া দেয়।

যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এমন কি কর্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।"

সাতচল্লিশ শ্লোকে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ।

সঞ্জয় কহিলেন "অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন 'ভগবান কি জানিতে হইলে বিজ্ঞানের আবশ্যক। বিজ্ঞান বা ব্রহ্মানুভবের দ্বারা মানুষ জানিতে সমর্থ হয় যে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম্, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ভগবানের প্রকৃতি এই আট প্রকারে বিভক্ত। এই অষ্ট প্রকার প্রকৃতি নিকৃষ্ট। ইহা ব্যতীত ভগবানের অন্য এক প্রকার উৎকৃষ্ট জীবস্বরূপা জ্ঞানময়ী প্রকৃতি আছে যাহা এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে। ইহাই ব্রহ্ম; সমস্ত জীবই এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ভগবান প্রকৃতিসমন্বিত সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানে সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় গ্রথিত আছে। ভগবান সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন ভাবে অবস্থিত নহেন; কিন্তু সে সকল তাঁহাতে অবস্থিত। পণ্ডিতগণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাহায্যে এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব দ্বারা মোহিত না হইয়া মনশ্চক্ষু দ্বারা ত্রিগুণাতীত ও নির্ব্বিকার ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারেন। জ্ঞানপিপাসু না হইলে মানুষ ভগবৎ প্রেমে আকৃষ্ট হয় না।

রোগে অভিভূত, আত্মজ্ঞানেচ্ছু, অর্থকামী ও জ্ঞানপিপাসু এই চারি প্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তিরাই ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে ভগবানে নিষ্ঠাবান ও একমাত্র ভগবানে ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। ভগবান জ্ঞানীর অতি প্রিয় এবং জ্ঞানী ব্যক্তিও ভগবানের অতি প্রিয়।

অনেক ভক্ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন এবং কখন কখনও তাঁহাদিগের নিকট হইতে অভিপ্সীত ফল লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু ঐরূপ ফল বিনাশশীল অর্থাৎ অল্পক্ষণস্থায়ী। ভগবানের ভক্তগণ অবিনশ্বর ফল লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ পরমপদ প্রাপ্ত হন, যাহা হইতে মানুষকে আর ফিরিতে হয় না।

জরা, মরণ প্রভৃতি হইতে মুক্তিকামী ব্যক্তি ভগবানকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মকে, আত্মাকে এবং সরহস্য সমুদায় কর্ম্মকে জানিতে সমর্থ হন এবং মরণকালেও চিত্তের ব্যাকুলতা প্রযুক্ত ভগবানকে বিস্মৃত হন না।"

ভূমিকায় বলা হইয়াছে সাধারণ মনুষ্যের বিজ্ঞান কোনও কার্য্য করে না, তত্ত্বজিজ্ঞাসু বা ভগবৎপ্রাপ্তিকামী ব্যক্তিরই ইহা কার্য্য করিয়া থাকে এবং জ্ঞানকে সাহায্য করে। এই বিজ্ঞানকে বিবেক বলা যাইতে পারে। জ্ঞান ও বিজ্ঞান একত্র হইলেই মানুষ মোক্ষলাভ করে। মোক্ষের সহায় এই জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে অজ্ঞান আচ্ছন্ন করিয়া থাকে বা অজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান সুপ্ত অবস্থায় থাকে। জ্ঞান অজ্ঞানের নিকটে পরাজিত হইলে জ্ঞান, অজ্ঞান বা ষড়রিপুর পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় সুতরাং কৃষ্ণদাগের অর্জ্জন হয়।

ত্রিশ শ্লোকে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

অক্ষরব্রহ্মযোগ।

সঞ্জয় বলিয়া গেলেন "অর্জ্জুন ব্রহ্ম কি তাহা জানিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন 'যিনি পরম অক্ষর, যাঁহার কিছুতেই বিনাশ নাই, যিনি প্রকৃতির সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্তা, যিনি জ্ঞান ও শান্তির আধার, যিনি সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী বিরাট জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ তিনিই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকে জানিতে হইলে মানুষকে সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করিয়া এবং মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া ভ্রূদ্বয়মধ্যে প্রাণকে স্থাপন করিয়া আত্মাতে নিশ্চলভাবে অবস্থিত হইয়া 'ওঁ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভগবানকে চিন্তা করিতে হইবে। এই অবস্থায় যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। [এই ওঁ জপ করিতে করিতে সাধক শরীরাভ্যন্তরস্থিত ওঁ (কুলকুণ্ডলিনী) ধ্বনি শুনিতে পান]। মৃত্যুকালে যে ব্যক্তি যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, পরজন্মে সে সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়; সুতরাং যে ব্যক্তি ওঁ (ব্রহ্ম) মন্ত্র জপ করতঃ ব্রহ্ম চিন্তা করিতে করিতে তনুত্যাগ করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মপদই প্রাপ্ত হয় বা ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়।

মার্গ দুই প্রকার—শুক্ল ও কৃষ্ণ। শুক্লপথ দ্বারা জীব ব্রহ্মপদে লীন হইয়া পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে এবং জীবকে কৃষ্ণপথ দ্বারা পুনঃ পুনঃ জন্ম লইতে হয়'।" সৎকর্ম্ম দ্বারা উচ্চমনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করার নাম স্বর্গভোগ বা স্বর্গেবাস এবং নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহন করার নাম নরকভোগ। কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া জীব যখন এমন মনুষ্যদেহ ধারণ করিবে, যাহাতে একটীও কৃষ্ণদাগ থাকিবে না, তখনই তাহার শুক্লপথ হইবে। এই শুক্লপথই জীবের ব্রহ্মপদে লীন হইবার সহায়।

আটাইশ শ্লোকে অষ্ট অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"ভগবান অব্যক্তমূর্ত্তি; তিনি সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। সমস্ত ভূত তাঁহাতে অবস্থিত কিন্তু তিনি কিছুতেই অবস্থিত বা লিপ্ত নন। সর্ব্বত্রগামী ও মহাবেগবান বায়ু যেমন সতত আকাশে অবস্থিত বটে কিন্তু তাহাতে সংশ্লিষ্ট নহে সেইরূপ ভূতগণও ভগবানে অবস্থিত কিন্তু সংশ্লিষ্ট নহে। ভগবানের অধিষ্ঠানবশতঃ বা তাঁহার শক্তিপ্রয়োগে প্রকৃতি এই চরাচরের সহিত বিশ্ব-প্রসব করে এবং এইহেতুই জগৎ বারম্বার উৎপন্ন হইতেছে অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে।

বিফলকর্ম্মা, বৃথাজ্ঞানবিশিষ্ট ও বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণ প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে রাজসী ও তামসী ভাব প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের পরমতত্ত্ব অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার অস্তিত্বে ও বিচারে সন্দিহান হইয়া থাকে কিন্তু দৈবী-প্রকৃতিযুক্ত মহাত্মারা সত্ত্বভাবাপন্ন হওয়ায় গুরুকৃপাবলে সর্ব্বভূতের কারণ ও অবিনশ্বর ভগবানের পরমতত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন এবং কীর্ত্তন, প্রণাম, ভজনা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। কেহ বা অভেদজ্ঞানে (একত্বেন) কেহ বা দাস্যভাবে (পৃথকত্বেন) আবার কেহ বা রুদ্রাদি দেবতারূপে (বহুধা) তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন।

পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ হউক, ভক্ত ক্ষত্রিয় হউক, বৈশ্য হউক, শূদ্র হউক, হীন চণ্ডাল হউক আর স্ত্রীলোক হউক সকলেরই ভগবানের উপাসনা করিবার অধিকার আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে প্রশস্ত কর্ম্ম দ্বারা বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পারে।"

বৈকুণ্ঠ শব্দে এমন অবস্থা বুঝায় যাহাতে ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না। বিগতা অর্থাৎ নষ্টা কুণ্ঠা অর্থাৎ দ্বিধা যস্মিন্ বা যাহাতে ইতি বৈকুণ্ঠ। মানুষ যখন এমন অবস্থায় আসিয়া পড়ে যখন তাহার কোনরূপ ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না, তখনই সে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবার অধিকারী হইয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রথম শ্রেণীর ভক্তগণই (যাঁহারা নিজ আত্মা সর্ব্বভূতে দেখেন এবং সর্ব্বভূতের আত্মা নিজ আত্মাতে দেখেন) বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে সমর্থ হন।

চৌত্রিশ শ্লোকে নবম অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

দশম অধ্যায়।

বিভূতিযোগ।

সঞ্জয় বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গেলেন—'ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ এমন কি দেবগণও ভগবানের মহিমা অবগত নহেন। বুদ্ধি, জ্ঞান, অব্যাকুলতা, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, দুঃখ, সুখ, উৎপত্তি, নাশ, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ ও অযশ প্রাণিগণের এই সকল ভাব ভগবান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি, জনকাদি চারি মহর্ষি এবং চতুর্দ্দশ মনু ইঁহারা সকলেই ভগবানের প্রভাবসম্পন্ন এবং তাঁহারই ইচ্ছায় উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ভগবান সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত আত্মা, ভূতগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার।

তিনিই বিষ্ণু, তিনিই সূর্য্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র, তিনিই সামবেদ, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই মন এবং তিনিই চেতনা। তিনি শঙ্কর, তিনি কুবের, তিনি অগ্নি, তিনি সুমেরু, তিনি বৃহস্পতি, তিনি কার্ত্তিকেয়, তিনি সমুদ্র, তিনি ভৃগু, তিনি ওঁকার, তিনি জপযজ্ঞ, তিনি হিমালয়, তিনি অশ্বত্থবৃক্ষ, তিনি নারদ, তিনি চিত্ররথ, তিনি কপিল, তিনি বজ্র, তিনি মদন, তিনি বাসুকী, তিনি প্রহ্লাদ, তিনি কাল, তিনি সিংহ, তিনি গরুড়, তিনি পবন, তিনি রাম, তিনি মকর, তিনি গঙ্গা, তিনি গায়ত্রী, তিনি বসন্ত, তিনি বাসুদেব, তিনিই ধনঞ্জয় এবং তিনিই ব্যাস। তাঁহা ভিন্ন থাকিতে পারে জগতে এমন কিছু চর বা অচর ভূত নাই। এক কথায় ভগবান সমুদায় জগৎ একাংশে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছেন।"

বিয়াল্লিশ শ্লোকে দশম অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়।

বিশ্বরূপদর্শনযোগ।

সঞ্জয় কহিলেন—"শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুন দেখিলেন ভগবানের বিরাট ও ভীষণ মূর্ত্তির মুখের ভিতরে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৌরবপক্ষীয় নরপতি ও সৈন্যগণ প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মা আদি দেবগণ, সিদ্ধগণ, সর্পগণ এবং পৃথক পৃথক প্রাণিবিশেষ তাঁহার ভীষণ দেহে দৃষ্ট হইল। অসংখ্য বাহু, উদর, মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট ভগবানের অনন্তরূপ সর্ব্বত্রই বিরাজমান ছিল। অর্জ্জুন সেই ভীষণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া যারপর নাই ভীত হইয়া তাঁহার স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন এবং সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ মিনতি করিলেন। তখন সেই ভীষণ মূর্ত্তি প্রশান্ত কৃষ্ণমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া গেল দেখিয়া অর্জ্জুন আশ্বস্ত হইলেন।"

বস্তুতঃ এই মূর্ত্তি কাল, যেহেতু কালেই উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে। ইহাই দিব্যচক্ষু বা জ্ঞাননেত্রে সর্ব্বদা দেখা যায়। যাঁহারা ভগবানে নিত্য আত্মসমর্পণ করিয়া তদ্গতচিত্ত হয়েন, তাঁহারাই এই মূর্ত্তি দেখিয়া মুক্ত হয়েন।

পঞ্চান্ন শ্লোক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভক্তিযোগ।

সঞ্জয় কহিলেন "তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন 'যাঁহারা ভগবানে মন নিবেশিত করিয়া সর্ব্বদা তাঁহাতে যুক্ত থাকিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবানের সগুণ-রূপের (শ্রীকৃষ্ণের) উপাসনা করেন, তাঁহারা ভক্ত নামে অভিহিত হন। নির্গুণ ভগবানের উপাসনা অতীব ক্লেশকর ও প্রায় অসাধ্য।

অভ্যাসযোগ অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, আবার ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল ত্যাগকরতঃ ভগবদুপাসনা শ্রেষ্ঠ। এই কর্ম্মফল ত্যাগের পর শীঘ্রই শান্তিলাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত ও ভগবৎপরায়ণ হইয়া মৎকথিত অমৃতরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই ভক্তগণ ভগবানের অতীব প্রিয়'।"

চিহ্নিত বিন্দুটীও ভুলিতে পারিলে তবে ভক্ত হওয়া যায় অর্থাৎ যাহা কিছু থাকিবে সমস্তই ভগবানে অর্পণ করিয়া ভগবৎপরায়ণ হইয়া একান্ত তদ্‌গতচিত্ত হইয়া ভগবানের উপাসনা করার নাম ভক্তি। ভক্ত হওয়া সোজা কথা নহে। এই জন্য ভক্তিতে মুক্তি সুদুর্লভ। ভক্তকে 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাব ধারণ করিতে হইবে। সব ভুলা যায় কিন্তু নিজকে ভুলা যায় না। তিলক, মালা বা কৌপীণ ধারণ করিলেই ভক্ত হয় না। তবে এগুলিরও মূল্য একেবারে নাই তাহা নহে। সাধারণতঃ বাহ্যিক পবিত্র না হইলে আন্তরিক পবিত্রতা আসে না। তিলক, মালা ও হরিনামের ঝুলি বাহ্যিক পবিত্রতার লক্ষণ। আবার এগুলি ব্যবহার না করিলে আন্তরিক পবিত্রতা আসে না তাহা নহে। তুলসীর মালা পরিধান করিয়া বা তিলক ধারণ করিয়া বা হরিনামের ঝুলি গলায় বাঁধিয়া মিথ্যা কথা বলিতে নাই, বলিলে ঐগুলির অপমান করা হয় এবং দ্বিগুণ পাপ হয়।

বিশ শ্লোকে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ।

সঞ্জয় কহিলেন "অর্জ্জুন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন 'দেহকেই ক্ষেত্র বলে এবং যিনি দেহকে ক্ষেত্র বলিয়া জানেন তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। দেহে অনুপ্রবিষ্ট আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ। আবার পঞ্চভূত সমন্বিত প্রকৃতিও বিরাট ক্ষেত্র এবং বিরাটপুরুষ ভগবানই বিরাট ক্ষেত্রজ্ঞ।

আত্মশ্লাঘাহীনতা, অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, সর্ব্ববিধ শৌচ, সৎকার্য্যে দৃঢ়তা, আত্মনিগ্রহ, বিষয়বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিতে দুঃখ ও দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা, পুত্র, স্ত্রী, গৃহাদি পদার্থে অনাসক্তি, তাহাদের সুখদুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে না করা, ইষ্ট ও অনিষ্টলাভে সর্ব্বদা সমচিত্ততা, ভগবানে একান্ত ভক্তি, নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি, সাধারণ লোকের সহবাসে বিরাগ, অধ্যাত্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা এইগুলিকে জ্ঞান বলে এবং যাহা এগুলির বিপরীত তাহা অজ্ঞান বলিয়া গণনীয়। জ্ঞেয় বস্তু ব্রহ্ম। তিনি জীবগণের অন্তরে ও বাহিরে থাকেন। তিনি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বলিয়া অতি দুর্জ্ঞেয়। অজ্ঞদিগের সম্বন্ধে তিনি দূরস্থ এবং জ্ঞানিগণের সম্বন্ধে তিনি সন্নিহিত আছেন। তিনি কারণরূপে অবিভক্ত কিন্তু কার্য্যরূপে ভিন্নভাবে প্রতীয়মান। তাঁহার পা নাই, তিনি চলিতে পারেন, হাত না থাকিলেও তিনি গ্রহণ করেন, চক্ষু নাই তিনি দর্শন করিতে পারেন এবং কর্ণ না থাকিলেও তিনি শ্রবণ করিতে পারেন। অনাদি ও নিগুর্ণ বলিয়া তিনি অবিকারী এবং দেহস্থ (আত্মারূপে) হইয়াও তিনি কিছুই করেন না। সূর্য্য যেমন জগৎকে প্রকাশিত করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রী বা অপরাত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে (মহাভূতাদি প্রকৃতিকে) প্রকাশিত করিয়া থাকেন'।"

চৌত্রিশ শ্লোকে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গুণত্রয় বিভাগযোগ।

সঞ্জয় বলিয়া গেলেন "শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন 'প্রকৃতি ভগবানের গর্ভাধানের স্থান এবং তাহাতেই তিনি জগৎবিস্তারের হেতুভূত অতি সূক্ষ্ম বীজরূপ গর্ভের আধান করেন; তাহাতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়। প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ নির্ব্বিকার দেহীকে (আত্মাকে) দুঃখ মোহাদি দ্বারা দেহ মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে। ইহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল। ইহা প্রকাশ করে ও ইহা উপদ্রব শূন্য। উহা দেহীকে সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তি দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখে। রজোগুণ তৃষ্ণা ও আসক্তি হইতে জাত বলিয়া ইহা অনুরাগাত্মক। ইহা ক্রিয়া করে। অজ্ঞান হইতে তমোগুণ উদ্ভূত, সুতরাং ইহা সর্ব্বজীবের ভ্রান্তিজনক। উহা জীবকে অনবধানতা, অনুদ্যম ও অবসন্নতা দ্বারা আবদ্ধ রাখে।

সত্ত্বগুণ জীবকে সুখী করে, রজোগুণ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেয় এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রমাদে আবদ্ধ করে। সত্ত্বগুণের আধিক্যে জীবের মৃত্যু হইলে, তিনি দিব্য প্রকাশময় লোক প্রাপ্ত হন, রজোগুণের বৃদ্ধির সময়ে জীব দেহত্যাগ করিলে তাহার কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যলোকে জন্ম হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যু হইলে জীবের পশ্বাদি নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম হয়।

সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন, রজোগুণপ্রধান জনগণ মনুষ্যলোকে অবস্থান করেন এবং জঘন্যগুণ অর্থাৎ তমোগুণের বৃত্তিতে তমঃ-প্রধান ব্যক্তিগণ অধঃপথে গমন করে।

প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ এইগুলি স্বয়ং উদিত হইলে যিনি দ্বেষ করেন না এবং নিবৃত্তি থাকিলেও আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনিই গুণাতীত নামে খ্যাত'।"

সাতাইশ শ্লোকে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পুরুষোত্তমযোগ।

• সঞ্জয় বলিলেন "হে মহারাজ, অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন 'ভগবান সকল প্রাণীরই হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত আছেন। তিনি জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় এবং তিনিই জ্ঞানদাতা।

ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষর নামে দুইটী পুরুষ আছেন। সমুদায় ভূতগণ ক্ষর এবং যিনি কূটস্থ তিনি অক্ষর পুরুষ বলিয়া অভিহিত। আর এতদুভয় হইতেও শ্রেষ্ঠ অন্য এক উত্তম পুরুষ আছেন, তিনি পরমাত্মা বা ভগবান নামে খ্যাত। তিনি অব্যয়, ঈশ্বর ও নির্ব্বিকার এবং লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া হইয়া সকলকে পালন করিতেছেন'।"

বিশ শ্লোকে পঞ্চদশ সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

দৈবাসুর বিভাগযোগ।

সঞ্জয় বলিয়া গেলেন "হে মহারাজ, অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'দৈবীসম্পদ্ যথা—ভয়শূন্যতা, চিত্তপ্রসন্নতা, জ্ঞাননিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ, তপ, আত্মধ্যান, ব্রহ্মযজ্ঞ, সরলতা; অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দাবর্জ্জন, সর্ব্বভূতে দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুতা, লজ্জা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ ও অনভিমানিতা ইহারা মোক্ষের হেতু। আসুরী সম্পদ্ যথা—দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি—ইহারা বন্ধনের কারণ।

যাহারা আসুরভাবাপন্ন, তাহারা বলে বেদাদি প্রমাণহীন। তাহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম মানিতে চায় না, ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে ইচ্ছা করে না এবং মনে করে জগৎ কামমিথুন হইতে জাত। ইহার কারণ কেবল স্ত্রী ও পুরুষের কামপ্রবাহ। ইহারা যাবতীয় অকার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না। যে কোন উপায়ে হউক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নিজ পরিবারবর্গ পালন করাই ইহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগপূর্ব্বক স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করে সে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান, শান্তি, সুখ ও মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম অবগত হইয়া অর্জ্জুনের স্বীয় অধিকারক্রমে বর্ত্তমান যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য'।"

চব্বিশ শ্লোকে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—দেহীদিগের যে শ্রদ্ধা তাহা সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ভেদে তিন প্রকার। ইহা পূর্ব্বজন্মের সংস্কারভূত। সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তিরা দেবগণের পূজা করেন, রাজসিকগণ যক্ষ ও রাক্ষসদিগের পূজা করেন এবং তামসিকগণ ভূত প্রেতাদির পূজা করে।

আহারও তিন প্রকার—শরীরের পুষ্টিকর ও চিত্তপরিতোষকর আহার সাত্ত্বিক আহার। অতি কটু, অতি উষ্ণ, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি রুক্ষ ও অতি জ্বালাকর খাদ্য রাজসিক আহার। অতিশয় ঠাণ্ডা, রসহীন, দুর্গন্ধ, বাসি, উচ্ছিষ্ট ও অখাদ্য আহার তামসিক আহার।

যজ্ঞও তিন প্রকার—শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান সাত্ত্বিক যজ্ঞ, ফলকামনা ও নিজ মহত্ব প্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ তাহা রাজসিক যজ্ঞ এবং শাস্ত্রবিধিশূন্য, মন্ত্রহীন, সৎপাত্রে অন্নদানশূন্য ও শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞ তামসিক যজ্ঞ।

দান তিন প্রকার—দান করা উচিত এই বোধে পুণ্যক্ষেত্রে, পুণ্যকালে, প্রত্যুপকারে অসমর্থ সৎপাত্রকে দান করার নাম সাত্ত্বিক দান। প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় অথবা ফলকামনায় এবং ক্লেশ সহকারে দানের নাম রাজসিক দান এবং যে দান অশুচি অবস্থায়, অশুচি স্থানে, অপাত্রে প্রদত্ত এবং যাহা সৎকার-শূন্য এবং যাহা তিরস্কারপূর্ব্বক দেওয়া হয় তাহাই তামসিক দান।

তপও তিন প্রকার—দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও তত্ত্ববিদ্‌গণের পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা এইগুলিকে শারীর তপ বলে। অন্যের

অনুদ্বেগকর বাক্য, সত্য, প্রিয় ও পরিণামে হিতকর এবং বেদাভ্যাস এই গুলিকে বাচিক-তপস্যা বলে। মনের প্রসন্নতা, সৌম্যতা, মৌনভাব বা বাক্‌সংযম, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও অন্তঃকরণ শুদ্ধি এইগুলি মানসিক তপস্যা। আসক্তিশূন্য ও স্থিরচিত্ত ব্যক্তি দ্বারা ভক্তিসহকারে অনুষ্ঠিত উক্ত তিন প্রকার তপস্যার নাম সাত্ত্বিক তপস্যা। সৎকার, মান্য ও পূজালাভার্থ অনুষ্ঠিত, অস্থায়ী ও অল্পফলপ্রদ তপস্যার নাম রাজসিক তপস্যা। বিবেকশূন্য হইয়া অন্যের অমঙ্গল সাধনের জন্য বা শরীরকে ক্লেশ দিয়া যে তপস্যা করা হয় তাহাকে তামসিক তপস্যা বলে।

"সৎ" শব্দের অর্থ যাহা থাকে বা আছে (অস্+শতৃ), সুতরাং "সৎ" শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়। ব্রহ্ম ও বেদ একই, সুতরাং বেদবিহিত কর্ম্মকেই সৎকর্ম্ম বলে। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম, সুতরাং এগুলি সৎকর্ম্ম। এই প্রকার কর্ম্মে অবস্থান করাকেও সৎ বলে এবং তদর্থে (ভগবৎপ্রীত্যর্থে) কৃতকর্ম্মও সৎ বলিয়া অভিহিত হয়। এই প্রকার কর্ম্মই ইহলোকে ও পরলোকে ফলদায়ক হয় এবং তদ্বিপরীত সমুদায় কর্ম্মই অসৎ কর্ম্ম। এইগুলির অনুষ্ঠানে মনে সতত উদ্বেগ ও অশান্তি উপস্থিত হয়।

আটাইশ শ্লোকে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মোক্ষযোগ।

সঞ্জয় কহিলেন "হে মহারাজ, অতঃপর অর্জ্জুন সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকরূপে জানিতে চাহিলে, শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—

কাম্যকর্ম্মসমূহের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলে এবং সমস্ত কর্ম্মফলের ত্যাগকেই প্রকৃত ত্যাগ বলে। প্রথমটী কর্ম্মের ত্যাগ ও দ্বিতীয়টী ফলের ত্যাগ। সন্ন্যাস অপেক্ষা ত্যাগই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম ত্যাগ করা যায় না; শরীর যাত্রার জন্যও কর্ম্ম করিতে হইবে। যে অন্ন ভোজন করিয়া শরীর রক্ষা হইবে, তাহার জন্য এক মুঠা চাউলের আবশ্যক এবং তাহাও কর্ম্ম দ্বারা সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। কর্ম্ম না করা অপেক্ষা সকাম কর্ম্ম অনেক ভাল। যখন কর্ম্ম করিতেই হইবে তখন সৎকর্ম্ম করা ভাল নহে কি? সাংখ্য-পণ্ডিতগণ কর্ম্মমাত্রই দোষযুক্ত বলিয়া ত্যাজ্য বলেন কিন্তু মীমাংসকগণ বলেন যজ্ঞ, দান, তপ প্রভৃতি কার্য্য ত্যাজ্য নহে, কারণ এগুলি বিবেকযুক্ত মনুষ্যের চিত্তশুদ্ধিকর।

আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যবোধে যে কর্ম্ম করা হয়, সেই ত্যাগই সাত্ত্বিক ত্যাগ। ইহাতে দুঃখজনক কার্য্যে দ্বেষ আসে না এবং সুখকর কার্য্যেও প্রীতিবোধ হয় না। কর্ম্মফলত্যাগীকেই প্রকৃত ত্যাগী বলে। যে ব্যক্তি ক্লেশের ভয়ে নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করে সে রাজসিক ত্যাগ করে, সে কখনও শান্তিপ্রাপ্ত হয় না। মোহবশতঃ নিত্যকর্ম্ম ত্যাগের নাম তামস ত্যাগ।

মানুষ শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা ধর্ম্ম্য বা অধর্ম্ম্য যে কোন কর্ম্ম করুক না কেন, নিম্নলিখিত পাঁচটীই তাহার কারণ—

(১) কর্ত্তা (অর্থাৎ আমি করিতেছি এই জ্ঞান) (২) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (৩) পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় (৪) আকাঙ্ক্ষা ও (৫) দৈব।

অপরিমার্জ্জিতবুদ্ধি ব্যক্তি নিঃসঙ্গ উদাসীন আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া দেখে সুতরাং দুঃখ পায় কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তির মনে 'আমি করিতেছি' এ অভিমান থাকে না। তাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না। এবম্ভূত লোক যাবতীয় লোক হনন করিয়াও কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকায় কিছুই হনন করেন না এবং কর্ম্মফলে বদ্ধও হন না।

যে সুখ মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাও তিন প্রকার—যে সুখে অভ্যাশবশতঃ মনে পরম আনন্দ জন্মে, যে সুখ প্রাপ্ত হইলে সকল দুঃখের অবসান হয় সেই সুখই সাত্ত্বিক সুখ। বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগবশতঃ যে সুখ প্রথমে অমৃততুল্য কিন্তু পরিণামে বিষবৎ তাহা রাজসসুখ এবং যে সুখ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল চিত্তের মোহ উৎপন্ন করে, নিদ্রা, প্রমাদ ও আলস্য হইতে উত্থিত সেই সুখ তামস সুখ নামে খ্যাত।

কর্ম্মকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাও তিন প্রকার—কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম। ইহাদের মধ্যে স্বধর্ম্মই প্রধান। তিনটীর কোনটীই ত্যাগ করা উচিত নহে। পারতপক্ষে এই তিনটী বজায় রাখিয়া কর্ম্ম করা ভাল। অর্জ্জুনের কুলধর্ম্ম হইতেছে বংশের জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসনের অধিকারী হইবে। দুর্য্যোধন তাহার ব্যতিক্রম করিয়াছেন, সুতরাং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করিয়া বংশের কুলধর্ম্ম বিঘ্নকারক দুর্য্যোধনকে নিহত করা ধর্ম্ম। অর্জ্জুনের জাতিধর্ম্ম যুদ্ধ করা, কেননা তিনি ক্ষত্রিয় এবং যুদ্ধকার্য্যে অর্জ্জুনের যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়; অতএব তিন ধর্ম্মানুসারে অর্জ্জুনের

যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য বা ভগবৎকর্ম্ম। যুদ্ধ না করিলে তাঁহার পাপ হইবে, করিলে পাপ ত হইবেই না বরং পুণ্য হইবে।

ধূমে আবৃত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ম্মই অল্পবিস্তর রজোগুণজাত দোষে আবৃত, তাহা বলিয়া কর্ম্মত্যাগ করা উচিত নহে। অর্জ্জুনের অহঙ্কারবশতঃ 'যুদ্ধ করিব না' এইরূপ সঙ্কল্প নিতান্ত মিথ্যা, কারণ প্রকৃতি তাঁহাকে যুদ্ধে অবশ্য প্রবর্ত্তিত করিবে। ভগবান (আত্মা) প্রত্যেক মানবহৃদয়ে অবস্থান করতঃ প্রকৃতির (অ-আমির) মারফতে তাহাকে স্বকর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ঘূর্ণিত করাইতেছেন। তাঁহার ইচ্ছার উপরে কাহারও হাত নাই। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি অর্জ্জুনের শরে নিহত হইবেন ইহা বিধিলিপি, অর্জ্জুন কেবল নিমিত্তমাত্র হইবেন।

অতএব অর্জ্জুনের কায়মনোবাক্যে তাঁহাতে (ভগবান বা আত্মাতে) সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক সমুদায় ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ ঈপ্সিত (ভগবৎ) কর্ম্ম (যুদ্ধ) করিয়া চিরশান্তি লাভ করিতে প্রয়াস করা কর্ত্তব্য। ভগবানে আস্থা রাখিলে ফলাফলের দিকে লক্ষ্য থাকে না।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের এবম্ভূত সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন 'হে কৃষ্ণ, তোমার প্রসাদে, আমার মোহ নষ্ট হইয়া গেল, আমার দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছে এক্ষণে আমি তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি আমাকে যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব। তুমি আমাকে যুদ্ধ করিতে বলিতেছ, আমি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলাম।' এই বলিয়া অর্জ্জুন ধনুঃ ও শর কুড়াইয়া লইলেন।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে পূর্ব্বোক্ত প্রকার উত্তর প্রদান করিয়া পুনরায় বলিলেন "হে মহারাজ, অর্জ্জুন ভগবান কৃষ্ণের যে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন আমিও ব্যাসপ্রসাদে তাহা দর্শন করিয়া যারপর নাই আনন্দলাভ করিয়াছি এবং আমার

বিশ্বাস যেখানে স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও যেখানে জ্ঞানী ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন থাকেন সেইখানে রাজলক্ষ্মী, বিভূতি, বিজয় ও অচলা নীতি বিরাজমান; সুতরাং পাণ্ডুপুত্রগণের জয় ও আপনার পুত্রগণের পরাজয় ও নিধন অনিবার্য্য।"

যিনি ফলকামনা না করিয়া যাবতীয় কার্য্য করেন তাঁহার মনে উদ্বেগ আদৌ আসেনা, তাঁহার প্রত্যেক কর্ম্ম সুসিদ্ধ হয়।

"ত্বয়া হৃষিকীশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।"

হে হৃষীকেশ, তুমি আমার হৃদয়ে আছ, তুমি আমাকে যাহা করাইতেছ আমি তাহাই করি।

যিনি এইভাব মনে পোষণ করিবেন তাঁহার আবার পাপ বা উদ্বেগ বা অশান্তি কোথায়? যদি কেহ মনে করেন 'ভগবান আমাকে পাপ করাইতেছেন আমি পাপ করিতেছি, ইহাতে আমার দোষ কি?' তবে তিনি ভ্রান্ত। এখানে 'হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন' শব্দের অর্থ আত্মা; আত্মা ভগবান বা হৃষীকেশের অংশ এবং তিনি মনুষ্যহৃদয়ে বাস করেন। আমার হৃদয়স্থিত আত্মা আমাকে যাহা করিতে বলিবেন আমি তাহাই করিব; অর্থাৎ যদি আমি আত্মার প্রস্তাব বা পরামর্শমত কাজ করি তবে সমুদায় কর্ম্মজনিত দাগ শুক্র হইবে এবং সেগুলি সৎকর্ম্মই হইবে। যদি কেহ নরহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম্ম করিতে যায়, সে উক্ত কর্ম্ম করে নিজের কোন স্বার্থে; আত্মা তৎক্ষণাৎ তাহাতে বাধা দিবেন। গর্হিত কর্ম্ম করিতে হৃষীকেশ বা আত্মা কখনও পরামর্শ দিবেন না।

যিনি আত্মাদর্শন করিয়াছেন তাঁহারই মুখে উক্ত শ্লোকটী শোভা পায়। প্রকৃতপক্ষে আত্মা ও ভগবান একই, বুঝিবার সুবিধার জন্য আত্মা ভগবানের অংশ বলা হয়।

আটাত্তর শ্লোকে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

উপসংহার

একটী ধানের বীজ হইতে সহস্র সহস্র ধান উৎপন্ন হয়। ধানের ফল অগ্রহায়ণ মাসে পাকে সেই ধান সাধারণতঃ বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করা হয়। যদি ঐ ধান দুই বৎসর পরে বপন করা হয়, তবে ধানের গাছ বাহির হয় না। কেননা উহাতে প্রাণ (life) বা শক্তি থাকে না। প্রত্যেক ফলে বীজশিশু বর্ত্তমান থাকে এবং ভগবান বীজশিশুর খাদ্যের জন্য ফলে শাঁস দিয়াছেন। শিশু যতদিন না মাটীর সহিত সংযুক্ত হয়, ততদিন উহা ঐ শাঁস খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। শিশুটীর নির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত শাঁস খাইয়া বাঁচিয়া থাকা চলে; পরে খাদ্য ফুরাইয়া গেলে শিশুটী মরিয়া যায়। তখন বীজ মাটীতে পুতিলে গাছ বাহির হয় না। তালের বীজ পরীক্ষা করিলে ইহার সত্যতা বুঝিতে পারা যায়। বীজ হইতে ফোঁফলটী যত বড় হইতে থাকে, ভিতরের শাঁস তত শুকাইতে থাকে বা ভূয়ো হইতে থাকে। মাটীর সহিত সংযোগ না পাইলে বা স্বাধীনভাবে খাদ্যসংগ্রহ করিবার সুবিধা না পাইলে ফোঁফলটী শুকাইয়া মরিয়া যায়।

দেখা গেল কেবল বীজ হইলেই গাছ হইবে না; এই বীজে শক্তি বা প্রাণ থাকা চাই। আবার শক্তিযুক্ত বীজ বপন করা হইল। গাছ বাহির হইল; ধানের ঝাড়ও হইল, কিন্তু থোড় বাহির হইবার সময়ে ভেঁপু বা ঐ প্রকার কীট ধরিল। ফলে, শস্য উৎপন্ন হইল না। তবেই দেখা যাইতেছে শস্য

উৎপাদিত করিতে হইলে বিঘ্ননিবারক দ্রব্যের (যথা হলুদগোলা জল বা লবণগোলা জল ইত্যাদি) আবশ্যক। অর্থাৎ

(১) বীজ আবশ্যক।

(২) বীজে শক্তি থাকা আবশ্যক।

(৩) বিঘ্ননিবারক বা কীলক আবশ্যক।

শ্রীভগবান দেখিলেন অসংখ্য আত্মা তাঁহা হইতে বহির্গত হইয়া পঞ্চভূতময় দেহ ধারণ করিয়া তাঁহার লীলার সাহায্য করিতে গিয়া অযথা বিলম্ব করিতেছে। তিনি দেহীকে মন, ষড়রিপু, জ্ঞান, অজ্ঞান, বিজ্ঞান, ইন্দ্রিয়, দেহ ইত্যাদি লীলার জন্য যাবতীয় দ্রব্য দিয়াছেন, কিন্তু অজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অজ্ঞান বা শয়তানের প্ররোচনায় দেহী বিকর্ম্মই করিতেছে, তাহাতে কৃষ্ণদাগের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে; যেহেতু কৃষ্ণদাগই বন্ধন বা পুনর্জন্মের কারণ, জীবকে পুনঃ পুনঃ জন্ম লইতে হইতেছে।

জীব জ্ঞানীর ন্যায় লম্বা চওড়া কথা বলে কিন্তু অজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করে। জ্ঞানী হওয়া এবং অজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করা এই উভয় পরস্পর বিরোধী। তাই তিনি একহস্তস্থিত শঙ্খ বাজাইয়া জীবকে জাগরিত করিয়া বলিলেন—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"।

অর্থাৎ হে ভ্রান্ত জীব, তুমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছ তাহা ভুলিয়া গেলে? পঞ্চভূতময় যাবতীয় পদার্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া এবং অবলম্বন করিয়া আমার উপদিষ্ট কর্ম্ম (নিষ্কাম ভগবৎকর্ম্ম) করিয়া শুক্লপথ অর্জ্জন করিয়া আমার নিকটে শীঘ্র আসিয়া আমাতে মিলিত হইতে চেষ্টা কর।

তিনি শুনিতে পাইলেন জীব বলিতেছে "শয়তান (ষড়রিপু) আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে বা 'বেজাইয়াছে'। তোমার শরণ লইলে আমার কি

হইবে ? ষড়রিপু হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপযুক্ত কীলক বা বিঘ্ননিবারক কই ?” তখন শ্রীভগবান বলিলেন—

“অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ।”

অর্থাৎ

ভয় নাই, যদি তুমি আমার পরামর্শমত আমার (হরি বা সত্য বা তারকব্রহ্ম নামের) শরণ লও, তবে আমি আমার অন্য হস্তস্থিত চক্রের দ্বারা তোমার যাবতীয় পাপ বা ষড়রিপু হইতে তোমাকে রক্ষা করিব।

একবার রামনাম বা হরিনাম করিলে কোটি কোটি পাপের ধ্বংস হয়। ইহার অর্থ ইহা নহে যে আমি কোটি কোটি পাপকর্ম্ম করিয়া আসিয়া একবার রামনাম করিলাম, তাহাতে আমার সমস্ত পাপই নষ্ট হইয়া গেল। ইহাতে পাপকর্ম্মের সংখ্যা বাড়িতেই থাকিবে। ইহার প্রকৃত অর্থ যথা—

জীব যে মুহূর্ত্তে রামনাম করিবে বা অর্থযুক্ত রামনাম জপ করিতে থাকিবে বা রামনামের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিবে, সে সেই মুহূর্ত্ত হইতে আর পাপকর্ম্ম করিবে না ; সুতরাং ঐ সময় হইতে তাহার নূতন পাপ অর্জ্জিত হইবে না। সে পূর্ব্বে যে পাপকর্ম্ম করিয়াছে তাহার ফল।তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। রাজা যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন তাহার প্রমাণ।

রামনাম করার ফল হইল এই যে রামনামের অর্থজ্ঞান হওয়ার পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষ যে কোটি কোটি পাপ অর্জ্জন করিত তাহারই ধ্বংস হইল। সুতরাং রামনামে কোটি কোটি পাপের ধ্বংস হয় ইহা সত্য।

এইজন্যই গ্রন্থের প্রথমে ভগবান বিষ্ণুকে ‘শঙ্খচক্রধরং’ বলা হইয়াছে। শঙ্খে জাগরণের কাজ হইতেছে এবং চক্রে রক্ষার কাজ হইতেছে। পরে দ্বাপরে যখন শ্রীভগবান দেখিলেন জীবসকল কর্ম্ম (সুকর্ম্ম) দ্বারা শুক্লপথের সাহায্যে তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে, তখন তিনি শঙ্খ ও চক্র পরিত্যাগ

করিয়া মোহনমুরলী ধারণ করিলেন। শঙ্খেও যে কাজ হয়, বাঁশীতেও সেই কাজ হয়। বাঁশী অধিকতর সভ্য ও বাঁশীর গান অধিকতর মৃদু ও মিষ্ট। বাঁশী পূর্ব্বের সেই কথাই বলে

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

এই বাঁশীর গানে জীব মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হইতে লাগিল।

'ঝিকে মেরে বৌকে শিখান'র ন্যায় গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেছেন। অর্জ্জুন যাহার জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহার জন্য শোক করিতেছেন এবং কারণ দর্শাইয়া তাঁহার কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করা উচিত নহে একথাও বলিতেছেন; অর্থাৎ তিনি জ্ঞানীর ন্যায় লম্বা চওড়া কথা বলিতেছেন আবার মূর্খের ন্যায় শোককরারূপ কার্য্যও করিতেছেন। তখন তিনি

"অশোচ্যানন্বশোচং স্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে"।

এই বীজ সংগ্রহ করিলেন। যেমন অসংখ্য ধানের ফলের মূল একটী ধানের বীজ, সেইরূপ অষ্টাদশ অধ্যায়বিশিষ্ট সমগ্র গীতার মূল পূর্ব্বোক্ত শ্লোকার্দ্ধ

"অশোচ্যানন্বশোচং স্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" ইতি বীজম্।

যেমন বীজ হইলেই ফল উৎপন্ন হয় না, বীজে শক্তি থাকা চাই, সেইরূপ গীতার সার মর্ম্ম হইল

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইতি শক্তিঃ।

শ্রীকৃষ্ণ যত বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে—

কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে একান্ত মতি রাখিয়া কর্ত্তব্যবোধে অর্থাৎ ভগবৎকর্ম্ম মনে করিয়া যাবতীয় কার্য্য করিলে জীব চিরশান্তি বা মোক্ষলাভ করিবে, কারণ তাহাতে কৃষ্ণদাগ আদৌ পড়িবে না, তাহার জীবনের সমস্ত পথই শুক্লপথ হইয়া যাইবে এবং শুক্লপথই অনাবৃত্তি বা মোক্ষের হেতু।

শক্তিযুক্ত বীজ হইলেও ফলের উৎপাদনের নিমিত্ত উপযুক্ত কীলকের আবশ্যক। পাছে অর্জ্জুন বলেন "কীলক কই?" এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"। ইতি কীলকম্।

এক্ষণে অর্জ্জুন আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—

"করিষ্যে বচনং তব" গীতা ১৮।৭৩

অর্থাৎ হে শ্রীকৃষ্ণ আমি তোমার প্রসাদে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমার তমের নাশ হইয়াছে। আমি তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব অর্থাৎ তোমার কথামত কার্য্য করিতে (কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করিতে) প্রস্তুত হইলাম। এই বলিয়া অর্জ্জুন পরিত্যক্ত শর ও ধনুঃ কুড়াইয়া লইলেন।

বীজ হইতে শস্য উৎপাদিত হইল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য (অর্জ্জুনকে অধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রণোদিত করা) সাধিত হইল।

গীতায় ১৮ অধ্যায়ে মোট ৭০০ শ্লোক আছে তাহাতে ১৪০০ শ্লোকার্দ্ধ আছে, ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ৩টী শ্লোকার্দ্ধই প্রধান ঃ—

(১) "অশোচ্যানন্বশোচং স্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" ইতি বীজম্

(২) "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইতি শক্তিঃ

(৩) "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" ইতি কীলকম্।

এই তিনটী শ্লোকার্দ্ধের বিবৃতির জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বক্রীগুলি বলিতে হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণই গীতার ব্যাখ্যাকার। মানবের মনে যে যে সংশয়ের উদয় হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ তৎসমুদায় সংশয়ের ছেদন করিয়াছেন। যাহাতে গীতা সাধারণ মানবের বোধগম্য হয়, তজ্জন্য ইহা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত

হইয়াছে। দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব না জানিলে শুধু ভাষা পড়িয়া গীতার প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। আত্মতত্ত্ব জ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ভক্তি ও দেহতত্ত্ব কর্ম্ম। যেমন দেহ, মন ও আত্মা লইয়া দেহী, সেইরূপ কর্ম্ম, ভক্তি এবং জ্ঞান লইয়া গীতা। শ্রীকৃষ্ণ এই তিনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণকে জগদ্ গুরু বলা হইয়াছে :—

"দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্ গুরুম্।"

এই গীতায় ভূতপ্রেতের কথা নাই, মানুষী প্রেমের কথা নাই, ইহাতে আছে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম (সৎকর্ম্ম)। আমরা আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সংযত করিয়া যজ্ঞ, দান প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া কিরূপে প্রকৃত মানুষ হইয়া অনবরত শুক্ল দাগ অর্জ্জন করতঃ শ্রীভগবানের উপদেশমত তাঁহাতে লীন হইতে পারিব, গীতায় ইহাই লেখা আছে।

"সর্ব্বশাস্ত্র সারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে।" গীতামাহাত্ম্যম্।

অর্থাৎ গীতা সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূতা ও বিশুদ্ধা বলিয়া প্রশংসিতা।

"গীতাগীতং ন যজ্জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুর সম্মতম্।
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্ত গর্হিতম্॥" গীতামাহাত্ম্যম্।

যে জ্ঞান গীতায় উক্ত হয় নাই, তাহা আসুরজ্ঞান বলিয়া জানিবে এবং বেদবেদান্তনিন্দিত।

"তস্মাদ্ গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎ পরোজনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞান কুলশীলতাম্॥" গীতামাহাত্ম্যম্।

যে ব্যক্তি গীতা না জানে তদপেক্ষা অধম আর নাই। তাহার দেহে ধিক্, তাহার উৎকৃষ্ট চরিত্রে ধিক্, তাহার শাস্ত্রপাঠজনিত বিজ্ঞানে এবং কুলশীলতাতেও ধিক্।

"গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎ পরোজনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবস্তদ্ গৃহস্থাশ্রমম্॥" গীতামাহাত্ম্যম্।

যে ব্যক্তি গীতার প্রকৃত অর্থ না জানে তাহার অপেক্ষা অধম আর নাই। তাহার উৎকৃষ্ট চরিত্রে ধিক্, তাহার উত্তম বিভবে ধিক্ এবং তাহার সুন্দর গৃহাশ্রমেও ধিক্।

"গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎ পরোজনঃ।
ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং দানং মহত্বমম্॥" গীতামাহাত্ম্যম্।

যে ব্যক্তি গীতার উপদেশ অবগত নহে, তদপেক্ষা অধম আর নাই। তাহার অদৃষ্টে ধিক্, প্রতিষ্ঠায় ধিক্, পূজায় ধিক্, মানে ধিক্ ও মহত্ত্বে ধিক্।

"গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলংজগুঃ।
ধিক্ ত স্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপোযশঃ॥" গীতামাহাত্ম্যম্।

যাহার গীতাশাস্ত্রে মতি নাই, তাহার সমস্তই নিষ্ফল। তাহার গুরুকে ধিক্, তাহার ব্রতে ধিক্, তাহার নিষ্ঠায় ধিক্, তাহার তপস্যায় ধিক্ এবং তাহার যশেও ধিক্।

"গীতার্থং পঠনং নাস্তি নাধমস্তৎ পরোজনঃ" গীতামাহাত্ম্যম্।

যে বক্তি অর্থযুক্ত গীতাপাঠ না করে, তাহার অপেক্ষা অধম আর নাই।

"গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ॥" গীতামাহাত্ম্যম্।

যে ব্যক্তি গীতার পাঠ, অধয়ন, অধ্যাপন অবগত নহে, সে মনুষ্যলোকে বৃথাকর্ম্মকারী হইয়া থাকে।

"তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞান প্রযোজিকা"। গীতামাহাত্ম্যম্।

অতএব ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানযোগকারিণী।

"গীতেত্যুচ্চার সংযুক্তো ম্রিয়মাণোগতিং লভেৎ।" গীতামাহাত্মম্।

গীতা এই কথাটী বলিতে বলিতে যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করে, তাহার পরমা গতি লাভ হয়।

ইহা হাসিবার কথা নহে। মৃত্যুযন্ত্রণা ভয়ানক যন্ত্রণা। যে ব্যক্তি আজীবন গীতার চর্চ্চা করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন মৃত্যুকালে ভীষণ যন্ত্রণার সময়ে 'গীতা' এই শেষ কথাটী বলিতে কে সমর্থ হইবে?

এক ডাক্তারের মুখে শুনিয়াছি তাঁহার বৃদ্ধ মাতামহ একদিন তাঁহার দৌহিত্রীকে বলিয়াছিলেন "অরে সুধা, গীতাখানা একবার নি'য়ে আয়্‌ত, আর অষ্টাদশ অধ্যায়টী একবার পড়্‌ত; আজ আমার গৃহে যাইবার দিন।" কেহই তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারেন নাই। পাঠ শেষ হইলে বৃদ্ধ গীতাখানি বুকে রাখিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন।

গীতার ন্যায় জ্ঞানলাভের আর কোনও পুস্তক আছে কিনা জানি না। এহেন গীতা আমাদের আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের পিতৃধন কি আছে তাহা আমরা জানি না বা জানিবার ইচ্ছাও করি না। ভিন্ন দেশের লোক কত কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া দুর্গম পর্ব্বতগহ্বর অন্বেষণ করিয়া আমাদের কত লুপ্ত গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়া কত নূতন তথ্য বাহির করিতেছেন ও করিয়াছেন আর আমরা এসব বিষয়ে উদাসীন। তত্ত্বকথা কর্ণে প্রবেশ করাইয়া দিলেও আমরা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকি।

অধিকন্তু "গীতা অশিক্ষিতদিগের জন্য লিখিত হইয়াছে" কোনও কোনও শিক্ষিত ভদ্রলোককে এরূপ নিন্দাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনা গিয়াছে। বলা বাহুল্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণও গীতার মর্ম্ম বুঝিতে সহজে সমর্থ হন কিনা সন্দেহ আছে, অশিক্ষিতগণের কথা দূরে থাকুক।

"গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পরম্॥" গীতামাহাত্ম্যম্।

ইহলোকে জনক আদি বহুসংখ্যক রাজা গীতা অবলম্বন করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চাবচেষু চ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী॥" গীতামাহাত্ম্যম্।

গীতায় উচ্চনীচ লোকের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যাবতীয় জ্ঞানের মধ্যে গীতাজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ও ব্রহ্মস্বরূপিণী।

"যোঽভি মানেন গর্ব্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাহূত সংপ্লবম্॥" গীতামাহাত্ম্যম্।

যে ব্যক্তি অভিমান বা অহঙ্কারবশতঃ গীতার নিন্দা করে, সে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ভীষণ নরকে পচিতে থাকে।

"অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়োভবেৎ॥" গীতামাহাত্ম্যম্।

যে মূঢ়াত্মা অহঙ্কারবশতঃ গীতার্থ না মানে, সে কল্পক্ষয় পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পচিয়া মরে।

"গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ।
স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি॥" গীতামাহাত্ম্যম্।

নিকটে গীতাপাঠ হইলে যে ব্যক্তি তাহা না শুনে, সে বহুকাল শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়।

"গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠফলস্তস্য শ্রম এব উদাহৃত॥" গীতামাহাত্ম্যম্।

গীতা পাঠ করিয়া যে ব্যক্তি মাহাত্ম্য পাঠ করে না, তাহার পাঠ বৃথা ও পরিশ্রম মাত্রই সার।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন ঃ—

"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্॥
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ॥
গীতা শ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকং পালয়াম্যহম্॥" গীতামাহাত্ম্যম্।

হে পার্থ! গীতা আমার হৃদয়, গীতা আমার উত্তম সারভাগ; গীতাই আমার অত্যুগ্র জ্ঞান এবং গীতাই আমার অক্ষর জ্ঞান। গীতাই আমার উত্তম স্থান, গীতা আমার পরম পদ, গীতা আমার পরম গুহ্য বস্তু এবং গীতা আমার গুরু। আমি গীতার আশ্রয়েই অবস্থান করিয়া থাকি। গীতাই আমার পরম গৃহ। গীতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিভুবন পালন করিয়া থাকি।

সত্যকে ভুলিয়াই আমরা শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি।

নাদের পরামর্শ মত সত্যকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিয়া গেলেই শান্তি। রামরাজত্ব আবার ফিরিয়া আসিবে। মারামারি, কাটাকাটি, চীৎকার ইত্যাদি কিছুই থাকিবে না। মানুষের ইহলোকে সুখ এবং পরলোকেও সুখ।

ষড়রিপুই যত অশান্তির মূল; সুতরাং ইহারাই আপদ। বাহিরের শত্রুকে পারা যায়, ঘরের শত্রুকে পারা যায় না। বিভীষণ না থাকিলে সোণার লঙ্কাপুরী ছারখারে যাইত না।

পূর্ব্বে বহুবার বলা হইয়াছে এবং আবার বলা হইতেছে এই ঘরের শত্রু (ষড়রিপু বা শয়তান) একমাত্র সত্যের নিকটে পরাজিত, আর কাহারও নিকটে নহে।

"ভাই হরিবোল।
শমন দমন যাতে হবেরে,
ভাই হরিবোল।
রাজার যে রাজ্যপাট,
যেন নাটুয়ার নাট,
রে এ এ এ এ
(ও ভাই) দেখিতে দেখিতে কিছুই নয়
রে এ এ এ এ,
ভাই হরিবোল ॥
শুনিয়ে গোবিন্দ রব,
আপদ পলাবে সব,
রে এ এ এ এ,
সিংহরবে যেন করিগণ
রে এ এ এ এ।
ভাই হরিবোল ॥

গীতার শক্তি

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং-ব্রজ"
আমাদিগের কল্যাণ করুক এবং দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হউক।

নমো নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসুদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥

হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো,
দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত,
রাধাকান্ত নমোহস্তুতে ॥

সর্ব্বরূপময়ী গীতা,
সর্ব্বং গীতাময়ং জগৎ।
গীতাং শান্তিং পরানন্দাং,
শিরসি ধারয়াম্যহম্ ॥
ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি

সম্পূর্ণম্।